সখা

দ্বিতীয় ভাগ।

১৮৮৪।

শ্রীপ্রমদাচরণ সেন-কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

"THE [illegible] OF THE MAN."

কলিকাতা:
২ নং বেনেটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

৭০০

৮১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী-পত্র।

বিষয়	লেখক বা লেখিকার নাম	পত্র
অপূর্ব্ব বৃক্ষ (সচিত্র।)	সম্পাদক	
অবোধ ছেলে (সচিত্র।)	সম্পাদক	
অভয়ের সুশিক্ষা।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
আমাদিগের পুরস্কারের বিজ্ঞাপনের ফল।	...	
আমাদের মহারাণী (সচিত্র।)	কুমারী * দেবী	
আমি দুঃখী কেন?	খেলাত চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	
আয় যাদু কোলে আয়! (সচিত্র।)	কুমারী * দেবী	
আর একটী দুঃখের খবর।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
এই সুখই বুঝি স্বর্গ।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
একটা কিছু।	সম্পাদক	
একটী বালকের প্রয়োজন	সম্পাদক	
এব্রাহাম লিঙ্কন্ (সচিত্র।)	সম্পাদক	
এলাইচ	বিপিনচন্দ্র পাল	৪০,৫৬,
ঐতিহাসিক গল্প।	বিপিনচন্দ্র পাল	
কওনা কথা কাকাতুয়া (সচিত্র পদ্য।)	শ্রী নিঃ, শিলং	
কার জিৎ?	শ্রীমতী * * দেবী	
কুকুরে কুকুরে ভাব (সচিত্র।)	সম্পাদক	
কৃষ্ণদাস পাল (সচিত্র।)	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
কে মজা [illegible]বে?	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
কেশবচন্দ্র সেন (সচিত্র।)	সম্পাদক	
কোন জীবকে ক্লেশ দিও না।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
খুকুর সাধ।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
খুঁতধরা ছেলে।	উপেন্দ্র কিশোর রায়, বি, এ,	
ঘড়ি।	[illegible]নাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
চালনি বলেন ছুঁচ ভাই	[illegible]কিশোর রায়, বি, এ,	
তুমি কেন ছেঁদা (সচিত্র)	[illegible] * দেবী	৯০,৯৯,১১৯,১৪১,১৫৬,১৬৮,
চিরদিন কি দুঃখে যায়?	[illegible] মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
ছি দাদা! এমন ঘুম?	সম্পাদক	
জাহাজ (সচিত্র।)	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
জীবন-রক্ষক কুকুর (সচিত্র।)	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
জ্ঞানই সূর্য্য।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	৭,৩৫,৮৮,১২২
ঠাকুর দাদার গল্প (সচিত্র।)	শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	৪[illegible],
তাজমহল।	সম্পাদক	
দাদা বাবুর খোস গল্প।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	
দাদা বাবুর খোস গল্প।	উপেন্দ্রকিশোর রায়, বি, এ,	
দুষ্ট বাঘ (সচিত্র।)		

দ্বারকানাথ ঠাকুর (আমাদের দেশের বড়লোক)	সম্পাদক	১০
দ্বিতীয় বর্ষ।	সম্পাদক	১
ধাঁধা।		১৪,৩১,৪৭,৬৩,৮০,৯৬,১১২,১২৮,১৪৪,১৬০,১৭৬
নববর্ষের নূতন গল্প।	ভুবনমোহন রায়	৬৮
পত্র প্রেরকের প্রতি।		৯৬,১১১,১৬০
পশুর প্রতি দয়া।	সম্পাদক	৯৫
পাহারাওয়ালার ভেল্কী।	বিপিনচন্দ্র পাল	৪২
পুরস্কারের বিজ্ঞাপন।		৩১
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল।	কুমারী * দেবী	৩৯
প্রার্থনা ও সাবধানতা।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	৫২
বড় লোক কিসে হয়?	উপেন্দ্রকিশোর রায়, বি, এ,	১৭৯
বাগানেতে খেলা (পদ্য।)	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী	৩০
বাঁদরের বাঁদরামি।	সম্পাদক	৭৮
বাবা আমায় রেখে গেছেন।	কুমারী * দেবী	১৪৩
বালকের বিশ্বাস।	সম্পাদক	৭৬
বালকের মন (পদ্য।)	বিপিনবিহারী সেন	১৭২
বিড়ালের বুদ্ধি (সচিত্র।)	সম্পাদক	৯২
বিবিধ সংবাদ।		১৩,৮০
বোকা রামমোহন।	সম্পাদক	১৮০
ভাল লাগে না।	সম্পাদক	৮৩
মদ্যপানের ফল।	সম্পাদক	১১,৪৬
মার্কিন মহিষ (সচিত্র।)	সম্পাদক	১৪৭
মিছা কথা কহিওনা।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	১৪৯
যতনে রতন মেলে।	সম্পাদক	৬১
রাগ (সচিত্র।)	উপেন্দ্রকিশোর রায়, বি, এ,	১২৭
রাজা রামমোহন রায়।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	৪৬
রামধনু।	ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, B. Sc., Lond,	২৩
লর্ড রিপন (সচিত্র।)	সম্পাদক	১৭৭
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু (সচিত্র।)	কুঞ্জবিহারী ঘোষ	৫১
শিশু স্বাস্থ্য-রক্ষা।	প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত, এল্, এম্, এস্,	৩,২১
শ্যামাচরণ (দে) বিশ্বাস (সচিত্র।)	শিবনাথ শাস্ত্রী, এম্, এ,	১১৫
শ্বেত ভল্লুক (সচিত্র।)	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	৩৭
সখা পড়িবার কয়েকটী নিয়ম।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	৮১
সম্পাদকের পত্র।	সম্পাদক	১৭৩,১৯০
সরোজবাসিনী ও সুশীলা।	শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৭৪
সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়?	উপেন্দ্রকিশোর রায়, বি, এ,	২,২৮,৩৩,৫৪,৭২,৮৪,১৭৯
সুখী কে?	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	৬৫
সুশীলা ও তাহার মা।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	১৯
হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	৯৫
হাইকোর্ট (সচিত্র।)	সম্পাদক	১৬৫

দ্বিতীয় ভাগ। জানুয়ারি ১৮৮৪। ১ম সংখ্যা।

দ্বিতীয় বর্ষ।

আমাদের 'সখা' আজ এক বছর কাটাইয়া দুবছরে পা দিতেছে, যারা 'সখা'র সুখে সুখী, তারা আজ এই সুখের দিনে আনন্দ কর। জন্মতিথিতে মানুষ কত আমোদ করিয়া থাকে, বন্ধুরা কত জিনিশ দেয়, মা বাপ কত খুসী হন, তবে আজ 'সখা'র জন্মদিনে কেন আনন্দ করিব না? 'সখা' গরিবের ছেলে, বালক বালিকাদিগের উপকার করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে, কিন্তু সে এখনও যে গরিব সেই গরিবই আছে। তাই বলিয়া তার জন্মদিনে কি কোন আমোদ হবে না? আমরা কোন বড় লোককে 'সখা'র জন্মতিথিতে আনন্দ করিতে বলিতেছি না। যে সকল বালকবালিকা 'সখা'কে আপনার জন বলিয়া মনে করে, 'সখা'র সঙ্গে যাঁদের কিছু সম্পর্ক আছে, তাঁহাদিগকেই এই জন্মতিথির নিমন্ত্রণে ডাকিতেছি।

এসো! 'সখা'র পাঠকপাঠিকাগণ, 'সখা'র জন্ম দিনে আনন্দ করি; তোমাদেরি কাজ করিবার জন্য 'সখা'র জন্ম হইয়াছে, সে চিরকাল তোমাদেরি সখা। কিন্তু গরিব বলিয়া 'সখা' অনেকের কাছে ভালবাসা পাইল না। 'সখা'র পোষাক ভাল নয় বলিয়া কোন কোন বড় লোক, 'সখা'কে গালি দিয়াছেন, কিন্তু গরিব 'সখা' সাহেবদের মত পোষাক কোথায় পাইবে, তাহা কেউ বুঝে না। গালি খাইয়া 'সখা' যখন ছল্ ছল্ চক্ষে, মলিন মুখে চারিদিকে তাকাইতেছিল, তখন বালক বালিকাগণই তাহাকে স্থান দিয়াছেন। "এসো, ভাই, এসো! তুমি গরিব হইলেও আমাদের সখা, চিরকাল কিছু এ কষ্ট তোমার থাকিবে না"—এই বলিয়া অনেক বালকবালিকা গরিব 'সখা'কে যত্ন করিয়া ঘরে ডাকিয়া লইয়াছেন; 'সখা' তাঁহাদেরই যত্নে ঈশ্বরের দয়াতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। আজ দ্বিতীয় বৎসরে পা দিবার সময় 'সখা' পিছনে তাকাইয়া আগেকার কষ্টের কথা মনে করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতেছে, এবং সুমুখে বেশ আশার অবস্থা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সেই সকল বালকবালিকাকে ধন্যবাদ দিতেছে, কারণ তাঁহারাই অনাথ সখাকে বন্ধু বলিয়া ঘরে লইয়াছিলেন।

'সখা'র লেখক এবং লেখিকাগণকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের দ্বিতীয় কাজ। তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়া 'সখা'র জন্য উপযুক্ত প্রবন্ধ সকল লিখিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের এই পরিশ্রমের কিছুমাত্র পুরস্কার লন নাই, এজন্য যে সখা-সম্পাদক তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত উপকৃত, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

...আর অধিক বলিবার নাই। 'সখা'র সম্মুখে ...র এক বৎসর উপস্থিত হইল। জগদীশ্বর করুন, ...ন এই নূতন বৎসরে আমাদের লেখক লেখিকাগণ 'সখা'র পাঠকপাঠিকাদিগের উপকারের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনের সহিত লাগিয়া যান।

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়?

প্রথম অধ্যায়।

ছেলেবেলা একটু একটু এক গুঁয়েমো প্রায় সকলেরই থাকে। আমার কথা শুনিয়া কেহ ...বেন না। চটিলেও বড় একটা অসুবিধা বোধ করিবনা; অনেকের অভ্যাস আছে তাহারা খাঁটি ...া শুনিলে বিরক্ত হয়। কিন্তু কাহাকে ও বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার নিজের দশা দেখিয়াই আমি উপরের কথা গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

ছেলে মানুষদের একটা রোগ আছে। অনেক কাজ তাহারা আপনা আপনি করিয়া অন্যলোককে বিরক্ত করে; আবার যদি কেহ সেই কাজ তাহাদিগকে করিতে বলিল অমনি সেই কাজের মিষ্টত্ব ...ই তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়। দাদা ...ম প্রথম বই পড়িতে শিখিয়াছে; তার ব'য়ে ...র সুন্দর ছবি। পড়িবার সময় দাদা বই খুঁজিয়া পাইত না। আমার চোখে পড়িলেই আমি বই খানা ...স্তে করিয়া কেহ খুঁজিয়া না পায় এমন কোন ...গায় যাইয়া বসিতাম। শেষে একদিন শুনিলাম ...বই খানা আমারও পড়িতে হইবে, আমার আনন্দের সীমা রহিলনা; তখনই দৌড়িয়া যাইয়া সঙ্গীদের সকলকে খবরটা দিয়া আসিলাম। পরদিন মাষ্টার আসিলেই বই হাতে করিয়া হাজির। মনে করিলাম, প্রথম ছবিটার কথা আজ পড়া হবে। মাষ্টার প্রথম ছবির পাতে একটু আসিলেন ও না, ছবিশূন্য একটা পাত উল্টাইয়া এ, বি, সি, ডি, করিয়া কি বলিতে লাগিলেন! তখন হইতে আর সে বই আমার ভাল লাগিলনা।

দাদা ইস্কুলে যাইবার সময় মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইত। দাদাদের মাষ্টার বড় ভাল মানুষ। আমি মনে করিলাম ইস্কুলের সকল মাষ্টারই বুঝি ঐরূপ। বাড়ীতে তিন বছর থাকিয়া কয়েক খানা বই শেষ করিলাম। তারপর আমাকেও স্কুলে পাঠাইয়া দিল। কয়েক বছর বেশ চলিতে লাগিলাম; কিন্তু মাষ্টারকে আর তত ভাল লাগেনা। কবে বড় মানুষ হইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া দিব এই চিন্তাটা বড় বেশী মনে হইত। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। ইংরাজি যে কয়েকখানা বই পড়িয়াছিলাম, তাহার একখানাতে এক সাহেবের কথা লেখা ছিল। তিনি বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলেন; সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষটা অনেক টাকা করিয়াছিলেন। সাহেব যে বয়সে বাড়ী ছাড়িয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখিলাম আমারও এখন ঠিক সেই বয়স। তবে আর চাই কি? ক্লাশে সতীশের সঙ্গে আমার বড় ভাব;—আমি সতীশের কাছে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিয়া ফেলিলাম। কথা শুনিয়া সতীশ যেন আর তার ছোট শরীরটীর মধ্যে আঁটে না। তখনই লাফাইয়া উঠিল। বোধ হইল বাড়ী হইতে বিদেশে চলিয়া গেলেই বড় লোক হওয়া যাইবে; সতীশ বলিল "কালই চল"। কাল চলাটা তত সহজ বোধ হইল না। কিন্তু বেশী দেরী করা হবে না সেটা ঠিক করা হইল।

একদিন ইস্কুল হইতে ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলাম; সতীশও আসিল। বাবা বাড়ী ছিলেন না। বাড়ীর অন্যান্য লোকও চুপ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। চুপি চুপি কয়েকখানা কাপড় দিয়া একটী পুটলী বাঁধিলাম। তার পর বাবার বাক্স হইতে কতকগুলি টাকা লইয়া দুজনে চোরের মত বাড়ীর বাহির হইলাম। পাছে কেহ আসিয়া ধরে সেই ভয়ে দুজনে মাঝে মাঝে দৌড়িতে লাগিলাম। এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া এক বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম।

ক্রমশঃ

শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা।

সপ্তম উপদেশ—দ্বিতীয় পাঠ।

শরীরের মধ্যে যে রক্ত থাকে, তাহার মধ্যে জলের ভাগ অধিক। সেই জলের অভাব হইলেই আমরা পিপাসার্ত্ত হই। এই জন্য যতক্ষণ আমরা ক্ষয়িত জলের সমান পরিমাণ জল গ্রহণ না করি, ততক্ষণ আমাদের পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। স্নান সময় লোমকূপ দ্বারা শরীর মধ্যে জল প্রবেশ করে, এজন্য স্নান দ্বারা অনেক সময়ে পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। জল পান দ্বারাই অবশিষ্ট জলের অভাব পূর্ণ হয়। অতএব জল অতিশয় প্রয়োজনীয় পদার্থ। নিয়মিতরূপে জল পান করা কর্ত্তব্য। অনেকে আহার সময়ে প্রচুর জলপান করেন। কেহ কেহ আহারের দুই কি চারি ঘণ্টা পরে জলপান করিয়া থাকেন, অভ্যাস অনুসারে সকলই সহ্য হয়। আহারের সময় অতিশয় অধিক জল পান করা উচিত নহে, আহারের কিঞ্চিৎ পরেই জল পান করা কর্ত্তব্য।

জল আমাদের যেমন উপকারী, অপরিস্কৃত জল শরীরের পক্ষে তদ্রূপ অনিষ্ট সাধন করে। ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ানক রোগ অপবিত্র জলপানেই উৎপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন উদরের পীড়া, কফ, কাশি, জ্বর প্রভৃতিও অপবিত্র জল ব্যবহার করিলে জন্মিয়া থাকে। অতএব শিশুগণ, সাবধান, অপরিস্কৃত জল কদাচ উদরসাৎ করিও না, আর কোন উপায় না থাকিলে অন্ততঃ জলকে উত্তপ্ত করিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইয়া পান করিবে।

জল ভিন্ন অন্য কোন পানীয়ই আমাদের শরীরের পক্ষে আবশ্যক নহে, তথাপিও আমরা দেখিতে পাই, যে অনেকে জলের পরিবর্ত্তে কতকগুলি অনিষ্টকর পদার্থ সেবন করিয়া থাকেন, এবং তদ্দারা অনেকগুলি কুঅভ্যাস শিক্ষা হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি বিষাক্ত পদার্থ আহার পানীয় মধ্যে গণ্য হয়। মদ তন্মধ্যে একটী। এই বিষ যতদিন সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ততদিন হইতে দেশের স্বাস্থ্য, অর্থ, উন্নতি সকলেরই ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তথাপি লোকে ইহার অনিষ্টকারিতা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছে না। আমাদের দেশের ধনী ও বিদ্বানগণ অনেকেই এই রাক্ষসী সুরার মায়ায় পতিত হইয়া ধন, মান, সকলই হারাইয়া অবশেষে অকাল-মৃত্যুর হস্তে পতিত হইয়াছেন; তাঁহাদিগের বিদ্যা, তাঁহাদিগের বুদ্ধি দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন করা দূরে থাকুক, আপনাদিগের অকাল মৃত্যু দ্বারা দেশের বিধবা ও অনাথদিগের সংখ্যাই বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। অতএব শিশুগণ, এই পাপকে স্পর্শও করিও না।

সুরা শরীর পোষণের জন্য আবশ্যক নহে; এবং মনুষ্য-শরীরের প্রকৃতিই এরূপ যে কোন অনাবশ্যক পদার্থ শরীর মধ্যে নিয়মিত রূপে লইতে আরম্ভ করিলে, এক দিনে হউক, এক বৎসরে হউক, অনিষ্ট সাধন করিবেই করিবে। সুরা সম্বন্ধেও সেইরূপ। সুরাপান দ্বারা নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়, সুরাপায়ী প্রায়ই অকাল-মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন সে আপনার নিকট ঘৃণিত, পরিবারের অপ্রিয় পাত্র, ও ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হয়। তাহার পুত্র পরিবার অন্ন বস্ত্র বিনা প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার শরীর অসুস্থ ও মন জড়বৎ নিস্তেজ হয়। যে সকল পবিত্র কার্য্য দ্বারা মনুষ্য-

জীবন সার্থক হয়, সে তাহার কিছুই করিতে পারে না। অতএব সকলেরই এই ঘৃণিত পাপকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

চা, কাফি, প্রভৃতিও ক্রমশঃ আমাদের দেশে অভ্যস্ত হইতেছে। সময়ে সময়ে চা শরীরের উপকার করে না, এরূপ নহে; শর্দ্দি হইলে অথবা অত্যন্ত শীতের সময়ে গরম চা অতিশয় উপকারী, কিন্তু তাহা বলিয়া এই চাকে অভ্যাসরূপে পরিণত করা উচিত নহে।

ধূম-পান।—আমাদের দেশে তামাক, গাঁজা, আফিং, চরস, প্রভৃতি হুঁকায় সাজিয়া ধূম-পান করার রীতি আছে, ইহাও অতিশয় অনিষ্টকর। তামাক সকল নর নারীর নিকট উপাদেয়, কেহ নস্যরূপে, কেহ শুধু তামাক পাতা, কেহ বা পোড়ান তামাক ব্যবহার করেন, কিন্তু চিকিৎসকেরা সকল প্রকার ব্যবহারকেই অনিষ্টকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব তামাকের অভ্যাস পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গাঁজা অতিশয় অনিষ্টকর, গাঁজাখোরেরা ভদ্রলোকের ঘৃণার পাত্র হয়, এবং তাহারা প্রায়ই রক্ত-আমাশয় ও উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত হইয়া থাকে। আফিং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিষ, অতএব এই সকল নেশার কাছেও যাইও না।

পান প্রভৃতি কতগুলি দ্রব্য আমাদের দেশে চর্ব্বিত হইয়া থাকে। তাহা সময়ে সময়ে উপকারক, কিন্তু অধিক পরিমাণে সেবন করিলে অনিষ্ট করে। আহারের পরে দুই একটী পান চর্ব্বন করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না, বরং উপকার হয়।

ক্রমশঃ

জাহাজ।

ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছিলাম একটা দৈত্য এক রাজার বাড়ী পিঠে করিয়া এক দেশ হইতে আর এক দেশে লইয়া গিয়াছিল। যদি জাহাজ না দেখিতাম, তাহা হইলে এই গল্পটা একবারেই মিথ্যা বলিয়া মনে হইত। কিন্তু একবার জাহাজের মধ্যে গিয়া দেখিয়াছি, জাহাজগুলি বাস্তবিকই রাজার বাড়ীর মত। যাঁহারা পাল্সী নৌকায় চলিয়াছেন, নৌকার মধ্যে কুঁজো হইয়া যাঁহাদের প্রাণ গিয়াছে, এবং যাঁহারা বড় মহাজনী নৌকা ভিন্ন জল পথে যাইবার অন্য কোনরূপ ভাল আয়োজন দেখেন নাই, জাহাজ কিরূপ জিনিশ, তাহা তাঁহারা আদবেই বুঝিবেন না। বড় বড় ঘরে সুন্দর বিছানা, পরিষ্কার খাঠ, বসিলে ডাবিয়া যায় এরূপ চৌকী, বাজাইবার পিয়ানো যন্ত্র, স্নান করিবার আলাদা ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, ডাক্তারের ঘর, কাপ্তেন সাহেবের ঘর, ভাঁড়ার ঘর, ধোবা প্রভৃতির বন্দোবস্ত, গরু ছাগল প্রভৃতির থাকিবার যায়গা, জল পরিষ্কার করার কল, ইত্যাদি সকলরূপ বন্দোবস্তই এই জাহাজের মধ্যে আছে। আর, সমুদ্র দৈত্যের মত এই জাহাজকে পিঠে করিয়া দেশে বিদেশে লইয়া বেড়াইতেছে। গল্পে যে দৈত্য ও রাজবাড়ীর কথা শুনিয়াছি, সেই দৈত্যের পিঠে রাজার বাড়ীটা ঝাঁকুনি খাইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই, তবে সমুদ্রের পিঠে জাহাজ ভয়ানক ঝাঁকুনি খাইয়া থাকে, যাহারা প্রথম প্রথম জাহাজে উঠে, তাহাদের অনেকেরই এই ঝাঁকুনির চোটে বমি করিয়া প্রাণ যায়। জাহাজ কোন্ দিকে, কত বেগে, যাইতেছে, তাহা স্থির করিবার জন্য জাহাজের উপরে নানারূপ কল আছে, কাপ্তেন সাহেব তাহার দ্বারা সমস্ত ঠিক করিয়া থাকেন। কাপ্তেনকে বেশ লেখা পড়া জানিতে হয়, আমাদের ছাবের মাঝি বা রহমতুল্লা মাল্লার ন্যায় নিরেট মূর্খ কাপ্তেন হইলে, জাহাজকে সমুদ্রের মধ্যে তিন পা ও বাঁচিতে হয় না।

গত বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যক সখাতে আলোকমঞ্চের কথা বলিতে গিয়া ইহা বলা হইয়াছে যে সমুদ্রের মধ্যে অনেক যায়গায় মৈনাক পাহাড়ের

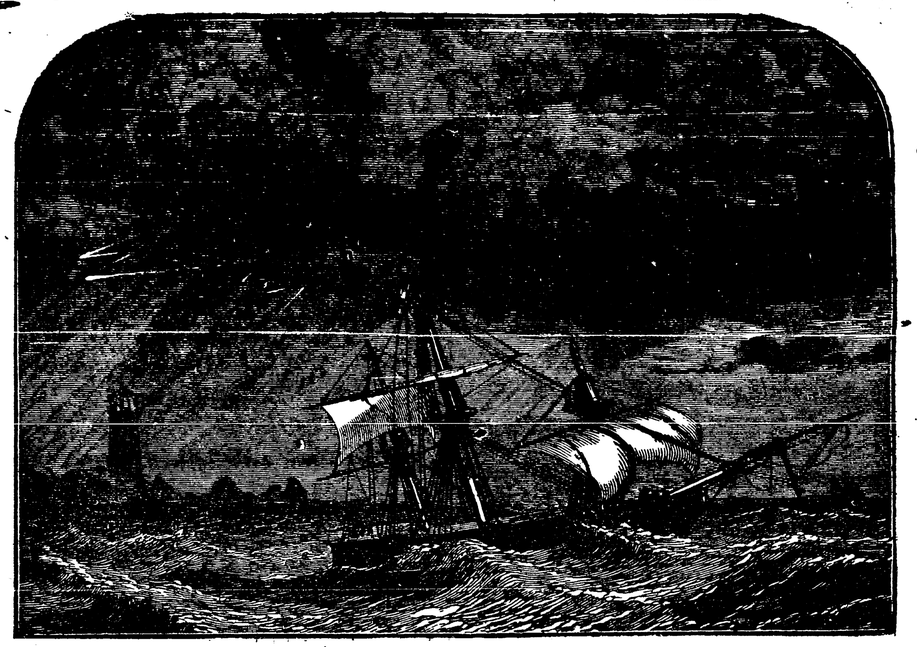

মত পাহাড় সকল জলের নীচে মাথা লুকাইয়া আছে, জাহাজ তাহাতে লাগিলেই ফাটিয়া যাইবে। যাঁহারা অনেক-কেলে কাপ্তেন, তাঁহারা জানেন এইরূপ পাহাড় কোন্ রাস্তায় কোন্ স্থানে আছে, কাজেই তাঁহারা খুব সাবধান হইয়া চলেন;—তবুও কি জানি, যদি পাহাড়ে পড়িয়া জাহাজ মারা যায়, আরও কত বিপদ কত সময় হইতে পারে, এই জন্য জাহাজের উপরে কতকগুলি নৌকা (আমাদের জেলে নৌকার মত ছোট) বাঁধা থাকে। দরকার হইলে, সেই নৌকাগুলিতে করিয়া জাহাজের লোকেরা বাঁচিতে পারে।

কতকগুলি জাহাজ কেবল মাল লইয়া দেশে বিদেশে যায়, অনেকগুলি লোক লইয়াও যায়। অনেক জাহাজ পাল দিয়া চলে, অনেকগুলি বাষ্পের জোরে যায়, অনেকগুলিতে পালও আছে, কলও আছে। এখন জাহাজে অনেক কাজ হয়, দেশে বিদেশে বেড়ান হয়, এ দেশ হইতে ও দেশে ডাক যায়, আবশ্যক হইলে সমুদ্রে যুদ্ধ হয়, বাণিজ্য দ্রব্য কেনা বেচার জন্য নানা দেশে জাহাজ যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাহাজ রাজার বাড়ীর মত; কিন্তু মাটীর উপরে ভূমিকম্প হইলে যেমন রাজার বাড়ীতেও সুখ নাই, সেইরূপ ঝড় উঠিলে সমুদ্রের বুকে জাহাজে চড়িয়া রক্ষা পাওয়া যায় না। এ দেখ, একখানা জাহাজ ঝড়ে পড়িয়াছে। এ যাত্রা রক্ষা পাইবে কি না কে বলিতে পারে? এইরূপ বিপদে জাহাজকে মাঝে মাঝে পড়িতে হয়, তবু লোকে জাহাজ ফেলিয়া পলায় না। জাহাজ করিয়া লোকে দেশে বিদেশে ব্যবসায় করিয়া ফেরে, তাহাতে দেশের টাকা বাড়ে, এইজন্য সভ্য দেশের লোকেই জাহাজ করিয়াছে। কেন আমাদের দেশে নাই। আমরা কেবল টাকা পুঁতি রাখিতে ভাল বাসি, এইরূপ স্বাধীনভাবে বাণিজ্য কারবারে টাকা খাটাইতে চাই না, এই জন্য আমাদের দেশের টাকা বাড়ে না। এইরূপ দেশে বিদেশে কারবার করিয়া বেড়াইলে যে কেবল টাকা বাড়ে তাহা নয়, অনেক নূতন জ্ঞান জন্মে, অনেক সাহস বাড়ে। আজ কাল ইংরাজেরা যে এত বড় একটা জাতি, ইহার একটা প্রধান কারণ এই যে ইহারা

অনেককাল হইতেই এইরূপ দেশে বিদেশে কারবার করিয়া বেড়াইতেছে।

বালকদিগের মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে যখন বড় হইব, হাতে টাকা হইবে, তখন সাধ্য মত স্বাধীন ব্যবসায় করিবার চেষ্টা করিব। পরের চাকর না হইয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারার চেয়ে আর কি সুখ আছে?

একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছিলাম; গঙ্গায় সকল জাতিরই জাহাজ আছে, আমাদের নাই, ইহা দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল; তাই আজ এত কথা লিখিলাম। সখার পাঠকদিগের মধ্যে জমিদারের ছেলে অনেকে আছেন, তাঁহারা যেন বড় হইয়া এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখেন।

তাজ মহল।

বালক বালিকাগণ! তোমরা অনেকেই আগ্রার সুবিখ্যাত তাজ মহলের কথা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছ। আগ্রা নগরী কলিকাতা হইতে ৪২১ ক্রোশ দূরে,—পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া যাইতে অনেক সময় লাগিত। লর্ড লরেন্স যখন আমাদের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন, তখন তিনি অতি দ্রুতগামী ঘোড়ার ডাক বসাইয়াও ১৫ দিনের পূর্ব্বে আগ্রা হইতে কলিকাতায় সংবাদ আনাইতে পারেন নাই। এখন রেল গাড়ী হওয়াতে যাইবার খুব সুবিধা হইয়াছে। এখন আগ্রা যাইতে মোটে ত্রিশ ঘণ্টা লাগে।

তোমরা জান আমাদের দেশে পূর্ব্বে মুসলমান বাদসাহরা রাজত্ব করিতেন। বাদসাহরা সকলেই খুব জাঁক জমক প্রিয় ছিলেন, ইহাঁদের মধ্যে আবার সাজাহান নামক একজন বাদসা বিশেষ সৌখীন ছিলেন; তাঁহার সময়ে দিল্লীর শোভা সম্পদ খুব বৃদ্ধি পায়; বড় বড় রাজপ্রাসাদ, প্রকাণ্ড মসজিদ, সুপ্রশস্ত রাজপথ, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া ইনি দিল্লীর শোভা বাড়াইয়া যান। যে ময়ূর-সিংহাসনের কথা তোমরা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছ তাহা ইনিই সখ করিয়া নিজের জন্য তৈয়ার করেন। যে একটী কোহিনুর আমাদের মহারাণী মুকুটে পরিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সেইরূপ কত কত মণি উক্ত সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করিত। আগ্রার তাজ মহলও এই বাদসাহের আদেশে নির্ম্মিত হয়। সাজাহান বাদসাহের মমতাজমহল নাম্নী এক প্রিয়তমা বেগম অর্থাৎ রাণী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে বাদসা তাঁহার গোরের উপর এই মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। বেগমের নামানুসারে এই প্রাসাদেরও একটী নাম মমতাজ মহল ছিল; ক্রমে তাহা হইতেই তাজ মহল হইয়াছে। আগ্রার অনধিক এক ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে এই অপূর্ব্ব অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। যে তোরণ অর্থাৎ ফটক দ্বারা তাজ মহলে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা দেখিতে অত্যন্ত উচ্চ ও অতি সুন্দর। এই তোরণ রক্তবর্ণ পাথরে নির্ম্মিত; ইহার গাত্রে যে সকল শিল্পকার্য্য রহিয়াছে তাহারই বা শোভা কত। এইরূপ আরও তিনটী তোরণ অপর তিন দিকে শোভা পাইতেছে। তোরণ অতিক্রম করিলেই শ্বেতপাথর-নির্ম্মিত একটী অত্যন্ত দীর্ঘ চৌবাচ্চা দেখিতে পাইবে, এই চৌবাচ্চার মধ্যে ৩।৪ হাত দূরে দূরে একটী ফোয়ারা আছে এই সকল ফোয়ারা হইতে এখনও মধ্যে মধ্যে জল-ক্রিয়া হইয়া থাকে। চৌবাচ্চার দুই পার্শ্বে যে সুপ্রশস্ত পথ আছে তাহা বৃক্ষাদিতে এরূপ ঢাকা যে অত্যন্ত রৌদ্রের সময়েও সেখানে রৌদ্রের তাপ লাগে না। তাজমহলের তিন দিক মনোহর বাগান দ্বারা বেষ্টিত, অপরদিকে যমুনা নদী। বাগানটী দেখিতে বড় সুন্দর। ইহার মধ্যে দারুচিনি, চন্দন প্রভৃতি অনেক বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুবিস্তীর্ণ ত্রিতল ভিত্তির উপর তাজ মহল স্থাপিত। যে সুন্দর শ্বেত পাথরের দুই একখানা বাসন পাইয়া আমরা কত সন্তুষ্ট হই, সেইরূপ শ্বেত পাথর দ্বারা ইহার আগাগোড়া নির্ম্মিত। তাজের চারি কোণে চারিটী স্তম্ভ প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকের উচ্চতা ২২৫ ফিট। তাজ মহলের উপর ও মধ্যভাগ নানা বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত সুন্দর সুন্দর ফুলে সুশোভিত *। এক একটী ফুলের পাপড়ী নির্ম্মাণে ৮।১০ প্রকার বিভিন্ন রঙ্গের ছোট ছোট পাথর লাগান হইয়াছে। যে রঙ্গের পর যেটী দিলে ঠিক স্বাভাবিক ফুলের মত দেখায়, সেই সেই রং ক্রমে সাজাইয়া এক একটী ফুল রচিত হইয়াছে। পাথরগুলি এরূপ দৃঢ় বদ্ধ যে দেখিলে পাথরের যোড়া বলিয়া কোন মতেই বোধ হয় না। খুব ভাল করিয়া দেখিলেও বোধ হয় যেন কোন এক সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় এ সমস্ত চিত্রিত হইয়াছে। দূর হইতে বোধ হয় যেন একটি প্রকাণ্ড পাথরের ক্ষেত্রে হাজার হাজার স্বর্গীয় ফুল ফুটিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। তাজমহলের দ্বারে উপরিভাগে পারস্য ভাষায় মুসলমানদের ধর্ম্ম-পুস্তক কোরাণ হইতে সুন্দর সুন্দর কবিতা সকল কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

সূর্য্য উদয় হইবার কিছু পূর্ব্বে তাজ মন্দির ঈষৎ নীল, সূর্য্য উদয় হইবার পর গোলাপী এবং অস্ত হইবার সময় লাল বর্ণ দেখা যায়। চন্দ্রের আলোকে তাজ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখায়।

রাজ্ঞীর গোরস্থান প্রাসাদের সর্ব্ব নিম্নতলে; সে স্থানটী অত্যন্ত অন্ধকারময়, এজন্য তথায় আলো লইয়া যাইতে হয়। সমাধি স্থান নানাবিধ বহুমূল্য মণি ও প্রস্তরের কারুকার্য্যে শোভিত। রাজ্ঞীর সমাধির পার্শ্বেই সম্রাট সাজাহানের সমাধি স্থান;—সেটিও দেখিতে যারপর নাই মনোহর। তাজের দুটী রূপার কপাট ছিল; উক্ত কপাটে দশ হাজারেরও অধিক প্রেক লাগান ছিল; এবং প্রত্যেক প্রেকের উপরে এক একটী মোহর স্থাপিত ছিল। কিন্তু এখন আর সে সকল কিছুই নাই। প্রায় আশি বৎসর গত হইল জাঠেরা তাহা লুঠ করিয়া লইয়া গলাইয়া ফেলে।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তাজমহল নির্ম্মাণের উদ্যোগ হয়। ১৭ বৎসর কেবল মূল্যবান প্রস্তর প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে যায়; পরে বিশহাজার লোক ১০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই বৃহৎ ব্যাপারটী সমাপ্ত করে। ইহা যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার তোমরা ইহাতেই বুঝিতে পারিবে।

উপরে অতি সংক্ষেপে তাজমহলের বর্ণনা লেখা গেল, স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্য কিছুই বুঝা যায়না; ভাষাতে এমন কথা নাই যাহা দ্বারা তাজ মহলের ঠিক বর্ণনা করা যাইতে পারে। একজন ভ্রমণকারী তাজ দেখিয়া লিখিয়াছেন—"পৃথিবীতে তাজের তুলনা করা যায় এমন কিছুই নাই, তাজই তাজের তুলনার স্থল।"

* এরূপ শুনা যায় যে এই কার্য্যে পূর্ব্বে যে সকল বহুমূল্য পাথর লাগান হইয়াছিল, ইংরেজেরা সেগুলি খুলিয়া লইয়া তাহার যায়গায় নকল-পাথর বসাইয়া দিয়াছে। একথা সত্য কি না বলা যায় না। সখা-সম্পাদক।

ঠাকুরদাদার গল্প।

অদ্য নবীন বাবু তাঁহার বালক-সেনা সঙ্গে করিয়া মাঠে বেড়াইতে চলিয়াছেন; কিশোরী, মন্মথ, অমূল্য, চন্দ্রনাথ, বিনয়, নগেন, দেবেন, নলিন প্রভৃতি বালকগণ মহা আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া হাতধরাধরি করিয়া যাইতেছে। দেখিতে বড় সুন্দর। সকলেরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পর, কাহারও বনাতের ডবল্‌ব্রেষ্ট কোট, কেহ বা কোট র‍্যাপার গায়, কাহারও শালের রুমাল, সকলে হৃষ্ট পুষ্ট ও সুশ্রী। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ

ও শ্রম করিয়া এবং সৎ বিষয়ের আলোচনাতে ও সৎসঙ্গে সকলেই সৎচরিত্র ও সুস্থশরীর লইয়া কেমন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে যেন পথ আলো করিয়া চলিয়াছে। এতগুলি ছোট বালক তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে ও ভক্তি করে, ও তাহারা সকলেই তাঁহার উপদেশে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইতেছে, ইহা ভাবিয়া আজ নবীন বাবুর বড়ই আনন্দ হইতেছে; সেই আহ্লাদ তাঁহার চক্ষু ও মুখে যেন মাখান রহিয়াছে। তিনি যতবার তাহাদের দিকে দেখিতেছেন, যতবার তাহাদের সরল ভাব ও সুহাস্য বদন, উৎসাহের চলন ও উৎসুক কথোপকথনের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতেছেন, ততই অনন্দে তাঁহার বক্ষঃস্থল যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজ কোন্ বিষয়ে কথা বার্ত্তা হইবে তাই লইয়া বড় তর্ক হইতেছে; কেহ বলিতেছেন "আজ মাধ্যাকর্ষণটা ভাল করিয়া বুঝিব।" কেহ বা আজ গঙ্গার কথা তুলিবে বলিতেছে, কেহ ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিবে বলিতেছে। এইরূপে সকলে ভিন্ন ভিন্ন মত দিতেছে শেষে স্থির হইল—"দাদা মশাই যা ভাল বিবেচনা করেন তাই হবে।" নলিন বাবু চিরকালই সমান চঞ্চল। হটাৎ পথে একটা দড়ী দেখিয়া সেটা লইলেন ও তথায় বসিয়া তাহার একদিকে একটী ইষ্টক খণ্ড (ঢিল) বাঁধিলেন। আর সকলে অনেক দূর গেল, তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল,—

মহা কাজে ব্যস্ত, ভ্রুক্ষেপই নাই। পরে যখন মনের মত হইল, তখন "হুঁ উ—উ—উ" করিয়া একটা শব্দ করিতে করিতে দড়ীর অপর দিকে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে একছুট। দড়ীটা "বোঁ বোঁ" শব্দে ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে সকলে মাঠে পঁহুছিলেন। একটী উচ্চ স্থানে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া সকলে নবীন বাবুকে ঘেরিয়া বসিলেন। নলিনের ইচ্ছা যে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া সেই ঢিলটী ঘোরায়। তাহা দেখিয়া নবীন বাবু বলিলেন "ভাল, নলিন তুমি যে ওটা ঘোরাচ্ছ, বল দেখি ঢিলটী অমন ঘুরিতেছে কেন?" নলু বাবু মহা খুসী, "ঘুরছে কেন বল্‌ব? আচ্ছা, এই দেখ। এই,—এই একদিকে ধ'র্‌লাম, আর এই জোর দিলাম, আর, অম্‌নি ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। এ আর আশ্চর্য্য কি?" নলিন আবার ঘুরাইতে লাগিল।

তখন নবীন বাবু আর সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলন "নলিন ত পারিবেই না, তোমরা কে পার বল দেখি?" বিনয় বলিল "পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া"; মন্মথ বলিল "তা নয়, দড়ীতে বাঁধা আছে বলিয়া।" কিশোরী বলিল:—"দুইই ঠিক, পৃথিবীও টানিতেছে, দড়ীতেও বাঁধা আছে, দুদিক হইতেই টান পড়িতেছে এই জন্য ঘুরিতেছে।" নবীন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বেশ বলিয়াছ; কেবল দড়ীতে ওরূপে ঘুরিতনা, আবার কেবল ঢিলটীও ঘুরিতনা, ছুড়িয়া দিলে চলিয়া যাইত; দুটী কারণেই বটে। কিন্তু আর একটু স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে। মনোযোগ দাও; আজ এই বিষয়েই কথা বলিব।"

"সেদিন বলিয়াছি সমস্ত জগৎ, সমস্ত বিশ্বসংসার, কেবল মাত্র সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি। এই পরমাণু-পুঞ্জকে একত্র করিয়া রাখিয়াছে কে? (সকলে "আণবিক আকর্ষণ") বেশ। আকর্ষণ কি? এক প্রকার শক্তি। এই আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে পৃথিবী, বৃক্ষ, লতা, জীব, জন্তু, আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র নক্ষত্র কিছুই থাকিতনা। কেবল বিন্দু বিন্দু পরমাণু অসীম আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া ছড়াইয়া থাকিত। বুঝিলে আকর্ষণ কত প্রয়োজনীয়? এই শক্তি যে কেবল পদার্থ সকলকে নির্দ্দিষ্ট আকারে রাখে, এমন নহে; এমন স্থান নাই, এমন জীব নাই, যাহা এই মহতী শক্তির অভাবে শূন্য হইয়া না যাইত। আমি যে কথা কহিতেছি, নড়িতেছি, ঐ যে ফড়িংটী উড়িতেছে, সব এই শক্তির গুণে। ক্রমে বুঝিতে পারিবে, এখন প্রথমতঃ একটী কথা কখনও

ভুলিওনা, যে পরমাণু নির্জ্জীব অচেতন পদার্থ মাত্র। তাহার উপর এই শক্তি যতক্ষণ না কার্য্য করিবে ততক্ষণ তাহার সাধ্য নাই যে স্থান পরিবর্ত্তন করে। এই যে যুতা রাখিয়াছি যতক্ষণ উহাকে না নাড়িব ততক্ষণ উহা নড়িবে না। এই যে চাদর রহিল, না তুলিলে কখন উহা উঠিবেনা।" চন্দ্রনাথ বলিল, "কেন বাতাস এলেই ত উড়ে যাবে?" নবীন বাবু:—"সেও ত বায়ুর শক্তিতে যাবে, আমার হাতের শক্তিতে যাইত, নাহইয়া বায়ুর শক্তিতে উড়িল, তথাপি নিজে ত পারিল না। জড় পদার্থের সে ক্ষমতা নাই।" কিশোরী:—"আচ্ছা তবে আমার হাত ও ত পরমাণুতে প্রস্তুত, তবে উহা নড়ে কেন?" নবীন বাবু:—"হাত জড় পদার্থ বটে কিন্তু উহার শিরার মধ্যে যে রক্ত আছে তাহা দ্বারা এমন একটা কার্য্য হইতেছে যে তন্মধ্যে শক্তি সঞ্চিত আছে, তজ্জন্য আমরা ও অন্যান্য জন্তুরা এবং উদ্ভিদেরা জীবিত থাকি। জীবন আর কিছুই নহে কেবল রক্তের এই কার্য্য করিবার শক্তিটুকু মাত্র; গলা কাটিলে রক্ত বাহির হইয়া যায়; আমার এই হাত আর তখন কর্ম্মক্ষম থাকিবেনা।

অমূল্য:—রক্তের যে শক্তি আছে, উহা লৌহ বা প্রস্তরের নাই কেন? নবীন বাবু:—ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থের কোন্‌টীতে কোন্ গুণ দিয়াছেন তাহাই যখন আমরা জানিনা, কেন দিয়াছেন বা কেন দেন নাই তাহা আমরা কেমন করিয়া জানিব? লৌহ প্রস্তরাদি বস্তুর মধ্যে এই পরিমাণে শক্তি দিয়াছেন যেন তাহারা জমাট হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অন্য কোনরূপ চেতনা শক্তি দেন নাই, অগ্নিতে কেমন এক নূতন বিধ শক্তি দিয়াছেন তাহা যাহাতে লাগে তাহাই ভস্ম হইয়া যায়। সেইরূপ বৃক্ষাদিতে কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধন শক্তি দিয়া, জন্তুগণকে চলিবার শক্তি দিয়াছেন, এবং সর্ব্বোপরি মানবকে জড় শক্তি ও তদ্ভিন্ন বুদ্ধি ও বিচার শক্তি দিয়া সৃষ্ট পদার্থের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, একথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা; তাঁহার সীমা অপার, ইচ্ছা ও কৌশল অসীম, তাঁহার বুদ্ধির ইয়ত্তা হয়না। তিনি অনন্ত, তাঁহার সৃষ্টির যেটুকু জানিতে পারা যায়, তাই জানিতে চেষ্টা করি এস।

শক্তি বিনা পরমাণুর সমষ্টি হয়না, শক্তিবিনা পরমাণু সমষ্টির গতি ও হয়না। জড়মাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান গুণ নিশ্চলতা বা জড়ত্ব। শক্তি ব্যতীত আর কিছুরই সাধ্য নাই যে জড় পদার্থকে নাড়িতে পারে। মনে করিয়া রাখ এইটী জড় বস্তু মাত্রেরই প্রথম গুণ। উহার তদ্রূপ আর একটী বড় দরকারী গুণ আছে সেটী এই:—কোন বস্তুকে একবার এক দিকে যেই চালাইয়া দিবে, অমনি সেই বস্তু সেই দিকে চলিতে থাকিবে, আর কখনই থামিবেনা, যদি তাহাতে আর কোন শক্তি কার্য্য না করে। বুঝিতে চেষ্টা কর। এটী একটু কঠিন। কোন পর্ব্বতের উপর একটী পাথরের ঢিল রহিয়াছে, যদি কিছুতে তাহাকে স্থানচ্যুত না করে, তবে চিরকাল সেইখানে রহিবে, নড়িবেনা (প্রথমগুণ)। কি একবার তাহাকে নীচের দিকে ফেলিয়া দাও, তখন পড়িবে ও তাহার গতি আর বন্ধ হইবেনা, সে পৃথিবীর আকর্ষণে পড়িতেছে, ক্রমিক পড়িবে, যতক্ষণ না কিছুতে তাহার বেগ বন্ধ করিবে, ততক্ষণ থামিবেনা (দ্বিতীয় গুণ)। যেই মাটীতে পড়িবে, অমনি আঘাত পাইয়া থামিয়া যাইবে। বুঝিলে? দেবেন্দ্র:—"আপনি বলিলেন জড় বস্তুকে যেদিকে চালাইব সেই দিকে চিরকালই চলিবে, তা কৈ হয়? উপরে ঢিল ছুড়িয়া দিলে একটু পরে পড়িয়া যায় কেন?"

কিশোরী:—বা বোকা! এই বুঝি শুনিলে? সেই দিকে চিরকাল চলিবে—যদি আর কোন শক্তি না থাকে। তা ওখানে তুমি তাকে উপর দিকে ছুড়িলে আর পৃথিবী যে তাকে নীচে হইতে টানিতেছে, তবেইত হইল; তোমার ছোড়ার জোর যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ উপর দিকে গিয়া, আবার পৃথিবীর টানে মাটীতে পড়িয়া গেল। না দাদা?

নবীন বাবুঃ—বাস্তবিক তুমিই বেশ বুঝিতে পার, আর কেহ বোধ হয় তত মন দেয়না। নগেন বলিল "হাঁ তা বৈ কি? আর উনি যে আমাদের চেয়ে কত বড়? তা বুঝি হবেনা? তবু আমি কেমন বুঝিতে পারিতেছি।" সকলেই হাসিলেন। নবীন বাবু ঃ—তবেই দেখ, জড় পদার্থের দুটী গুণ, এক আপনা হইতে চলিতে পারেনা, আর চালাইয়া দিলে না থামাইলে থামেনা।—এই কথা বলিতে বলিতে মাঠের অন্য দিকে একটা ভয়ানক গোল উঠিল, বালকগণ এবং নিজে ঠাকুরদাদা সকলেই সেই দিকে ছুটিলেন, কাজেই এইখানে কথা থামিল।

আমাদের দেশের বড়লোক।

গতবৎসর আমরা অনেক সাহেবের কথা লিখিয়াছি, কারণ তাঁহাদের চরিত্রে এমন গুণ ছিল, যাহা বালকবালিকাদিগের থাকা উচিত। কিন্তু সাহেবদের কথা লিখিয়াছি বলিয়া যে আমাদের দেশে বড়লোক নাই, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। সকল দেশেই ভাল লোক আছেন; পরমেশ্বর যে এক দেশেই ভাললোকদের বাড়ী করিয়া দিয়াছেন সে দেশের বাহিরে যে আর ভাললোক হইতে পারেনা, একথা মনে করা বড় অন্যায়। কেন? আমাদের দেশে কি ভাল লোক নাই? আমাদের দেশে কি এমন লোক নাই যাঁহারা অতি গরিব অবস্থা হইতে কেবল নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের যত্নে ও পরিশ্রমে, নিজেদের ভাল চরিত্রের গুণে বড় লোক হইয়াছেন? আমাদের দেশে কি এমন লোক নাই যাঁহারা যে কাজটীকে ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন, বুকের রক্ত দিয়া সেই কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন? আমাদের দেশে কি এমন লোক নাই যাঁহারা বড় লোকের ঘরে জন্মিয়া সৎকার্য্য করিবার জন্য নিজেদের টাকা কড়ি দুই হাতে দেশময় ছড়াইয়া দিতেছেন? আমাদের দেশে অনেক ভাল লোক, অনেক বড় লোক আছেন। তবে সাহেবদের দেশে যেমন একজন বড়লোক হইলে দশজনে তাহার জীবন চরিত লেখে, সে কখন কোন্ কাজটী করিল, কখন কি কথা বলিল, তাহা সাবধানে টুকিয়া রাখে, আমাদের দেশে সেরূপ নাই। তাই আমাদের দেশের অনেক ভাল লোকের কথা সময়ে মুছিয়া গিয়াছে, অথবা কেবল দুই চারিজন সেকেলে লোকের মুখেই শুনা যায়।

আমরা গতবৎসর বলিয়াছি, আমাদের দেশের বড়লোকদের জীবন চরিত লিখিব, তাই আমরা আজ একজন বড়লোকের জীবনের একটী গল্প বলিতেছি। লম্বা চৌড়া জীবনচরিত লিখিতে আমরা ইচ্ছা করি না, কারণ যে সকল কাজে কোন লোকের চরিত্রের গুণ বাহির হয়, সেই সকল কাজের কথা ছাড়া, তিনি কেমন করিয়া চলিতেন, দেখিতে কিরূপ ছিলেন, কি দিয়ে ভাত খেতেন, এ সকল কথা জানিয়া আমাদের কি প্রয়োজন?

দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাদের সময়ে কলিকাতার একজন বড়লোক ছিলেন। অনেকের বিশ্বাস আছে টাকায় বড়লোক হইলেই বুঝি স্বভাব চরিত্রের বিষয়ে ছোট লোক হইতে হয়। অনেককে দেখিতে পাই তাঁহারা বড়লোকের নাম শুনিলেই "বাপরে! বড়লোক!" বলিয়া চমকিয়া উঠেন, সাপের নিকট যাইতে হইলে মানুষ যেমন ভয়ে ভয়ে যায়, অনেকে বড়লোকের নিকট যাইতে হইলে সেইরূপ ভয়ে ভয়ে যান, দরজায় ভোজপুরী দ্বারবান পাহারা দিতেছে, নোংরা কাপড় দেখিলে এখনই অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবে, এই ভয়ে অনেক লোক সাধ্য থাকিতে বড়লোকের বাড়ীর ছায়াতেও যান না। কিন্তু আমরা জানি এরূপ বড়লোক অনেক আছেন, যাঁহারা টাকা পাইয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠেন নাই, যাঁহারা অত্যন্ত দয়ার সহিত দুঃখীকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর এইরূপ বড়লোকদিগের মধ্যে একজন। ইহাঁর মন কত উচু ছিল, একটী গল্প বলিলেই বুঝা যাইবে। একবার দ্বারকানাথঠাকুর এই কলিকাতায় অনেক টাকায় একটী বাড়ী কিনিয়াছিলেন।—বাড়ীটী ইহার পূর্ব্বে যাঁহাদের ছিল, তাঁহারা পাওনা টাকা দিতে পারেন নাই বলিয়া বাড়ীটী বিক্রী হইয়া যায়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর সেইবাড়ী দখল করিতে অর্থাৎ নিজের হাতে আনিতে গেলেন। তিনি যখন সেই বাড়ীতে গেলেন, তখন গিয়া শুনিলেন উপরে জানালায় একটী বালক তাহার মায়ের সহিত কথা কহিতেছে; মাকে মুখ ভার করিয়া থাকিতে দেখিয়া বালক বলিতেছে "কিমা! তুমি অমন করে আছ কেন?" মা বলিলেন "বাবা! আমাদিগের এই বাড়ী দেনার জন্য বিক্রী হয়ে গেছে; যিনি কিনেছেন তিনি আমাদের তুলে দেবেন।" বালক মায়ের দুঃখের কথা শুনিয়া বলিল "কোথায় যাব মা, তা হলে?" মা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "বাছা! ভগবান যেখানে রাখেন সেইখানে থাকিব।" বালক আর কিছু বলিলনা।—যাঁহার বাড়ী তিনি বাঁচিয়া নাই, তাঁহার বিধবা স্ত্রী একটী ছেলেকে লইয়া এমন কষ্টে পড়িয়াছেন, শুনিয়া দয়াবান দ্বারকানাথের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করে জল পড়িতে লাগিল। তিনি বালকটীকে তাঁহার নিকটে আনাইলেন। তাহার পর তাহাকে কোলে লইয়া মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বল্‌ছিলে? বাবা!" বালক একটু থত মত খাইয়া বলিল। দ্বারকানাথ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "না! না! তোমাদের কোথাও যেতে হবেনা। এটা তোমাদেরই বাড়ী।" এই বলিয়া সেই বালকের হাতে কিছু টাকা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই তিনি একখানি দানপত্র প্রস্তুত করিলেন, এবং সেই বালককে বাড়ীটী লিখিয়া দিলেন। বলতো কত উচু মনের কাজ?

মদ্য-পানের ফল।

(২নং)

'ভিক্ষা দাও গো!'

ওই যে দুঃখিনী স্ত্রীলোক ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, শুষ্ক মুখে, দুটী ছোট মেয়েকে লইয়া, "ভিক্ষা দাও গো" বলিয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াইল, উহাকে চেন? কে উহার এ দুর্দ্দশা করিল? উহাকে দেখিলেতো ভিখারীর মেয়ে বলিয়া মনে হয় না! মুখে কেমন একটু লজ্জা রহিয়াছে—চক্ষু যেন ছল ছল করিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় বড় কষ্টে পড়িয়াছে, তাই তোমার দ্বারে, নতুবা আসিত না। আহা! উহার সমস্ত দুর্দ্দশার কথা শুনিতে চাও, তবে শোন।

বসন্তপুর নামক গ্রামে কেদারনাথের মত ভাল ছেলে কে ছিল? তাহার হাসি হাসি মুখখানি, বিনম্র ব্যবহার, লেখাপড়ায় মনোযোগ, ছোট ভাই বোনের প্রতি ভালবাসা, এসকল যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন কেদার এর পর একজন বড় লোক হইবে। কেদার জাতিতে কায়স্থ ছিল, কিন্তু বসন্তপুর গ্রামে কেদারকে সকলেই দেবতার ছেলের ন্যায় ভক্তি করিত। সেই গ্রামের একটী ছাত্রবৃত্তি স্কুলে কেদার বরাবর পড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উঠিল। কেদারের মা বাপের কত আশা! তাঁহারা বড় গরিব, বিদেশে পয়সা খরচ করিয়া কেদারকে পড়াইবেন, এরূপ সঙ্গতি নাই, মনে ভাবিলেন এইবার পরীক্ষা দিয়া কেদার যদি বৃত্তি পায়, তাহা হইলে সে একটু লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হয় এবং তাঁহাদেরও আর কষ্ট থাকে না। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফলে বাপ মায়ের আশা পূর্ণ হইল। পরীক্ষার প্রায় ২ মাস পরে একদিন পাড়ার দুর্গাচরণ বাবু আসিয়া কেদারের বাপকে বলিয়া গেলেন তাঁহার কেদার 'জলপানি' পাইয়াছে। কি আনন্দ! কেদারের মা বাপের সুখে

সকলেই সুখী হইলেন। কিন্তু ৪ টাকা বৃত্তিতে সমস্ত খরচ চালান ত সহজ নহে—কেদার কোথায় যায়? তাহারও বন্দোবস্ত হইল। কিছু দূরে কোন গ্রামে একটী এণ্ট্রান্স স্কুল ছিল, তথায় পড়িবার জন্য কেদারকে সেইখানে পাঠান হইল। কেদার কায়স্থের ছেলে, ঘরের একটু একটু কাজ করিয়া দিবে, এইরূপ কথাতে সম্মত হইয়া সেই গ্রামের বড় একটী ভদ্রলোক কেদারকে নিজের বাড়ীতে স্থান দিলেন। কেদার সেইখানে থাকিয়া লেখা পড়া করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই অনেকে কেদারকে ভাল ছেলে বলিয়া চিনিল। সেই গ্রামে কেদারের অপেক্ষা বয়সে বড় অনেক বাবু, কেদারকে ডাকিয়া তাহার সহিত আলাপ করেন, নানা রকম কথাবার্ত্তা বলেন; কেদার গরিব বেচারা, বয়সে বড়, টাকা কড়িতে বড়, বাবুদের সঙ্গে মিশিয়া নিজেকে একটু সুখী, একটু কৃতার্থ মনে করে। ইহাতেই কেদারের কপাল পুড়িল।

তিন চার বছর মিশিয়া মিশিয়া কেদারের মনে বিশ্বাস হইল, "ইহাঁরা আমা অপেক্ষা যখন অনেক বেশী জানেন, তখন ইহাঁদের কথা অনুসারে চলা উচিত, তবে কখন কখন যে সকল খারাপ বিষয়ের আলোচনা করেন, তাহা শুনিলে দোষ কি, সেইরূপ কাজ না করিলেই হইল।" এইরূপ ভাবিয়াই কেদার ধীরে ধীরে পাপের দিকে যাইতে লাগিল। তাহার মনে একদিন পাপের প্রতি যে ভয়ানক ঘৃণা ছিল, তাহা ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে লাগিল। বয়সের বড় যাঁহারা, তাঁহারা অনেক খারাপ বিষয়ের কথাও হয়ত বলিয়া থাকেন, সুতরাং বালক কেদারের সেখানে যাওয়া উচিত নয়, তাহাদের সহিত অধিক মেশা উচিত নয়, এইরূপ কথা অনেকে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনায় কেদারের যখন কিছুই ত্রুটি নাই, তখন তাহাকে কে সাহস করিয়া বারণ করে? কেদার সর্ব্বনাশের পথে যাইতে বসিল।

যখন কেদার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে, তখন তাহার বিবাহ হইল। বিবাহ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ আর একটু পরিষ্কার হইল। তাহার সঙ্গীগণ এই উপলক্ষে তাহাকে এরূপ কুৎসিত ঠাট্টা করিতে লাগিলেন, যে শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। এক দিন তাঁহার একজন বন্ধু বলিলেন, "ভাই, নূতন বিবাহ করিলে, আমাদের কিছু নূতন জিনিষ খাওয়াও।" মিঠাই, সন্দেশ, প্রভৃতি, অনেক জিনিষের নাম করা হইল কিছুই বাবুদের পসন্দ হইল না, কারণ তাহা নূতন নহে এবং তাহার দাম অনেক। অবশেষে একজন বলিলেন "এক বোতল মদ আন—চারি আনা হ'লেই সকলের চলিবে।" কেদার প্রথম একটু আপত্তি করিল, শেষে ভাবিল "তা, আমিত খাবনা, ইহাঁদের দিই না কেন।"—মদ আসিল। হো! হো! করিয়া সকলে মদ খাইলেন। কেদারকে ছাড়ে কে? চক্ষুলজ্জায় তাহাকেও খাইতে হইল।

একদিন খাইলে আর তাহাকে ছাড়ে কে? "আমি মদ খাইনা" একথা বলিবার যো নাই, অথচ "মদ খাইবনা" এতটুকু মুখের জোরও নাই, কাজেই কেদার গেল।

এইবার কেদারের এণ্ট্রান্স দিবার বছর কিন্তু দলে পড়িয়া কেদারের পড়া শুনার দিকে অধিক মন রহিলনা। এদিকে যে বাড়ীতে কেদার ছিল, সেই বাড়ীর কর্ত্তা কেদারের খারাপ চরিত্রের কথা শুনিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। কেদার অহঙ্কার এবং রাগে পূর্ণ হইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর কি হইল, তাহা আমরা বলিব না; ভয়ানক কষ্টে, ভয়ানক দুঃখে, কেদারের দিন যাইতে লাগিল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষাতো কোথায় গেল! ক্রমাগত ৭ বছরকাল কেদারনাথকে পথে পথে ঘুরিতে হইল,—কখনও কেরাণীগিরি, কখনও নকলনবিশি, কখনও অন্যান্য সামান্য কাজ করিয়া কেদার নিজের পরিবার প্রতিপালন

করিতে লাগিল, কিন্তু অল্পদিনে কেদার ভয়ানক মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া কেহই তাহাকে বিশ্বাস করেনা। একদিন অল্প মদ খাইয়া বাড়ীতে আসিয়া নিজের দুর্ভাবনা ভাবিতেছিল, তখন তাহার দুটী মেয়ে হইয়াছে, কিন্তু কষ্টে অত্যাচারে বাপ মা মরিয়া গিয়াছেন। কেদার ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকার দেখিতে লাগিল, এবং মদ খাইয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাইবে বলিয়া প্রায় আধবোতল মদ খাইল। পরদিন প্রাতে তাহার স্ত্রী উঠিয়া দেখিল কেদার মরিয়া রহিয়াছে। তখন তাহার স্ত্রীর ক্লেশ কে দেখে! ত্রিসংসারে সেই অভাগিনীর আপনার জন কেহ ছিলনা, দুঃখিনী কোথায় যায়? তবুও অনেকদিন কষ্টে সৃষ্টে গেল। কিন্তু আর চলেনা। অবশেষে নিরাশায় পূর্ণ হইয়া সে দুটী মেয়েকে সঙ্গে লইয়া ঘরের বাহির হইল। তোমরা দেখ মদে কি সর্ব্বনাশ করিল! ওই দেখ আজ একটী স্ত্রীলোক পথের ভিখারিণী হইল। ছল ছল চক্ষে, মলিন মুখে, দুটী মেয়েকে সঙ্গে করিয়া কেদারের স্ত্রী দেশে দেশে গৃহস্থের বাড়ীতে যায় এবং বলে "ভিক্ষা দেও গো।"

আহা! উহাকে দয়াকর। মাতালের স্ত্রীকে দয়া কর, এবং মদে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া মদকে ঘৃণা করিতে শেখ।

বিবিধ সংবাদ।

বিগত ১লা ডিসেম্বার শনিবার বড় লাট লর্ড রিপণ কলিকাতায় আইসেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য রেলের ঘরের নিকটে প্রায় ৫০,০০০ লোকের ভিড় হয়। কেহ বাদ্য বাজাইয়াছিল, কেহ নিশান উড়াইয়াছিল, কেহবা রাশি রাশি ফুল ছড়াইয়াছিল। আমরা বড় লাট সাহেবকে বড় ভাল বাসি, কারণ তিনি যাতে আমাদের উপকার হয় এই চান।

ওরা ডিসেম্বার, সোমবার মহারাণীর তৃতীয় পুত্র ডিউক অভ্ কনাট তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার আসাতে সহরের সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, তাহার শেষ দিনে খুব আলো দেওয়া হয় এবং নানা রকমের বাজি পোড়ান হয়। এক খানি খবরের কাগজের সম্পাদক বলেন "বাজি না পোড়াইয়া, খুব ঘটা করিয়া গরিব দুঃখীদিগকে খাওয়াইলে বা তাহাদিগকে কাপড় দিলে ভাল হইত।"

আজ কাল চারি দিকেই তামাক খাওয়া ও মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে সভা হইতেছে। শুনিলাম সংপ্রতি কোড়কদি গ্রামে এইরূপ একটী সভা হইয়াছে। তথাকার যুবকদিগের সকলেরই এই সভাতে যোগ দেওয়া উচিত। নেশা একেবারে ছাড়িয়া দিবা প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম সহি করিলেই তো আপদ চুকিয়া যাইতে পারে। হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে অভ্যাসের জন্য প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু শেষে বেশ সহ্য হইয়া যায়। এইরূপে অনেক বড় বড় মাতাল ভাল হইয়াছে, যাঁরা তামাক খান, তাঁরাতো দূরের কথা। যদি বাস্তবিক মনে প্রতিজ্ঞা জন্মে, তাহা হইলে কার সাধ্য আমাকে লোভে ফেলে?

কয়েক মাস গত হইল, ইংলণ্ডের কোন এক গ্রামে একজন লোক এক বোতল মদের জন্য তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করে। স্ত্রীও সেই দ্বিতীয় লোকটীকে বিবাহ করে। জজ সাহেব জানিতে পারিয়া স্ত্রীলোকটীকে সাজা দিয়াছেন এবং দ্বিতীয়বারের বিবাহটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কি লজ্জার কথা! মাতাল হইলে কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে? ছি! ছি! ছি!

কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী গত ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে খুলিয়াছে। যতগুলি অঙ্গন বা ঘর, এক এক দেশের দ্রব্যে সাজান হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারত-অঙ্গন অর্থাৎ যে ঘরে আমাদের দেশের দ্রব্যজাত আছে, তাহাই সব চেয়ে ভাল বোধ হয়।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে এই এক বৎসরের মধ্যে 'সখা'র একজন বালিকা পাঠিকা এবং একজন বালক পাঠকের মৃত্যু হইয়াছে। বালিকার নাম শ্রীমতী আশালতা এবং বালকের নাম শ্রীমান জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র। ছেলেটী যে 'সখা' অতি যত্নের সহিত পড়িতেন, তাহার অনেক প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। বাঁচিয়া থাকিলে ইহাঁরা নিশ্চয়ই 'সখা'র দ্বারা নানারূপে উপকার পাইতেন। ঈশ্বরের ধন ঈশ্বর লইয়াছেন, তাহার উপরে আর কি বলিব!

মদে অনেক অনিষ্ট করিতেছে, তাহাতে আবার খোলা ভাঁটী হইয়া সব দিকে মদ সস্তা হওয়াতে আরও ক্ষতি হইতেছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আমাদের বাঙ্গালা দেশের ছোট লাট সাহেব কয়েকজন সাহেব এবং বাঙ্গালী লইয়া একটী কমিশন বা সভা করিয়াছেন; তাঁহারা দেশে বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় মদে কিরূপ অপকার হইতেছে, তাহা দেখিবেন। ইহাঁরা সম্প্রতি বেহার অঞ্চলে গিয়াছেন। দেখা যাউক, ইহাঁদের চেষ্টায় মদের তেজ একটু কমে কি না।

নীচের লিখিত ঔষধগুলির কথা এক খানি কাগজে বাহির হইয়াছে:—

শিশুদিগের জ্বরের মহৌষধ।—পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগের জ্বর হইলে এইরূপ ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী হইবে;—অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ মানকচুর সরু সরু সাদা শিকড় লইয়া আড়াই খানি গোল মরিচের সহিত বাটিয়া খাওয়াইতে হইবে। ইহা প্রতিদিন একবার করিয়া সেবন করাইলে তিন চারিদিনের মধ্যে জ্বর ভাল হইয়া যায়।

কাশি।—শিশুদিগের কাশি হইলে পাতলা সিসির গুঁড়ো (ধুলির ন্যায় সরু) কিঞ্চিৎ মধু অঙ্গুলি করিয়া লইয়া প্রত্যহ জিহ্বায় ঠেকাইয়া দিলেই তিন চারিদিনের মধ্যে কাশি ভাল হইয়া যায়।

পিপীলিকানিবারক।—যে সকল খাদ্য দ্রব্যে সচরাচর পিপীলিকা ধরিয়া থাকে, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ কর্পূর ফেলিয়া রাখিলে পিপীলিকা আর সে সকল খাদ্যদ্রব্যের নিকট আসিতে পারে না।

পিপীলিকা, বোলতা ও ভিমরুল কামড়াইলে গোময় দ্বারা দষ্ট স্থান আবদ্ধ করিলে আরোগ্য হয়।

কৃমিনাশক।—আনারসের পাতার একছটাক আন্দাজ রস অল্প পরিমাণ চূনের জলের * সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কৃমি একেবারে বিনষ্ট হয়।

শাল রেশমী ও পশমী কাপড়ের সহিত কালজিরা ও মাথাঘসার সহিত যে পচা পাতা ব্যবহৃত হয়, সেই পচা পাতা রাখিলে উক্ত সকল প্রকার বস্ত্র পোকায় কাটিতে পারে না।

ধাঁধা।

১। তিনটী জেলের মেয়ে কচ্ছপের ডিম লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে গেল; একজন ৫০, দ্বিতীয় জন ৩০, এবং তৃতীয় জন মোটে ১০টী লইয়া গেল। প্রথমে ডিমের যে দর ছিল, তাহার পর তাহা অপেক্ষা অনেক চড়িয়া গেল। সকলেই এক দরে বিক্রয় করিল; যখন বাজার নরম ছিল, তখন নরম দরে এবং যখন চড়া হইল, তখন চড়া দরে, এইরূপে দুইদরে তাহাদের সমস্ত বিক্রয় হইল।—ঘরে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহারা দেখে সকলের সমান পয়সা হইয়াছে! কেমন করিয়া হইল বল দেখি?

২। দুটী অক্ষরে আমার নাম, শুনিলে মনে হয় আমাকে দেখা যায় না, অথচ দিনরাত খোলা থাকি; আমি একটী সহর। আমার ঘরে অনেক মুসলমান বাস করে; আমার স্কুল কালেজে অনেক ছেলে মানুষ হয়, বলত আমি কে?

৩। বলত কোন্ পশুর গলা কাটিয়া একটু না দিলেই, দিব্যি একটী বাচ্ছা হয়?

৪। একটী ছোট গোয়ালের মধ্যে দুটী গরু বাঁধা, একটী পূর্ব্ব দিকে, আর একটী পশ্চিম দিকে। ছোট ঘর, ঘুরাইয়া বাঁধিবার যো নাই। এখন বল দেখি কোন্ যায়গায় খড় রাখিলে দুটো গরুতেই খেতে পাবে?

কে মজা কোরবে?

"বোতলের ভিতর হাঁসের ডিম্,
বাহবা বাহবা!!"

একটা মুখ সরু বোতল আন, তাহার ভিতরে খানিক জল রাখ। তার পর হাঁসের ডিমটী একটা পাত্রে সির্কেতে* ভিজাইয়া খানিক রাখ, পরে যখন দেখিবে ডিমটী বেশ নরম হইয়াছে তখন আস্তে আস্তে লইয়া "দেখো বাবু! দেখো বাবু!" বলিয়া সেই বোতলের মুখ দিয়া ঠেলিয়া দাও। জলে পড়িলেই ডিম আবার কঠিন হইবে; তখন জল ফেলিয়া দিয়া বলিবে "বোতলের ভিতর আস্তো ডিম! বাহবা বাহবা।" কেমন?

"একটা পাতায় কুড়ীটী গাছ,
বাহবা বাহবা!!"

(২) একটা বড় পাতরকুচী পাতা সূতাতে বাঁধিয়া ঘরের খড়খড়ীতে টাঙ্গাইয়া রাখ, দিন কতক পরে পাতাটীর সর্ব্বাঙ্গে প্রায় ২০। ২৫ টী চারাগাছ বাহির হইবে, তখন তাহাকে লইয়া সকলকে দেখাইবে "একটা পাতায় ২০টী গাছ, বাহবা বাহবা!!" কেমন?

"ছাইএর সূতায় আংটী ঝোলে,
বাহবা বাহবা!!"

(৩) এক গাছি সূতাতে একটী ছোট আংটী বাঁধিবে। ঠিক স্থির হইলে পর তাহাতে একটী দেশলাই ধরাইয়া দিবে; আস্তে আস্তে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, তথাপি আংটী ঝুলিবে। সূতাটী কিন্তু পূর্ব্বে খুব লবণ গোলা জলে ভিজাইয়া পরে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হইবে। দেখিয়া সকলে অবাক হইবে, তুমি বলিবে "ছাইএর সূতোয় আংটী দোলে বাহবা বাহবা"। কেমন?

বিজ্ঞাপন।

গত বৎসরে যাঁহারা 'সখা'র গ্রাহক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পাঠাইতে বারণ করেন নাই, তাঁহাদের সকলেরই নিকট নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা পাঠান গেল। যাঁহারা জানুয়ারি মাসের মধ্যে মূল্য না পাঠাইবেন বা মূল্যের সম্বন্ধে পত্র

* একটা বোতলে খানিকটা চূন এবং জল একসঙ্গে ঝাঁকড়াইয়া কিছুকাল রাখিয়া দিলে চূনটা তলায় পড়িয়া গিয়া উপরে যে জল থাকে তাহাকেই চূনের জল বলে। ইহাই আস্তে আস্তে ঢালিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়।

* সির্কা বা ভিনেগার ডাক্তারী ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

লিখিবেন, অথবা যাঁহাদের নিকট হইতে 'সখা' ফিরিয়া আসিবে, তাঁহাদের নিকট আর 'সখা' পাঠান যাইবে না।

কেহ কেহ এজেণ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অপরিচিত স্থলে অগ্রিম মূল্য জমা না রাখিলে, আমরা কাহাকেও এজেণ্ট করিতে পারি না। এজেণ্টদিগের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যিনি ১০ খণ্ড বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে একখণ্ড বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে; টাকা লইতে ইচ্ছা করিলে ঐ হিসাবে টাকা দেওয়া যাইতে পারে।

সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

আমাদিগের আগামী বর্ষের পুরস্কার।

গত বৎসরে ধাঁধার জন্য শ্রীমতী অলকাসুন্দরী রায়ের একটী পুরস্কার এবং চিত্রের জন্য আমাদের একটী পুরস্কার ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত বৎসর কেহই ঐ দুটী পুরস্কারের উপযুক্ত হন নাই। সুতরাং এবৎসরেও ঐদুটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া, আমরা আরও কতকগুলি পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সমস্ত পুরস্কারের খবর আগামী মাসে প্রকাশ করিব।

সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

সখা-সক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৴১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া ৴০ এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্তত: একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখাসংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

৮। ঠিকানা পরিবর্ত্তন তিন মাসের কম সময়ের জন্য হইলে, তাহা করা যাইবে না; অল্প সময়ের জন্য হইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরের সহিত পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবেন।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।
সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

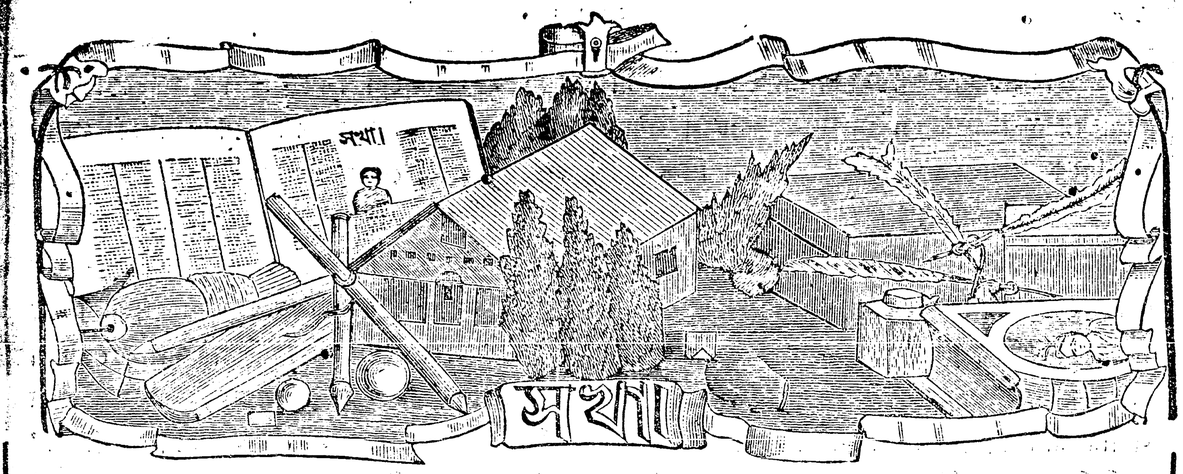

দ্বিতীয় ভাগ।] ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪। [২য় সংখ্যা।

কার জিৎ।

অক্রোধেন-জয়েৎ ক্রোধম্-অসাধুংসাধুনাজয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন-জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধুতাদ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক, এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক।

রায়পুরের বাগানটির বড় শোভা হইয়াছে। গাছে গাছে লতা উঠিয়াছে, পাতায় পাতায় বিকালবেলার সূর্য্যের সোণার কিরণ ঝিকমিক করিতেছে, বকুল ও সিউলির তলায় ফুলের তারা ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাগানের মাঝে মাঝে দূর্ব্বাদলের ঘন বনগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগের জন্য বিছানা পাতিয়াছে। রায়পুরের যত বালিকা এ সময় এখানে খেলিতে আসিয়াছে। কেহবা ফুল কুড়াইতেছে, কেহবা ঘুটিয় খেলিতেছে, কেহবা গাছের তলায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

ঐখানে একটি বকুল গাছের তলায়—অমলা ও বিমলা ফুল কুড়াইতে মত্ত। টুপটাপ করিয়া একবার এখানে, একবার ওখানে, একবার অমলার মাথায়, একবার বিমলার গায়ে ফুল পড়িতেছে। তাহারা একটি তুলিতে গিয়া একটি মাড়াইতেছে, কতকগুলি আঁচলে রাখিবার সময় কতকগুলি ফেলিয়া দিতেছে।

ফুল আঁচলে রাখিতে বিমলা একবার উঠিয়া দাঁড়াইল, বুঝি তখন কাহাকে এইদিকে আসিতে দেখিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ওলো অমি, ঐদিকে চল ভাই, ঐ আসছে।" অমির ভয়ে আঁচল হইতে ফুল পড়িয়া গেল, আর পা সরিলনা, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল।

দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী অন্য বালিকাদের প্রতি বড় অত্যাচার করিত। সেই জন্য তাহাকে সকলে ভয় করে, তাহাকে সকলে যম মনে করে। কিন্তু লক্ষ্মীর পিতা গ্রামের মধ্যে ধনী সেই জন্য লক্ষ্মী যাহা ইচ্ছা করিলেও অন্য কেহ কথা কহিতে সাহস করেনা। লক্ষ্মীও দেখে সে যাহাই করুক কিছুতেই তাহার শাস্তি হয় না, সে নির্ভয়ে যাহা ইচ্ছা, করে।

লক্ষ্মী আসিয়া মুখ বেঁকাইয়া, চোখ রাঙ্গা করিয়া, অমলার হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিতে টানিতে বিমলাকে বলিল "হ্যাঁলা বিমলি, তোদের কি বুকের পাটা? সেদিন বারণ করেছি এগাছের তলায় তোরা কেউ ফুল কুড়াবি নে, আবার এসেছিস? এবার এখানে দেখ্‌তে পেলে হাড় ভেঙ্গে দেব।" অমলা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল, বিমলা আস্তে

আস্তে অমলার হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। লক্ষ্মী তাহাদের আঁচলের ফুল আপনার আঁচলে লইয়া চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে যেখানে কিছু দূরে কয়েকটি বালিকা ঘুটিম খেলিতেছিল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। লক্ষীকে দেখিয়া বালিকাগুলি একটু ভয়ে ভয়ে খেলিতে লাগিল।

লক্ষ্মী বলিল "আমি খেলিব।" একজন আস্তে আস্তে বলিল "এ হাতটা আগে হার জিৎ হোক।" লক্ষ্মীর রাগ হইল, সে বলিল "কি আমাকে লইয়া খেলিবিনে? দেখিব তোদের এহাত কে খেলিতে দেয়" বলিয়া সমস্ত ঘুটি গুলি চারি দিকে ফেলিয়া দিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইবা মাত্র তাহার পৃষ্ঠ দেশ লক্ষ্য করিয়া মারিবার ছলে সকল বালিকারা হাত উঠাইয়া আস্তে আস্তে গালি দিতে লাগিল, তাহার সাক্ষাতে ত ভয়ে কিছু বলিতে পারেনা, কাজেই সকলে তাহার পশ্চাতে এইরূপ শোধ তুলিয়া থাকে।

লক্ষ্মী সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া দেখিল কুসুম কুলগাছ হইতে কুল পাড়িতেছে। লক্ষ্মী একে রাগিয়া আছে, কুল পাড়িতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল, লক্ষ্মী জানে সেই বাগানের ফল লক্ষ্মী ভিন্ন আর কাহারো পাড়িবার অধিকার নাই, কিছু না কহিয়া না বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়াই লক্ষ্মী কুসুমকে এক চড় বসাইয়া দিল, কিন্তু চড় মারিয়া হাত সরাইয়া লইবার সময় তাহার হাতটি সেই কুল গাছের শাখায় পড়িয়া, কাঁটায় বিঁধিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

কুসুমের প্রাণে তাহাতে বড় বেদনা লাগিল, লক্ষ্মী যে তাহাকে মারিয়াছে, লক্ষ্মী যে তাহার প্রতি অত্যাচার করে সে তাহা ভুলিয়া গেল। কাছে পুষ্করিণী, কাঁদ কাঁদ চোখে কুসুম লক্ষ্মীকে ধরিয়া তাহার তীরে আনিয়া বসাইল, তাহার পর আপনার আঁচল ছিঁড়িয়া তাহা ভিজাইয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া তাহাতে বার বার জল দিতে লাগিল।

লক্ষ্মী কাহারো নিকট এরূপ প্রতিশোধ পায় নাই, লজ্জায় অনুতাপে সে মরিয়া গেল। কুসুমের ব্যবহারে তাহার হৃদয়ের একটি লুকান তারে আঘাত লাগিল, এতদিন তাহা কেহ জাগাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী বলিল "কুসুম আজ তুমি আমাকে যাহা শিক্ষা দিলে এ পর্য্যন্ত তাহা আমাকে কেহ শিখায় নাই। তোমার এ উপকার আমি জন্মে ভুলিব না; এই কথা মনে করিয়া আমি তোমার মত হইতে চেষ্টা করিব।" সেই পর্য্যন্ত লক্ষ্মী একেবারে বদলাইয়া গেল, আর লক্ষ্মীকে কাহারো প্রতি অত্যাচার করিতে দেখা যায় না। যখনি অভ্যাস বশতঃ লক্ষ্মী কাহাকেও মারিতে যায় অমনি সেই দিন কার ঘটনাটি মনে পড়ে, অমনি তাহার মনে অনুতাপ জাগিয়া উঠে, অন্যায় কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে বল পায়, কুসুমের মত ভাল হইতে সংকল্প করে।

এইরূপ প্রতি মন্দ কাজে কুসুমের ছবি আসিয়া তাহাকে তাহা হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল, লক্ষ্মী ক্রমে যথার্থ লক্ষ্মী হইয়া দাঁড়াইল।

* * * * *

* * * * *

ইহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে, লক্ষ্মীর এখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কতদিন পরে লক্ষ্মী শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। লক্ষ্মী এখন সকলকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছে, লক্ষ্মীকেও এখন সকলে ভাল বাসে। লক্ষ্মীর আগেকার যত সমবয়সী সকলেই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে, কেবল কুসুম আসে নাই। কুসুম কোথায়? কুসুম বুঝি এপৃথিবীর মেয়ে নয়, স্বর্গে ফুটিতে গিয়াছে!

লক্ষ্মী বিকালে সেই ছেলেবেলার বাগানটিতে আসিল, বাগানের চারিদিকে বিষণ্ণ মনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাহিয়া দেখিল। ছেলেবেলা যেখানে যে গাছ গুলি দেখিয়াছিল সকলি তেমনি দেখিল, ছেলেবেলা যেখানে যার সহিত যেমন করিয়া খেলা করিয়াছিল, সকলেরি চিহ্ন যেন দেখিতে পাইল। লক্ষ্মী আস্তে আস্তে সেই কুল গাছটির তলায় আসিয়া দাঁড়াইল,—এইখানেই তাহার জীবনের প্রথম শিক্ষা। লক্ষ্মী সেখান হইতে সেই পুকুর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল,—এইখানে কত যত্ন করিয়া কুসুম তাহার আহত হাত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিরূপ প্রতিশোধ দিয়া লক্ষ্মীকে সে ভাল করিয়াছে! অশ্রুজলে লক্ষ্মীর বুক ভাসিয়া গেল। লক্ষ্মী মনে মনে বলিল "কুসুম কোথায় তুমি! তোমাকে আর পৃথিবীতে দেখিতে পাইলাম না, তুমি এখন স্বর্গের দেবী,—কিন্তু লক্ষ্মীর হৃদয়ে তুমি চিরকালি ফুটিয়া থাকিবে।"

সুশীলা ও তাহার মা।

সুশীলার মা আজ পীড়িতা হইয়া শয্যায় শুইয়া আছেন, সুশীলা মার কাছে বসিয়া রহিয়াছে; তাহার আর জগতে কেহ নাই, কেবল তাহাদের দুঃখে দুঃখী যাদুমাসীই মধ্যে মধ্যে তাহাদের দেখিতে আসেন ও সাহায্য করেন। সমস্ত দিন বালিকার আহার হয় নাই, কিন্তু তাহাতে তাহার কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না, মার অসুখে আর জগতে অন্য সুখ সে জানে না! এত রাত্রি হইয়াছে বালিকার চক্ষে নিদ্রা নাই, মা কতবার বলিতেছেন, সে শুনিতেছে না, সুশীলা চুপ করিয়া মার মাথায় হাত বুলাইতেছে ও ভাবিতেছে। আহা! জগৎ-শুদ্ধ লোক আনন্দমনে নিদ্রা যাইতেছে, সুশীলার নিদ্রা নাই, ক্ষুধা নাই। যে, দিনে রাত্রিতে ৩ বার আহার করিত সেই নবম-বর্ষীয়া বালিকার আজ সমস্ত দিন আহার হয় নাই। সুশীলা অনেকক্ষণ পরে "ফোষ্" করিয়া একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। মা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "হা ঈশ্বর! বাছা আমার আহার নিদ্রাতেও বঞ্চিত হইল? তা মা তুমি তোমার মাসীর নিকট চাট্টী খেয়ে এলে না কেন?"

সুঃ—"না মা আমি খাওয়ার জন্য ভাবিতেছি না, তুমি এই যে প্রায় দুদিন কিছু খাওনি, মা?" জননী জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তুমি কি ভাবিতেছ?" "আমি ভাবিতেছি যে, তুমি বলিয়াছ, পরমেশ্বর পরম দয়ালু, আরও তুমি যে বলিতে তিনিই আমাদের সহায়? তা' মা! তিনি কেন আমাদের এমন কষ্টে ফেলেন? এই দেখ, কত লোকের কত আছে; দাদা, মামা, কাকা, বাবা, ঘোড়া, গাড়ী, চাকর, দাসী, তাত আমাদের নাইই। তুমি আমার ছিলে আমরা সমস্ত দিন একত্রে থাকিতাম, তাহাতেও কত সুখী ছিলাম, এতেও তিনি কেন বাধা দিলেন? তোমার আবার জ্বর হইল কেন? হাঁ মা! তুমি ত, অনেক কথা আমায় বুঝাইয়া দিয়াছ, এবার কিন্তু এইটী বলিতে হইবে, আমাদের অসুখ হয় কেন? তিনি ত যাহা করেন সমস্তই আমাদের মঙ্গলের জন্য। আচ্ছা রোগ কি আমাদের মঙ্গলের জন্য? তা যদি না হয়, তবে দয়ালু পরমেশ্বর কেন মানুষকে রোগ দিয়াছেন?"

ব্যামোয় পড়েও মার মুখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কন্যার মুখে ঈশ্বরের কথা শুনিয়া তিনি রোগের জ্বালা ভুলিয়া গেলেন, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় সুশীলাকে আজ আর একটী নূতন কথা শিক্ষা দিবেন এই আনন্দে তাঁহার শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি ধীরে ধীরে দেয়ালে ঠেষ দিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন:—"পরমেশ্বর যথার্থই মঙ্গলময়, মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার নিকট হইতে আসে না। অনেক লোক আছে তাহারা মৃত্যু, রোগ, শোক প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার নিন্দা করে ও তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতে চায়। কিন্তু বুঝিয়া দেখে না যে তাহারা যাহাকে অমঙ্গল মনে করে পৃথিবীতে তাহাতে কত মঙ্গল হয়, এবং তাহারা যাহাকে সুখ বলে তাহাই পৃথিবীতে কত অনিষ্ট করে। বড় মানুষেরা সুখী, কিন্তু তাহাদের চরিত্রের যে কত দোষ তাহা কেহ দেখে না। সুখ বা

দুঃখ কিছুই আমি বুঝি না; সুখ হয় হউক, দুঃখ পাই ভাল, কিছুতেই আমার ক্ষতি বোধ হয় না। এই তোমার কচি মুখ খানি দেখিতেছি, তাহাতেও যেরূপ আমার আহ্লাদ হয়, আমি মরিয়া গেলে আর দেখিতে পাইব না তাহাতেও দুঃখ নাই। পরমেশ্বর যাহা দিয়াছেন ভোগ করিব; যাহা দেন নাই তাহার জন্য কেন দুঃখ করিব? বরং যাহা দিয়াছেন তাহার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সুখ দুঃখ কিছু মানুষের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের কারণ নয়, কিন্তু সততা ও অসততাতেই মানুষের ভাগ্যের পরীক্ষা। ঘোর দুঃখীও যদি ঈশ্বর-ভক্ত হয় ও তাঁহার নাম করে, তবে সেও মহৎ লোক; আবার লাখ টাকা পুঁজি করে, চারিতলা বাড়ীতে যে ব্যক্তি সুখে আছে, সেও যদি পাপী ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয় এবং তাঁহাকে না ডাকে, তবে সেও অতি নীচ ও হতভাগ্য। তুমি ত জান মা! যে সমস্ত বস্তুই মিথ্যা, কোন দ্রব্যই চিরস্থায়ী নয়;—সুতরাং তুচ্ছ বস্তুতে কেহ কি সুখী হইতে পারে? দিনকতক মিথ্যা বস্তুতে সুখী হইয়া পরে চিরকাল কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা, এ জীবনে সাংসারিক ক্লেশ পাইয়া যদি পরকালে সুখ পাওয়া যায় সে ত খুবই ভাল। এই জন্যই এত কষ্টেও আমার কষ্ট বোধ হয় না, তোমার মুখ দেখিয়া কত খুসী হই, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়াই পরম আনন্দ লাভ করি।

"রোগে কষ্ট হয় সত্য, সাংসারিক ক্লেশেও দুঃখ হয় বটে, কিন্তু এত প্রকৃতিরই নিয়ম, সকলেই সমান হইতে পারে না, কেহ দুঃখী কেহ সুখী হইবেই। আরও যদি স্থির হইয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে জানিতে পারি যে ইহাদের মধ্যেও মঙ্গল রহিয়াছে। মনে কর জগতে দুঃখ নাই, রোগ নাই; তাহা হইলে কি কেহ ধার্ম্মিক হইত? সকলেই সুখে মত্ত হইয়া দিন কাটাইত। ঈশ্বর, ধর্ম্ম, পুণ্য, সৎকর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় চিন্তাও করিত না। কিন্তু এখন যে কষ্টে পড়ে, রোগে শয্যাগত হয়, সে অসহায় অবস্থায় ঈশ্বরকে সহায় ভাবিয়া ধার্ম্মিক হইতে চেষ্টা পায়, সুস্থ অবস্থায় কত অন্যায় কত পাপ করিয়াছে তাহা মনে হইয়া অনুতাপ করে, এবং ভবিষ্যতে আর কুকার্য্য করিবে না, স্থির করে। দেখদেখি রোগ কেমন দরকারী? এই মাত্র যে যুবা রূপ, যৌবন, বল, ধন-মান, প্রভৃতির অহঙ্কারে পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিয়া মদ্যপানে ও অন্যায় কাজে জীবন নষ্ট করিতেছিল, হঠাৎ কুকর্ম্মের ফলে একটা উৎকট পীড়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল;—সেই গৌরবর্ণ শরীরটা মলিন হইয়া গেল, সেই বলশালী হাত দুখানি এখন আর নড়িতে পারে না, সেই অহঙ্কৃত যুবা আর এখন সেরূপ নাই। সে এবার বেশ শিক্ষা পাইয়াছে। এই অবধি প্রতিজ্ঞা করিল যে অন্যায় আর করিবে না, কারণ ঈশ্বর বৈ আর জীবের গতি নাই। সে একজন ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র লোক হইয়া উঠিল। কি চমৎকার ক্ষমতা রোগের? সংসার ও টাকাকড়ি বা বড়মানুষির আমোদ যে বৃথা ও কিছুই নয় একথাটী শিক্ষা দিতে এমন আর কি আছে? চারিদিকে ধূমধাম, আহ্লাদ আমোদ, হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ, তার মধ্যে যখন একটী রোগীকে দেখিতে পাই, তখনই মনে হয় এপৃথিবীতে এরূপ সুখে, এরূপ সুস্থ শরীরে চিরকাল থাকিব না, কাজেই ধর্ম্মের দিকে, ঈশ্বরের দিকে মন আপনিই ছুটিয়া যায়। রোগ শোকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে, যেমন সোণা অগ্নিতে পড়িলে তবে বিশুদ্ধ হয়, মানুষও তেমনি দুঃখে না পড়িলে সাধু ধার্ম্মিক হইতে পায় না। দেখ দেখি দুঃখ, রোগ, শোক মানুষের কত মঙ্গলদায়ক।"

বুদ্ধিমতী বালিকা স্থির মনে সমস্ত শুনিল, সমস্ত বুঝিল, পরে বলিল "ভাল মা, যাহারা পাপ ও মন্দ কর্ম্ম করে, তাহারাই তবে কেন রোগে পড়ে না, তোমার মত লোক, যারা রাত্রিদিন পরমেশ্বরকে ডাকে, ধর্ম্ম বৈ জানে না, তাহারা কেন কষ্ট পায়? তাহারা কেন রোগে পড়ে?" জননী সস্নেহে ক্ষণেক বালিকার মুখখানি দেখিয়া, একটী চুম্বন করিয়া বলিলেন "মা! জগদীশ্বর যে মহান্, অবোধ্য, অসীম; তাঁহার বুদ্ধির কথা প্রকাশ করি এমন সাধ্য আমার কৈ! কিন্তু যতটুকু জানি তোমায় বলিব। রোগ শোক যখন মানুষকে পবিত্র করিবার জন্যই, তখন ধার্ম্মিক লোকেরাই বা কেন রোগে পড়িবে না? মানুষ যতই উন্নত হউক, তাহার উন্নতির ত আর সীমা নাই, উহা যে অশেষ। সুতরাং যতই কেন ধার্ম্মিক হও না আরও কষ্টে পড়িলে আরও ধার্ম্মিক হইতে পারিবে। আমার কথা বলিতেছ, আমি ত কত পাপ করি, কত মন্দ চিন্তা মনে স্থান দিই, আমার ত অনেক দোষ আছে যাহা দূর করা আবশ্যক, আমার অপেক্ষা শতগুণে উন্নত ও সাধু, যাঁহারা ভ্রমেও পাপ জানেন না, ঈশ্বরই যাঁহাদের একমাত্র চিন্তার স্থল, এমন ধর্ম্মগত-প্রাণ যাঁহারা, তাঁহারাও কত কষ্টে পড়েন, রোগে কত যন্ত্রণা পান, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার কারণ এই যে দুঃখে তাঁহাদেরও উন্নতি হয় এবং তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া জগতের লোক জানিতে পারে, যে সুখ বা দুঃখ কিছুই নয়, অবস্থার প্রভেদ মাত্র, ধর্ম্মই সারবস্তু। আরও তাঁহাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া লোকে শিক্ষা পায়, অশেষ দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও সাধু ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কেমন অচলভাবে ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন ও কেমন সন্তোষের সহিত দিন কটান;—তাহা দেখিয়া জগৎ-শুদ্ধ লোক অবাক হয়, এবং ধর্ম্মই যে মানুষের রোগে, শোকে, দুঃখে যন্ত্রণায় একমাত্র সহায় ও সুখদাতা বন্ধু, তাহা জানিতে পারে। ধার্ম্মিক লোকের নিকট রোগ শোক যে কিছুই করিতে পারেনা, তাহা শিক্ষা পায়। সুতরাং রোগ প্রভৃতি সাংসারিক অমঙ্গল সর্ব্বদাই অশেষ কল্যাণ করিয়া থাকে, ইহারা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছার ফল স্বরূপ। ইহাতে দুঃখ বোধ করিতে নাই, অসন্তুষ্ট হওয়া অন্যায়। যাঁহারা সৎ, পবিত্র, ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী তাঁহারা কিছুতেই কাতর হন না। মঙ্গলময় ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই ভাল, যে অবস্থায় আমাদিগকে রাখেন সেই সুখের অবস্থা। কেবল যদি তাঁহাকে আমরা মনে রাখিতে পারি তাহা হইলেই ঘোর দুঃখকেও সুখ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার প্রতি যাহাদের ভক্তি আছে তাহারা অমূল্য ধন পাইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি-ছাড়া হইয়া কোন অবস্থাতেই সুখ নাই। তাই মা! কখন ও তাঁহার কার্য্যকে মন্দ বলে সন্দেহ করিও না। আজ এস নিদ্রা যাই।"

তৎপরে সুশীলা হাত দুটী যুড়িয়া জানুপাতিয়া মায়ের পার্শ্বে বসিল, এবং পরম করুণাময় পরমেশ্বরকে ডাকিয়া মাতৃপার্শ্বে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। আহা! ধন্যা সেই মা, যিনি এমন কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন, তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গবাস করেন। ধন্যা সেই বালিকা, যে এমন মাতা পাইয়াছে, তাহার কুড়ে ঘরও রাজার বাড়ীর মতন, এবং দুদিন না খাইলেও সে মধু খাইতেছে।

শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা।

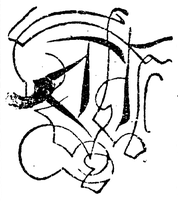

বালক বালিকাগণ, তোমাদিগকে বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেই লজ্জা বোধ হয়, অথচ বলিতেই হইবে। আমাদের সমাজ এরূপ এবং অভিভাবকগণ এমন অন্ধ যে তোমাদিগকে ভিন্ন আর কাহাকে ও বলিতে পারিনা।

বিবাহ কাহাকে বলে, তাহা তোমরা জাননা, কিন্তু না জানিলে কি হয়, আর কয়েক বৎসরের মধ্যে তোমাদিগের ও বিবাহিত হইতে হইবে। তোমরা চাও, আর না চাও, তোমরা জান আর

না জান, কিন্তু সমাজ তোমাদিগকে ছাড়িবে না, তোমাদিগের পায়ে বেড়ী দিবেই দিবে।

"ইংরাজ দিগকে দেখিয়াছ? কেমন বলবান, সাহসী ও ধনী! কত দূর হইতে আসিয়াছে, কত অল্প লোকে তোম দিগের এত কোটী লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে! তোমরা এমন পারনা কেন? কারণ অল্প বয়সেই বিবাহিত হইয়া তোমরা সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। দারিদ্র্য ও সংসারের জ্বালায় আর উচ্চতর প্রবৃত্তি সকল থাকে না। তোমরা বিদেশে যাইতে ভয় কর, প্রাণ দিতে পার না, কারণ তোমাদের পরিজন গণের কি উপায় হইবে! তোমরা স্কুল ছাড়িলেই চাকরী লইতে হইবে, নতুবা তোমাদের সন্তান গণ উপবাস করিবে। সুতরাং এই বাল্য বিবাহই তোমাদের সকল উন্নতির কণ্টক।

আবার দেখ, ঐ যুবক ১৮ বৎসর বয়সে সন্তানের পিতা হইল, উহার সন্তানের পীড়া সারিতেছে না, তাহার শরীর ও সবল হইতেছেনা—সে যদি বাঁচিয়াও থাকে, তথাপিও কোন কার্য্য করিতে পারিবেনা, এবং বাঁচিবে কি না তাহাই সন্দেহ। আবার তাহার পিতাকে দেখ, শরীর কেমন রুগ্ন, পড়া শুনা হইলনা। বল দেখি কেন? বাল্য বিবাহই ইহার কারণ।

ঐ সন্তানের মাতার দিকে চাহিয়া দেখ, তাহার বয়স ১৩ বৎসর। সে বালিকা, খেলিতে চায়, পড়িতে চায়, কিন্তু তাহার সন্তান তাহকে দেয় না! তাহার শরীর কত দুর্ব্বল, চাহিয়া দেখ, সন্তান হওয়ার পর হইতে তাহার আর রোগ ছাড়েনা। সে বোধ হয় ২৫ বৎসরের অধিক বাচিবে না। ইহার কারণ কি জান? বাল্য বিবাহ।

পাড়ার ঐ যুবককে দেখ, তোমরা মনে কর উহার বয়স ৪০ বৎসর, কিন্তু তাহা নয়, উহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই তাহার পাঁচটী সন্তান উহার আয় মাসিক ২০৲ টাকা, পরিবারের আহারের ব্যয় ১৯৲ টাকা, আর এক টাকা যাহা অবশিষ্ট আছে, তদ্দ্বারা ছেলেদের বস্ত্র দিবে, না ঔষধ দিবে, না পড়িবার সংস্থান করিবে। দেখ ইহাদের কেমন কষ্ট। কয়েক মাস হইল, উহার একটী সন্তান নষ্ট হইয়াছে, কারণ তাহার রোগ হইয়াছিল, সে সামান্য রোগ কিন্তু উত্তম চিকিৎসা হয় নাই, কারণ চিকিৎসার ব্যয় কোথা হইতে দিবে! এইরূপে অনাহারে রোগে শোকে যুবকের মুখ সর্ব্বদা মলিন। তোমরা এইরূপ ক্লেশ চাও? যদি না চাও তবে বাল্য বিবাহ করিওনা।

আর কত প্রকারে তোমাদিগকে বলিব, শত শত প্রকারে বাল্য বিবাহ দেশের ও সমাজের নানা অনিষ্ট করিতেছে। বাঙ্গালী পরিবারে যত অকাল-মৃত্যু, শোক, দারিদ্র্য, রোগ, দেশের যত অভাব সকলই এই বাল্য বিবাহ জনিত। অতএব সাবধান! এই রাক্ষসকে সমূলে বিনষ্ট কর।

তোমরা আর কএক বৎসর পরেই দেখিবে, পিতা আজ তোমাদিগকে এই দুঃখ-বন্ধনে বান্ধিতে যত্ন করিতেছেন। পিতামাতা পরম পূজনীয়, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদের অসঙ্গত কথাও যে মান্য করিতে হইবে তাহা নহে। তোমরা কাহারও কথায় বাল্য বিবাহ করিওনা। সাবধান শিশুগণ এই অনিষ্ট-স্রোতকে আর প্রবাহিত করিওনা।

ক্রমশঃ

অবোধ ছেলে।

ছি! ছি! ছি! প্রিয়! তোমাকে কতদিন বলেছি, যদি বনের পাখীকে ধরে নিয়ে এসেছ তবে তাকে সময়ে খেতে দিও। দেখদেখি, পাখী মরেগেছে! এখন কার দোষ দিই বলতো?

মায়ের এই কথা শুনিয়া প্রিয়নাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমি ঝিকে খাবার দিতে বলে মামার বাড়ীতে গেলাম, ঝি কেন খাবার দিলেনা? অ্যাঁ, অ্যাঁ, সে কেন খাবার দিলেনা? আমার দোষ কি?"

মা বলিলেন—"ওরে মূর্খছেলে! ঝি কি তোমার কথা শুনতে পেয়েছিল? আর শুনতে পেয়েও যদি না দিয়ে থাকে, তা'হলেই বা তার অপরাধ কি? তার অনেক কাজ, হাতের কাজ গুলো না শেষ করেতো অন্য কাজে যেতে পারেনা। ঝি কি বন থেকে পাখী কুড়িয়ে এনেছিল? আহা হা! বনে থাকিলে পাখীটী কত সুখে থাকিত। হাজার হাজার ঝাঁক বেঁধে কেমন মনের আনন্দে আকাশে উড়ে বেড়াত। কত ভাল ভাল ফল খেত! তা এসব সুখ থেকে তাকে টেনে আন্‌তেই বা তোমায় কে বলেছিল; আর এমন করে খেতে না দিয়ে মেরে ফেল্‌তেইবা কে বলেছিল?" বালক আর কোন কথা বলিতে পারিলনা; কেবল কাঁদিতে লাগিল।

মা বলিলেন "দেখ বাছা! নিজের জন্য পাখীকে খাঁচায় পূরে রেখেছিলে, এই তো এক অন্যায় কাজ, তারপরে যদি তাকে ভাল খেতে দিতে, যত্ন কর্‌তে, তাহলেও কতক সুখের কথা ছিল, কিন্তু তাতেও তোমার মন উঠলোনা,—আবার না খেতে দিয়ে মেরে ফেল্‌লে? এ বড় অন্যায় কাজ হয়েছে, তা'বোধ হয় বুঝ্‌তে না পেরেই এরূপ করেছ। তা' যাক্, ভবিষ্যতে সাবধান হ'ও, নিজের সুখের জন্য কাহাকেও মিছামিছি ক্লেশ দিওনা। আরও বিশেষ, যারা কথা বলে মনের কষ্ট জানাতে পারেনা, কি নিজের দুঃখ দূর কর্‌তে পারেনা, কখনও তাদের প্রতি অত্যাচার ক'রনা।"

রামধনু।

কোন একটী স্কুলে বিকালে ছুটী হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া ছাত্ররা তখনও বাড়ী যায় নাই। কয়েকটী ছাত্র বৃষ্টি থামিবার পর বাড়ী যাওয়ার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল; ইহার মধ্যে তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল 'দেখ, আকাশে কেমন সুন্দর রামধনুক উঠিয়াছে।' তাহা শুনিয়া কয়েকটী বালক সেই রাম ধনুকের দিকে তাকাইয়া নানারকম কথা বলিতে লাগিল; কেহ বলিল 'দেখ ঐ রামধনুক কেমন সুন্দর লাল দেখা যাইতেছে!' কেহবা বলিল 'দেখ, ঐ রামধনুক কত লম্বা!' ইত্যাদি। তাহাদের মধ্যে গোপাল নামে একটী

বালক বলিল 'আচ্ছা, বিপিন, ঐ রামধনুক কি জিনিষ বল দেখি।' বিপিন বলিল 'আমি শুনিয়াছি যে ত্রেতাযুগে রাম নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তিনি অতিশয় বলবান্ ছিলেন, তাঁহার এক বৃহৎ ধনুক ছিল, সেই ধনুক সময় সময় দেখা যায়।' গোপাল তাহা শুনিয়া বলিল 'রামধনুক যদি বাস্তবিক ধনুকই হয়, তবে উহা কোন সময়ে দেখা যায় আর কোন সময়ে দেখা যায়না কেন? আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র বৎসরের সকল সময়েই ত দেখা যায়।' এইরূপে ক্রমে ক্রমে রামধনুক বাস্তবিক কি জিনিষ তাহা লইয়া বালকদিগের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইল; তাহারা শেষে শিক্ষকের নিকট যাইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিল। শিক্ষক বলিলেন 'আচ্ছা, গোপাল, প্রথম দেখ দেখি রামধনুকে কয়টা রং আছে।' গোপাল রামধনুকের দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া গুণিয়া বলিল 'আন্দাজ ছয় সাতটী রং আছে।' তখন শিক্ষক অন্যান্য সকলকেও বলিলেন যে তাহারাও রামধনুকে কয়টী রং আছে ভাল করিয়া দেখুক। সকলে দেখিয়া সাব্যস্ত করিল যে রাম ধনুকে এই সাতটী রং আছে, লাল, অরেঞ্জ (কমলা লেবুর রঙ্গের ন্যায় রং), হরিদ্রা, সবুজ, নীল, ইণ্ডিগো (গাঢ় নীল), আর ভায়লেট্ (বেগুণে)। ক্রমে ক্রমে আকাশে রৌদ্র উঠিলে, শিক্ষক তখন রৌদ্রের মধ্যে একটা ছোট গাছের নিকট একখানা লম্বা তিন কোণা কাচ লম্বা করিয়া ধরিলেন, আর দেখা গেল যে ঐ গাছের ছায়ার উপর এক যায়গায় সুন্দর রঙ্গিন আলোক পড়িল। তখন সকল বালকই সেই আলোকের দিকে তাকাইল; তাহারা দেখিতে পাইল যে রামধনুকে যে কয়টী রং দেখিয়াছিল ঐ আলোকেও ঠিক সেই কয়টী রং আছে, ঐ আলোকে আর রামধনুকে বিভেদ এই যে রামধনুক অত্যন্ত প্রশস্ত আর ঐ আলোক তিন চার অঙ্গুলির অধিক প্রশস্ত নহে। শিক্ষক তাঁহার হাতে যে কাচ লম্বা করিয়া ধরিয়া ছিলেন, তাহা নামাইয়া রাখিলেন আর অমনি গাছের ছায়ার উপরে যে আলোক পড়িয়াছিল তাহা অদৃশ্য হইল। তিনি আবার কাচ খানি সোজা করিয়া ধরিলেন আবার সেই আলোক দেখা গেল; আবার তাহা নামাইয়া রাখিলেন, আবার আলোক অদৃশ্য হইল। এই রকমে যতবার তিনি কাচ খানি লম্বা করিয়া ধরিলেন ততবার রঙ্গিন আলোক দেখা গেল, আর যতবার কাচখানি নামাইয়া রাখিলেন ততবার আলোক অদৃশ্য হইল। বালকেরা ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারিল যে ঐ কাচ হইতেই ঐ আলোক বাহির হইয়া আসিতেছে। শিক্ষক ছায়ায় লইয়া গিয়া কাচখানি লম্বা করিয়া ধরিলেন, তখন আর ওরকম আলোক দেখা গেল না; যতক্ষণ ছায়ায় রাখিলেন, ততক্ষণ রঙ্গিন আলোক দেখা গেল না। আবার যখন রৌদ্রে আনিয়া কাচখানি লম্বা করিয়া ধরিলেন তখন আবার রঙ্গিন আলোক দেখা গেল। এই রকমে যতবার রৌদ্রে কাচ ধরিলেন ততবার রঙ্গিন আলোক দেখা গেল আর যতবার ছায়ায় কাচ ধরিলেন ততবার তাহা দেখা গেল না। ছাত্রেরা ইহাতে বুঝিতে পারিল যে সূর্য্যের আলোক ঐ কাচের উপর পড়িলে যখন বাহির হইয়া আইসে, তখন বিবিধ বর্ণ ধারণ করে। সূর্য্যের আলোক সাদা, কিন্তু ঐ কাচের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা রামধনুকে যে সাতটী রং আছে সেই সাত রংয়ের আলোকে বিভক্ত হইয়া বাহির হয়। ছাত্রেরা বুঝিতে পারিল যে যাহাকে আমরা সাদা রং বলি, তাহা একটী রং নহে, তাহা সাতটী ভিন্ন ভিন্ন রং একত্র হইয়া হয়। শিক্ষক এখন বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা এখন বলিতে পার, আকাশে রামধনুক কেন দেখা যায়?' কেহই ভাল উত্তর করিতে পারিল না। তাহাতে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা বলিতে পার, রামধনুক কখন্ দেখা যায়?' গোপাল

বলিল 'বর্ষাকালে।' শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন 'বর্ষাকালে আকাশের অবস্থা কেমন?' বিপিন বলিল 'আকাশে তখন খুব মেঘ থাকে।' শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন 'রামধনুক দিনের বেলায় উঠে কি রাত্রে উঠে?' একটী বালক বলিল 'নিশ্চয়ই দিনের বেলায়।' শিক্ষক পুনরায় বলিলেন 'এখন তোমরা বলিতে পার, আকাশে রামধনু ওঠে কেন?' গোপাল বলিল 'আমি পারি।' শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন 'বল দেখি?' গোপাল বলিল 'সূর্য্যের আলোক কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন বিবিধ বর্ণের আলোকে বিভক্ত হয়, মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও সেই রকম বিবিধ বর্ণের আলোকে বিভক্ত হইতে পারে।' শিক্ষক বলিলেন 'ঠিক বলিয়াছ। তিন কোণা কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যের আলোক যেমন সাত রকমের আলোকে বিভক্ত হয়, সূর্য্যের আলোক মেঘের জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও সেই রকম বিভক্ত হয়, ও তাহাতে আকাশে রামধনু দেখা যায়।' শিক্ষক তাহার পর এই উপলক্ষে বর্ণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে 'রামধনুকে যে সাতটী রং দেখা যায় তাহার মধ্যে লাল, সবুজ, আর ভায়লেট এই তিনটী মূলবর্ণ, আর অন্য কয়টী বর্ণ ইহাদিগের হইতে উৎপন্ন। লালের মধ্যে লাল ভিন্ন অন্য কোন রং নাই, সবুজের মধ্যে সবুজ ভিন্ন অন্য কোন রং নাই, ভায়লেটের মধ্যে ভায়লেট্ ভিন্ন অন্য কোন রং নাই। কিন্তু যাহাকে আমরা হরিদ্রা বং বলি তাহা লাল ও সবুজ এই দুই বর্ণ একত্র করিলে উৎপন্ন হয়; নীল রং সবুজ ও ভায়লেট এই দুই রং হইতে উৎপন্ন; (সাদা রং লাল, সবুজ ও ভায়লেট এই তিন হইতে উৎপন্ন) যাহাকে আমরা কাল রং বলি তাহা বাস্তবিক রং নহে, তাহা রংএর অভাব মাত্র; অর্থাৎ যেখানে আমরা কোন রংই দেখিতে পাই না তাহাকে আমরা কাল বলিয়া থাকি। আমরা চারিদিকে যে সকল নানাবর্ণের গাছ, ফুল, পাখী ইত্যাদি দেখিতে পাই তাহাদের রং কোথা হইতে আইসে? সূর্য্যের রং সাদা, তাহা সূর্য্যের আলোকেই আছে। কিন্তু গাছের পাতায় কোন আলোক নাই, অন্ধকার রাত্রে গাছের পাতা দেখা যায় না; যদি গাছের পাতায় আলোক থাকিত তবে তাহা অন্ধকার রাত্রেও দেখা যাইত। সূর্য্যের আলোকে আমরা গাছের পাতা দিনের বেলায় দেখিতে পাই; সূর্য্যের আলোক গাছের পাতায় পড়িয়া যখন তাহা হইতে আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে, তখন আমরা পাতা দেখিতে পাই। সূর্য্যের আলোক সাদা, তবে গাছের পাতা সবুজ দেখায় কেন? ইহার উত্তর এই যে সূর্য্যের আলোক গাছের পাতায় পড়িলে তাহার সবুজ অংশ টুকু বাহির হইয়া আইসে, অন্যান্য অংশ ঐ পাতার মধ্যে থাকিয়া যায়। যদি সূর্য্যের আলোকের সমুদায় অংশ গাছের পাতা হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিত, তবে গাছের পাতাও সাদা দেখাইত। এই রূপে সূর্য্যের আলোকে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ তাহাদিগের মধ্য হইতে সূর্য্যের আলোকের যে যে প্রকারের অংশ ফিরিয়া বাহিরে আসিতে পারে তাহার উপর নির্ভর করে। লাল গোলাপ ফুলের রং লাল, কারণ তাহার মধ্য হইতে সূর্য্যের লাল অংশটুকু বাহির হইয়া আইসে, অন্যান্য অংশ গোলাপ ফুলের মধ্যেই রহিয়া যায়। সাদা গোলাপের রং সাদা, কারণ সূর্য্যের আলোকের সমুদায় প্রকার অংশই তাহা হইতে ফিরিয়া বাহিরে আইসে। কালির রং কাল, কারণ সূর্য্যের আলোকের কোন প্রকার অংশই তাহা হইতে ফিরিয়া আইসে না। শিক্ষক অবশেষে তাঁহার ছাত্রদিগকে এই বুঝাইয়া দিলেন যে আমরা যত রকম রং দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে লাল, সবুজ, ও ভায়লেট এই তিনটী মূলবর্ণ, অন্যান্য সমুদায় বর্ণ ইহাদের মধ্যে একটী হইতে কি দুই বা তিনের যোগে উৎপন্ন; যে সকল বস্তুর

নিজের আলোক আছে, তাহাদিগের অনেকের বর্ণই তাহাদিগের বর্ণ। আর যে সকল বস্তুর নিজের আলোক নাই, অন্য কোন বস্তুর আলোকে যাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই, তাহাদিগের বর্ণ তাহাদিগের মধ্য হইতে কি প্রকার আলোক বাহির হইয়া আসিতে পারে তাহার উপর নির্ভর করে। ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট এই সকল বিষয় শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বাড়ী চলিয়া গেল।

কেশব চন্দ্র সেন।

আমরা ছেলেবেলা দেখিতাম যে যে সকল লোক সাধারণ লোকের মত নয়, খাওয়া পরার ঠিকনাই, যে পোষাক দাও তাই পরে, মাছ মাংস ছাড়া আর যা দাও, তাই খায়, নেহাত ভাল মানুষ, অথচ কোন চলিত কাজ করিতে বলিলেই 'ফোঁষ' করিয়া উঠে, মূর্খ বামনপণ্ডিতদের মানেনা, চলিত 'আচার বিচার' গ্রাহ্য করে না, মাঝে মাঝে চোখ বোজে, আর যাতে মন নাই এমন কাজ করিতে বলিলেই আগুণ হইয়া উঠে, এই রকম লোককে সকলেই বলিত "এঃ! একেবারে মাটী হয়ে গেছে, কেশব স্যানের দলে ঢুকেছে।" আমরা তখন ভাবিতাম, 'কেশব স্যানের' দলে যাওয়া বুঝি একটা সখের কাজ। যেখন যাত্রার দল, থিয়েটারের দল, বা কোন নেশার দল, সেইরূপ কেশব বাবুর 'দল'। কেশব বাবুর দলে গেলে বড় একটা খারাপ কাজ হইল, মনে ভাবিতাম। এইরূপ ভাবিতাম বটে, কিন্তু দেখিতাম 'কেশব স্যানের' দলে যারা যাইত, তাদের এদিকে "কাছা কোচা"র ঠিক নাই বটে, কিন্তু দেশের সমস্ত ভাল কাজে প্রাণের টান, যে ভাল কাজে লাগাইয়া দাও, আগুণের মত পড়িয়া, দেখিতে দেখিতে কাজ শেষ করিয়া তোলে। 'দেবতা ব্রাহ্মণ' আচার ব্যবহার মানে না বটে, কিন্তু প্রাণ দিয়ে দেশের জন্য খাটে, রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে, এবং গুরুজনকে মান্য করিয়া চলে। একি আশ্চর্য্য! কেশব বাবুর দলে গিয়া একি হয়? আচার ব্যবহার, 'রকম সকম,' চলাফেরা, এ কেমন হইয়া যায় কেন? ভাবিলাম কেশব বাবু বুঝি কি ভেলকী করে তাঁহার দলের লোকদিগকে বাঁধিয়া রাখেন, তাঁর যাদুমন্ত্রে বুঝি লোকগুলা বিগড়ে যায়!

বড় হইলাম। কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিতে পারি, এমন বয়স হইল। একদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গেলাম, একদিন শুনিয়া আর এক দিন শুনিতে ইচ্ছা হইল, ক্রমে আর একদিন, এই রূপে অনেক দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিলাম; তাঁহার অনেক ছোট খাট উপদেশও শুনিলাম। তখন বুঝিলাম কেশব বাবু কি যাদু করে! তখন দেখিলাম কেশব বাবুর ভেলকী করার শক্তি আছে বটে। আমরা কে? কোথা হইতে এসেছি? কোথায় যাব? আমাদের ঈশ্বর কে? তিনি কিরূপ? তিনি আমাদের কত দয়া করেন? আমরা কত পাপী? আমরা আমাদের দেশের ও সকল লোকের নিকট কি কি কাজ করিতে বাধ্য আছি?—এই সকল কথা কেশব বাবুর কাছে এমন করিয়া শুনিলাম, শুনিয়া

এমন করে বুঝিলাম, যে আর মন থেকে নাড়িতে পারিলাম না, আমি কেশব বাবুর গুণের কাছে, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানের কাছে যেন চিরদিনের মত কেনা হইয়া পড়িলাম।

আজ আর কেশব বাবু নাই। পৃথিবীতে তাঁহার শরীরটী নাই, কিন্তু তিনি আমাদের মনে চিরকাল থাকিবেন। কেশববাবুর অনেক মতের সঙ্গে আমাদের মত মেলেনা, তবুও তাঁকে এত ভক্তি করি কেন? যে কেশব বাবু সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানের জন্য পূজা পাইয়াছেন, স্বয়ং মহারাণী যে কেশব বাবুর সহিত এক যায়গায় বসিয়া আহার করিয়া সুখী হইয়াছেন, বড় বড় রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, লাট বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, দেশ দেশান্তর হতে বেড়াতে এসে যাঁর সঙ্গে আলাপ করে কৃতার্থ হয়ে গিয়াছেন, তাঁকে ভক্তি করি কেন, একথা কি আর বলিতে হইবে? আমাদের দেশে তাঁর মত লোক একশত বছরের মধ্যে হয় নাই, এর পরে যে দুই একশ বছরের মধ্যে হ'বে, তাও বোধ হয় না। এখন কথা এই, কেশব বাবু কেমন করে এত বড় লোক হ'লেন? তাহাই বলিতেছি, বালকবালিকাগণ! মনোযোগ করে শোন:—

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজী ১৮৩৮ সালের ১৯এ নবেম্বর কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে পরিবারে জন্মেন, তাহাতে যেমন লক্ষ্মীর দৃষ্টি ছিল, তেমনি সরস্বতীর ও দয়া ছিল। কেশব বাবুর পিতা প্যারীমোহন সেন দেখিতে যেমন সুন্দর ছিলেন, দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতিতেও তেমনি অলঙ্কৃত ছিলেন। কেশব বাবুর মা আজিও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার গুণের কথা এখন বলা ভাল নয়, তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কেশব বাবু মরিবার সময় মায়ের পায়ের ধুলো লইয়া বলিয়াছিলেন "মা! তোমার মত মা সকলের হয় না। আমি তোমারই গুণগুলি পাইয়া মানুষ হইয়াছি।" এমন বাপমায়ের যে ছেলে সে কেন ভাল হইবে না? কেশব বাবু ছেলেবেলা ভক্তের মত সাজিতে ভাল বাসিতেন অর্থাৎ সকাল সকাল স্নান করিয়া, গরদের কাপড় পরিয়া, সমুদায় শরীরে চন্দন মাখিতেন। কি বাড়ীতে, কি পাঠশালে, কেশব বাবু নূতন কিছু না করিয়া কোথাও ছাড়িতেন না। অনেক ছেলের বুদ্ধি যেমন ঘুমাইয়া থাকে, কোন কিছু জানিলে বা কোন কিছু পড়িলে, তাহারা যেমন কেবল শুনিয়াই বা পড়িয়াই চুপ করিয়া থাকে, নূতন কিছু ভাবিবার, জানিবার, বা শিখিবার বিষয় খুঁজিয়া পায় না, কেশব বাবুর বুদ্ধি সেরূপ ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই নূতন বুদ্ধি খাটাইয়া নূতন ফিকির, নূতন কার্য্য, নূতন পথ সকল বাহির করিতেন, এবং এই গুণেই সমবয়সী ছেলের মহলে রাজার মত মান পাইতেন। তোমার আমার বুদ্ধির চালনা হয় না, কাজেই অকেজো অস্ত্রের মত মরিচা ধরিয়া যায়, আর আমরা বড়লোক হইতে পারি না, কিন্তু কেশব বাবুর বুদ্ধি সর্ব্বদাই ঘূরিত, সর্ব্বদাই কাজে লাগিত, তাই তিনি পরজীবনে বড়লোক হইতে পারিয়াছিলেন।

একবার টাউনহলে এক সাহেব বাজি দেখাইতে আসিয়াছিল; কেশব বাবু সেই বাজি দেখিয়া আসিলেন। বাড়ীতে আসিয়া সাহেব সাজিয়া সেই বাজিগুলি তিনি নিজে করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমনি সাহেবী সুরে কথা বলিলেন যে দুএক জন সাহেব যাঁহারা কেশব বাবুর বাজি দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত মনে করিয়াছিলেন যে সত্যসত্যই একজন সাহেব বাজি দেখাইতেছে। কেবল বাজি দেখান লইয়া নহে, নাটক অভিনয়েও তিনি খুব পরিপক্ক ছিলেন। বাঙ্গালী বালক ইংরাজী নাটক বুঝিয়া অভিনয় করিতেছে, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? এতদ্ভিন্ন প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া উদ্‌যোগ করিয়া কেশববাবু "বিধবা বিবাহ নাটক" নামে একখানি

নাটক অভিনয় করেন। বিধবাদিগের দুঃখ লোককে জানাবার জন্যই এই অভিনয়টী করা হইয়াছিল। কেশব বাবুর একজন জীবনচরিত লেখক বলেন, এই অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল, যে দেখিয়াছে সেই বিধবার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছে। বলিতে কি,—সেই দিন হইতেই বিধবার জন্য দুটো কথা কহিবার লোক যুটিয়াছে।

কেশববাবু যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন প্রত্যেক বারেই পুরস্কার পাইতেন। তাঁহার কেমন প্রকৃতি ছিল, তিনি যাহা নূতন শিখিতেন, দশজনকে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। স্কুলে যাহা শিখিতেন, বাড়ীর মেয়েদের, পাড়ার ছেলেদের তাহা শিখাইতেন। যে কাজটী ভাল বলিয়া মনে হইত, তিনি তাহা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। দরিদ্রদিগের জন্য রাত্রিতে স্কুল করিতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসরকাল কেশব বাবু গরিবের ছেলেদিগকে শিক্ষা দিলেন, কিন্তু শেষে নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে স্কুলটী থাকিল না। ইহা ছাড়া তিনি ধর্ম্ম ও নীতির আলোচনার জন্য গুড্‌উইল ফ্রেটার্ণিটী বা "সদিচ্ছা ভ্রাতৃবৃন্দ" নামে একটী সভা স্থাপন করেন, এবং ভাল লিখিতে পড়িতে এবং বলিতে শিক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসায়েটী বা "ব্রিটিশ ভারত সমাজ" নামে একটী সভাও সংস্থাপন করেন। এই সকল কাজ করিয়া, অনেক পড়িয়া, অনেক ভাবিয়া, ধর্ম্মের দিকে তাঁহার মন গেল। বাড়ীর কর্ত্তাদের কথায় চাকরী করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু চাকরী করিয়া যে সময়টুকু পাইতেন, সেই "আফীসে" বসিয়াই, সেই সময়টুকু নানারূপ ভাল কথা লিখিয়া কাটাইতেন। এই সকল উপদেশ তিনি ছাপাইয়া সকলকে দিতেন; লোকে তাঁহার নূতন রকমের মত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত। তাঁহার আফীসের বড় সাহেবেরা কেশব বাবুর সহিত আলাপ করিয়া দেখিতেন, তাঁহার মন ধর্ম্মের জন্য আগুণের মত 'হুহু' করিয়া জ্বলিতেছে। কেশব বাবু কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বাড়ী আসিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সম্প্রতি বাড়ীর লোকের তাড়নায় স্ত্রীকে লইয়া শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

কেশব বাবুর বাল্য জীবন এই খানেই একরূপ শেষ হইল, এবং এই খান হইতেই তাঁহার বড়লোক হইবার সূচনা হইল। ইহাঁর পরজীবনের কথা আমরা আর বলিব না, কেবল এই বলি যে, যে ব্যক্তি

(১) সর্ব্বদা আপনার বুদ্ধি ঘুরাইয়া কাজ করে, পরের মুখ চায় না,

(২) যে কার্য্য ভাল বলিয়া বুঝে তাহাই করে, কাহার ও ভয়ে টলে না,

(৩) ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া মনে করে,

সে নিশ্চয়ই বড়লোক হইতে পারে। লোকে তাহাকে কেশব বাবুর মতন দেখুক আর নাই দেখুক, ঈশ্বরের চক্ষে সে যে বড়, তাতে কোন সন্দেহ নাই?

সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সেই বাড়ীর কর্ত্তা আমাদের অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন; আমাদের সম্বন্ধে যা যা কথা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা কোন কথারই ঠিক উত্তর দিই নাই। স্থানে স্থানে দু একটী কথা গড়িয়া কহিতে হইল। তিনি আমাদের কথায় বুঝিয়া লইলেন যে আমরা দুজন পথ হারাইয়া ঘুরিতেছি; বলিলেন, কাল আমি একজন লোক দিয়া তোমাদের দুজনকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব।

খাইবার সময় ভদ্রলোকটী আমাদের সম্মুখে বসিয়া থাকিলেন, আমাদের আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উঠিলেন না। একটী কুঠরীতে আমাদের দুজনের ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে আর কেহ ঘুমাইতে আসিল না। আমি কিছু সুবিধা বোধ করিলাম; ভাবিলাম, কর্ত্তা যাহা বলিলেন তাহা কাজে করিলে আর বড়লোক হওয়া হবে না; সুতরাং কেহ জাগিবার পূর্ব্বেই কর্ত্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইল। সতীশকে ডাকিলাম "সতীশ, সতীশ!"—সতীশ কথা কয় না। সতীশের চক্ষে জল পড়িতেছে! কর্ত্তার কথায় সতীশের মন ফিরিয়া গেল নাকি? বাস্তবিক ও তাই; অনেক পিড়াপীড়ি করার পর বলিল "আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।" আপনারা কি মনে করিতেছেন? সতীশের কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কি প্রকার হইল? বড়লোক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার এত বেশী হইয়াছিল, যে বাড়ী ছাড়িয়া অবধি আমার বোধ হইতেছিল যেন বড় লোকের কাছাকাছি একটা কিছু হইয়াছি! সতীশকে আমি কাপুরুষ মনে করিতে লাগিলাম। সতীশের ও মা বাপ আছেন আমার ও মা বাপ আছেন। প্রভেদ এই যে আমি স্বার্থপর, সতীশ তাহা নহে। সতীশের মনে যে সকল চিন্তা উঠিতেছিল, আমার অন্তঃকরণে তাহারা স্থান পাইল না। আমি সতীশের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম না। মা বাপের মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু নিজের কথা লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে তাঁহাদের কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। নানা চিন্তার মধ্যে ঘুম আসিল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিলাম যে আমি বাড়ীতে কি একটা কথা লইয়া মার সঙ্গে রাগ করিয়াছি। মা কত সাধিতেছেন, আমার ভ্রুক্ষেপ নাই; রাগ যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। মার চক্ষে জল পড়িতেছে দেখিয়া যেন আমার প্রতিহিংসার ভাবটা চরিতার্থ হইতে লাগিল। আমি দাঁত খিচাইয়া মাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলাম। মা আমার হাতে ধরিতে আসিলেন; আমি পাশের একটা গাছে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ পা পিছলিয়া পড়িয়া যাইতে ছিলাম, এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া চখে দু ফোটা জল আসিল; কিন্তু আবার সেই বড়লোক হওয়ার কথা! সতীশের মন ফিরিয়া গিয়াছে। সতীশ জাগিয়া আর যাইতে চাহিবে না, হয়ত আমার ও যাওয়া হইবে না। রাত হয় তো আর বেশী নাই; এই বেলা সতীশকে না বলিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল। আমি আস্তে আস্তে উঠিলাম। আমার কাপড় আর টাকা গুলি লইয়া বাহির হইলাম। রাত্রি তখন ও অনেক ছিল কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল যেন এই ভোর হইয়া আসিতেছে। একটা বড় রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ হাঁটিলাম; কিন্তু রাত ফুরায় না। রাস্তাটা একটা বড় নদীর ধারে যাইয়া শেষ হইয়াছে, আমি ও সেই স্থানে যাইয়া থামিলাম;—তার পর যাই কোথা? রাস্তাটা নিশ্চয় ও পারে যাইয়া আবার চলিয়াছে কিন্তু ওপারে যাই কেমন করিয়া? এতক্ষণ রাত ফুরাইল না। হয় তো আরও অনেক দেরি। ঘাটে একখানা নৌকা বাঁধা ছিল—নৌকার ছই নাই। একজন লোককে অনায়াসে ওরূপ নৌকা অনেক বার চালাইতে দেখিয়াছি। আমার বোধ হইতে লাগিল আমি ও পারি। নৌকায় উঠিতে বিলম্ব রহিল না। যে লগিটীতে নৌকা বাঁধা ছিল তাহা তুলিয়া লইলাম। ডাঙ্গায় ভর করিয়া ঠেলিয়া নৌকা জলে ভাসাইয়া দিলাম। জলের গায় এত জোর আগে ভাবি নাই। শোঁ শোঁ করিয়া নৌকার গায় জল বাঁধিতে লাগিল; নৌকা খানা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ ঘুরিবার সময় তাড়াতাড়িতে লগিটী ছাড়িয়া দিলাম। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাঙ্গা হইতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল—স্রোতে ভয়ানক বেগের সহিত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমি কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম।

বিপদের পরিমাণ টা প্রথম তত বুঝি নাই; শেষে কিছু কিছু করিয়া হুঁস হইতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া গেল, দুহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঢেউ গুলি তড়াক্ তড়াক্ করিয়া নৌকাখানাকে দোলাইতে লাগিল। তখন মায়ের সেই মুখ খানি মনে হইল। কেন বাড়ী ছাড়িয়া আসিলাম? সেই অন্ধকার রাত্রি, সেই ভয়ানক নদী; আর বাড়ীর ছোট কুঠরীটী—সেই কোমল সুন্দর বিছানাটী—মনে হইল। দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সেই আঁধারেপড়িয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন সতীশের সঙ্গে চলিয়া গেলাম না? তাহাকে কেন ছাড়িয়া আসিলাম? ক্রমশঃ—

বাগানেতে খেলা।

১

বাগানে ফুটেছে ফুল—
কত বরণের আহা!
কি সুন্দর সাজিয়াছে,
বলিতে না পারি তাহা;

২

কেউ সাদা ধপ-ধপে,
কেউ রাঙ্গা টুক টুক,
কেউবা শতেক রং
কারোবা সোণার মুখ।

৩

ধীরে ধীরে বহে বায়ু,
ধীরে মেঘ খেলিতেছে,
গাছের আড়ালে হোথা
চাঁদ উকি মারিতেছে।

৪

বালক বালিকা দুটী
খেলিছে মনের সুখে,
করিতেছে ছুটাছুটী,
হাসিটী না ধরে মুখে।

৫

'আয় হেথা আয় বোন,
দেখ হেথা দেখ চেয়ে
বকুলের ফুলে আহা!
তলাটী ফেলেছে ছেয়ে।"

৬

"আমি দাদা এক ছড়া
গাঁথি ভাই তবে মালা;
তোমারে পরায়ে দিয়ে
আবার করিব খেলা।"

৭

"ওই দিক পানে চেয়ে,
একবার দেখ বোন!
গোলাপ একটী ফুটি
রূপে আলো করি বন।"

৮

"আহা কি সুন্দর ফুল,
দাওনা আমারে পাড়ি?
মাকে গিয়ে দিব আমি,
যখন যাইব বাড়ী।"

৯

মেঘ সনে চাঁদ হোথা
খেলিতেছে লুকোচুরী;
বালিকা, খেলিতে সাধ,
ডাকিল আদর করি—

১০

"এস চাঁদ, মেঘ সনে
শুধু লুকোচুরী খেল,
খেলিবে মোদের সাথে
কত খেলা আরও ভাল।"

১১

"মিছে ডেকে কাজ নাই
আসিবে না, বোন! শশী;
রাখিবারে কথা তোর
(ওই) তারাটী পড়িল খসি!"

১২

"আমি যদি, ওগো দাদা!
একরাশ তারা পাই,
তা হ'লে গাঁথিয়া মালা
তোমারে পরাই ভাই!"

১৩

"চল তবে চল বোন
কাজ নাই করে দেরি,
রাত হয়ে এল ওই,
চল যাই ঘরে ফিরি"।

১৪

"কেমন সুখেতে আজ
দিন কেটে গেল ভাই!
প্রণমি বিভুর পায়ে
চল এবে ঘরে যাই।"

আগামী বর্ষের পুরস্কার।

আমরা আগামী বর্ষে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

১। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাঁহারা উত্তর দিবেন, তাঁহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম হওয়া আবশ্যক।

২। ১৬ বৎসরের কমবয়স্ক বালক বা বালিকা যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। রংএ বা পেন্‌সিলে, যিনি যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা, চিত্র করিতে পারিবেন। আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌছা আবশ্যক।

৩। আমরা রচনা বিষয়ে তিনটী পুরস্কার দিব;—(ক) ৮ থেকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য; (খ) ১১ থেকে ১৩ বৎসরের পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য; এবং (গ) ১৪ থেকে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য। প্রত্যেক শ্রেণীর রচনার বিষয় এই:——

(ক) "একটী ছোট ছেলে মাকে বেশী ভালবাসে না আপনার খেলানাকে বেশী ভালবাসে!" এই বিষয়ে গদ্য রচনা।

(খ) "একটী ছোট মেয়ে মরে গেছে, তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন," এই বিষয়ে ৩০ লাইনের মধ্যে একটী পদ্য রচনা।

(গ) "কাক ডাকিতেছে, জলের মধ্যে তালগাছ, ঘোড়া ছুটিয়া গেল, ছোট খুঁকী কাঁদিয়া উঠিল, বাঘের ভয়, শিয়ালের বাচ্ছা, কি সর্ব্বনাশ! জামা যোড়া, বড়লোক, সাহসী পুরুষ, হৈহৈ শব্দ, শিকারী।" এই কথাগুলি বজায় রাখিয়া এবং ভাব ঠিক রাখিয়া একটী অর্থসংলগ্ন গদ্য রচনা। যত ইচ্ছা নূতন কথা বসাইতে পারিবে, কিন্তু রচনাটী ২০ লাইনের চেয়ে লম্বা হইবে না।

এই রচনাগুলি আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌছা আবশ্যক। প্রত্যেক রচনাতে স্কুলের শিক্ষক বা কোন কর্ত্তা ব্যক্তির স্বাক্ষর চাই, তিনি লিখিয়া দিবেন যে বালক বা বালিকা নিজে এই রচনাটী করিয়াছে।

ধাঁধা।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। প্রথম দর ৭টা করে পয়সায়, দ্বিতীয় দর তিন পয়সায় প্রত্যেকটা। প্রথম বারে প্রথম দরে প্রথম বালিকা ৪৯ টা, দ্বিতীয় বালিকা ২৮টা, তৃতীয় বালিকা ৭টা। বাকী গুলি দ্বিতীয় বারে দ্বিতীয় দরে বিক্রীত হইল। প্রত্যেকের দশ পয়সা করিয়া লাভ হইল। ২। ঢাকা। ৩। ছাগল। ৪। গরু দুটী মুখোমুখি বাঁধা আছে, গোলমাল কি?

হাসাড়া স্কুলের হরিচরণ সেন প্রথমটীর অন্যরূপ উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার উত্তরও ঠিক হইয়াছে।

নূতন।

১। ১২৬ কে এমন চারভাগ কর, যে প্রথম ভাগে ২ যোগ করিলে, দ্বিতীয় ভাগ থেকে ২ বাদ দিলে, তৃতীয় ভাগকে ২ দিয়া গুণ করিলে, চতুর্থ ভাগকে ২ দিয়া ভাগ করিলে, যোগফল, বিয়োগ ফল, গুণফল, ও ভাগ ফল চারিটীই সমান হবে।

২। সে কোন্ ব্যবসায়, যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ গুলিকেও লোকে পায়ের তলে মাড়ায়?

৩। এক গাছের ডালে ৭টা পাখী বসেছিল। একজন দুষ্ট ছেলে ঢেলা ছুঁড়িয়া দুটী পাখীকে মারিয়া ফেলিল। ডালে আর কটা পাখী রহিল?

৪। যাহার অর্দ্ধেকের চতুর্থাংশ পাঁচ টাকা, তাহার পঞ্চমাংশের চতুর্গুণ যত, তাহার ৫ গুণ কত মোহর? (১৬ টাকায় এক মোহর হয়।)

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌছা আবশ্যক।

৮। ঠিকানা পরিবর্ত্তন তিন মাসের কম সময়ের জন্য হইলে, তাহা করা যাইবে না; অল্প সময়ের জন্য হইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরের সহিত পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবেন।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।
সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণি অর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকার কমিশন বলিয়া /০ এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

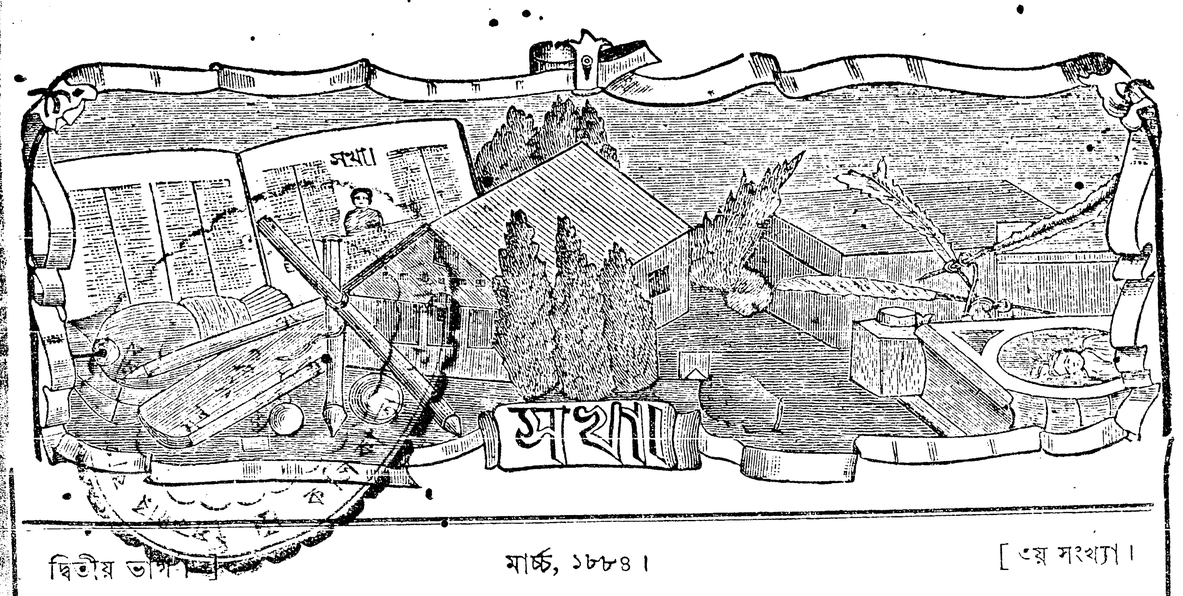

দ্বিতীয় ভাগ। মার্চ্চ, ১৮৮৪। [৩য় সংখ্যা।

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়?

তৃতীয় অধ্যায়।

নৌকা ভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ নৌকা খানি এক দিকে যাইয়া ঠেকিল। চমকিয়া দেখিলাম কতকগুলি বড় বড় নৌকা, তাহারি একটাতে আমার নৌকা ঠেকিয়াছে। আমি সেই মুহূর্ত্তের জন্য আশ্বস্ত হইলাম, কিন্তু তার পরক্ষণেই নৌকা হইতে কতকগুলি কালো অর্দ্ধ-উলঙ্গ লোক বাহির হইয়া কেউ মেউ করিয়া কি বলিতে লাগিল; আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে গালি দিতেছে। তাহারা আমার কথা বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না। আরো বেশী গালাগালি দিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য নৌকার লোক আসিয়া গোলমালে যোগ দিল। আমার কথা শুনিয়া সকলেই ঐ লোকগুলিকে গালি দিতে লাগিল। একটী ভদ্র লোক সেখানে ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার নৌকায় লইয়া গলেন। নিজ হাতে আমার পুটলীটী যত্ন পূর্ব্বক এক কোণে রাখিয়া দিলেন। তার পর আমাকে বলিলেন "আমি কা— যাইতেছি; তোমার আপত্তি না থাকিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার। আমার বাড়ীতে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না" আমি তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম।

কা— ছোট একটী সহরের মত। অনেক লোক। বড় লোকও অনেকগুলি আছেন। আমি যাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাঁহাকে এখানে কালিদাস বাবু বলিব,—তিনিও একজন বড় লোক। এসব দেখিয়া শুনিয়া আমার পুরাতন রোগ আবার দেখা দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম এখানে থাকিয়া বড় লোক হওয়া যায় কি? যায় বৈ কি? না হলে এরা এত গাড়ী ঘোড়া চড়ে কি করিয়া? বোধ হইল যেন কালিদাস বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক দিন বড় লোক হইয়া যাইব।

এক দিন কালিদাস বাবু ডাকিলেন। কালীদাস বাবুর উপর প্রথম হইতেই আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। যখনই তিনি আমাকে ডাকিতেন তখনই একখানা সুন্দর কিছু উপদেশ পাইতাম। আমার বয়সের অনেকেই এখন ভাল কাজ করি-

তেছেন; কিন্তু আমার যেন তখনও শিশুভাবটা যায় নাই। কালিদাস বাবু ও তাহা বেশ বুঝিতেন; যাহা হউক আমি কালিদাস বাবুর নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার নাম ধরিয়া বলিলেন "গিরিশ, এখানে তোমার কেমন লাগে?"

"দিব্যি।"

"বটে? তা এখান থেকে তোমায় আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না?"

"কোথা যাব? এখানেই থাকবো!"

"তা বেশ" বলিয়া কালিদাস বাবু কপাল হইতে চশমা নামাইয়া ছাপার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। কাগজের প্রথম পাতে একটী ছবি। আমার সেই সাহেব! আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। অনেক দিন পরে কোন পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলে যেরূপ হয় আমারও সেইরূপ হইল। একটী ছোট কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল; আমি বলিয়া উঠিলাম "আরে!" কালিদাস বাবু কাগজ নামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার অর্থ, ব্যাপারখানা কি?

আমি বলিলাম "আজ্ঞে ঐ ছবিটে!"

"ইনি একজন বড় লোক ছিলেন; তোমারও বড় লোক হইতে ইচ্ছে হয় না" আমি ভাবিলাম এই বুঝি! হঠাৎ প্রশ্ন হওয়াতে থত মত খাইয়া বলিলাম "বড় লোক কি সবাই হয়?"

"হয় বৈ কি? ইচ্ছে করলে তুমিও হ'তে পার।"

"আমিও পারি?"

"অবিশ্যি। কাল থেকে তোমাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিব ভেবেছি। লেখা পড়া না শিখ্‌লে বড় লোক হওয়া যায় না। তাই তোমাকে ডেকে ছিলাম। কেমন?"

আমার বাতাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। যার চোটে বাড়ী ছাড়া সেই আপদ! আমি কোন কথা কহিলাম না। কালিদাস বাবু এত সন্দেহ করেন নাই, সুতরাং কিছু বলিলেন না। এরূপ কথা বার্ত্তা কালিদাস বাবুতে আর আমাতে অনেকদিন হইত। তিনি আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন:—"সেই রাত্রিতে সেই নৌকায় কেমন করিয়া আসিলে?" "বাড়ী কোথা?" "মা বাপ নাই?" ইত্যাদি;—আমি প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতাম। কালিদাস বাবুর ইচ্ছা ছিল সুযোগ পাইলে আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু এ সব সম্বন্ধে কোন খবরই আমি তাঁহাকে দিতে চহিতাম না, তখন তিনি সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া সেখানেই আমাকে লেখা পড়া শিখাইবার মনস্থ করিলেন।

ইস্কুলে যাইয়া অবধি আমার আর মনে শান্তি ছিল না। কয়েকদিন কোন মতে কাটাইলাম, কিন্তু শেষটা অসহ্য হইয়া উঠিল। কালিদাস বাবুর বাড়ীতে আর থাকা হবে না। কিন্তু হঠাৎ যাই কোথায়? গেলে ও এবার আর হাঁটিয়া যাওয়া হবে না। কা— হইতে দুখানা ষ্টিমার ধু——তে যাতায়াত করিত। সপ্তাহে দুদিন ষ্টিমার চলে। ধু—— যাইতে তিন দিন লাগে। হিন্দুরা এই তিন দিনের চিড়ে পুটলী বাঁধিয়া লইয়া জাহাজে উঠে। ভোর বেলা কা— হইতে জাহাজ ছাড়ে।

একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া দেখি একখানা ষ্টিমার এই মাত্র আসিয়া ঘাটে থামিল। পরের দিন ভোরে চলিয়া যাইবে। হঠাৎ ষ্টিমারে উঠিয়া ধু—— চলিয়া যাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া কেহ না দেখে এমন ভাবে আমার কাপড় চোপড় সব একত্র জড় করিলাম। কালিদাস বাবুর বাড়ী আসিবার কালে সঙ্গে করিয়া যে টাকা আনিয়া ছিলাম তাহার একটীও ব্যয় হয় নাই। কালিদাস বাবুও মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা মত খরচ করিবার জন্য দু একটী দিতেন। আমি সমস্তই সঞ্চয় করিতাম। শুনিয়া ছিলাম বড়লোকেরা সহজে টাকা খরচ করিতে চাহে না।

যাত্রার উপযোগী সকল জিনিষ প্রস্তুত রাখিয়া ঘুমাইলাম। মনে একটা চিন্তা থাকিলে সহজে ঘুম হয় না; ঘুম হইলেও শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। আমার ও তাই হইল। বড় কামরার ঘড়ীতে চারিটা বাজিল; আমি অমনি উঠিলাম। সঙ্গে পুটলীটা। পুটলীতে কয়েকখানা কাপড়; এক জোড়া চটী জুতা; নগদ কিছু টাকা; কালিদাস বাবু মাঝে মাঝে যে উপহার দিতেন সে গুলি——কয়েকখানা ছবি, একটা বড় ছুরি;——আর আমার স্কুলের পুস্তক গুলি; পুস্তক গুলি কেন সঙ্গে লইলাম ঠিক বলিতে পারি না; তবে কালিদাস বাবু বলিয়াছিলেন "লেখা পড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না," তাহাতেই মনে কেমন একটা ভয় রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ সাজ সজ্জা করিয়া, ছাতাটী হাতে করিয়া, বিছানার চাদর খানা পুটলীর উপরে জড়াইয়া লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলাম। ষ্টিমার ঘাটে আসিতে অধিক ক্ষণ লাগিল না। সেখানেই মুদীর দোকান আছে, সেই দোকান হইতে চিড়ে কিনিয়া বিছানার চাদরের এক কোণে বাঁধিয়া লইয়া, জাহাজের একজন লোক আমাকে একটা যায়গা দেখাইয়া দিলে, আমি সেইখানে যাইয়া বসিলাম। জাহাজে বিশেষ কিছু ঘটনা হইল না। তবে সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নিয়মিত সময়ে জাহাজ ধু——পৌঁছিল। ক্রমশঃ।

ঠাকুর দাদার গল্প।

গোলমালের কারণ আর কিছুই নহে, একটী বেল পড়িয়া একটী ছেলের মাথা কাঠিয়া গিয়াছে, তাহারই বাপ মা কাঁদিতেছে। বালকেরা সেখানে একটুকু দাঁড়াইয়া নিজের যায়গায় ফিরিয়া আসিল। তখন নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন "বোধ হয় তখনকার কথা এর মধ্যেই ভুলে যাও নাই; জড় বস্তুর যদি দুইটী গুণ অর্থাৎ নিজে চলিতে পারে না, এবং একবার চলিলে নিজে থামিতে পারে না, এই দুটী গুণ না থাকিত, তাহা হইলে যে কি হইত তাহা মনেও ধারণা করা যায় না। এখন একটা তীর খুব জোরে ছুড়িয়া দিলেও পৃথিবীর আকর্ষণে ও বায়ুর বাধা লাগিয়া শীঘ্র উহা থামিয়া মাটীতে পড়ে। সকল বিষয়েই ঐরূপ নিয়ম। এখন বুঝিতে পারিবে নলিনের দড়ী বাঁধা ঢিল ঘুরিতেছে কেন? ঢিলটীকে পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে, নলিন কিন্তু উহা ছুড়িয়া ফেলিল, দড়ী না থাকিলে এক দিকে ছুটিয়া গিয়া মাটীতে পড়িত, তাহা হইল না, দড়ী উহাকে যাইতে দিল না, নলিনের হাতের দিকেই টানিয়া রাখিল; ঢিলটীও কিন্তু কি বার বাহিরের দিকে পলাইতে চেষ্টা করিতেছে দড়ীও যাইতে দিবে না;—কাজেই বেচারা মহা বিপদে পড়িয়া ঘুরিতেছে। যেমন একটা ঘোড়াকে দড়ীতে বাঁধিয়া চাবুক মারিলে সে পালাইতে চায় কিন্তু না পারিয়া কেবল চারি দিকে গোল হইয়া ঘোরে এও সেইরূপ। কেমন, সকলে বুঝিয়াছ কি? (সকলে "হাঁ")

"এইবার এই সহজ কথাটী হইতে আজ একটী বড় কথা বুঝাইয়া দিব। আচ্ছা আগে বল দেখি পৃথিবী যে রহিয়াছে, কিসের উপর?" নলুবাবু:— "আমি জানি। এই, বাসুকী এক হাজার ফণা দিয়ে মাথায় করিয়া আছেন।" সকলে:—"হাঁ, আমরাও তাই জানি" বিনয়:—"আমার কিন্তু সে সব বিশ্বাস হয় না।" কিশোরী:—"আমারও হয় না। আমি একদিন আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম।" নবীন বাবু হাসিয়া বলিলেন:—"এই সহজ কথাটী বুঝিতে পারিলে না? ভাল বাসুকী যদি এত বড় প্রকাণ্ড পৃথিবী মাথায় করিয়া আছে তবে সে বাসুকীর খুব ক্ষমতা সন্দেহ নাই। বেশ, কিন্তু তাহাকে কে মাথায় কোরে আছে? সে কোথায় আছে, কিসের উপর?"

সকলেই মুখ দেখাদেখি করিয়া লজ্জিত হইল। বিনয় ও কিশোরী হাসিতে লাগিল। নলিন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "তা আমি অতো জানি না, ছোট পিসী আমায় যেমন বলিয়া দিয়াছেন তাই মনে আছে।" নবীন বাবু ঃ—"ওসব ভুল কথা শুনিওনা। পৃথিবী যে গোল, ইহার কি আবার পাতাল আছে না বাসুকী আছে? ইহা শূন্যময় আকাশে ঝুলিতেছে। যেমন একটা সুতাতে একটা গোল ভাঁটা ঝোলে সেইরূপ সূর্য্যের আকর্ষণে শূন্যে ঝুলিয়া আছে। দেখ আকর্ষণ কেমন দরকারী, ইহা না থাকিলে কি হইত? তোমরা জান সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৪ লক্ষ গুণে বড়, সুতরাং যে বড় তারই আকর্ষণ বেশী; এজন্য উহার টানে পৃথিবী ঝুলিতেছে। যেমন এক খণ্ড চুম্বকের টানে একটা লোহার বাঁটুল আমার বড় ঘরে ঝোলান আছে, এও ঠিক সেইরূপ।"

"কেবল তাহা নহে; পৃথিবী ঐ ঢিলটীর মত কেবলই এক দিক পানে চলিয়া যাইতে চাহে, কিন্তু সূর্য্য তাহাকে সে দিকে যাইতে দিবে না, জোরে টানিয়া আছে। সুতরাং নলিনের ঢিলের মত ক্রমাগত পশ্চিক দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যের চারি দিকে গোল হইয়া ঘুরিতেছে, ইহাকেই পৃথিবীর 'বার্ষিক গতি' বলে। ৩৬৫ দিনে পৃথিবী একবার সূর্য্যের চারিদিক এইরূপে ঘুরিয়া আসে। ইহাও ঠিক ঐ ঢিলের মত। পৃথিবী যেন ঐ ঢিলটী আর সূর্য্যের আকর্ষণ যেন ঐ দড়ীটী।" সকলে আশ্চর্য্য ও আনন্দে অবাক্ হইয়া রহিল; কেহ কেহ বলিল ঃ—"এমন, তা জানি না। আমরা ভূগোলে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু সে যে এই জন্য তা জানিতাম না; পণ্ডিত মহাশয়ও কিছু বলেন নাই। এই বার স্কুলে গিয়া সকলকে বলিব। নবীন বাবু আরও বলিলেন ঃ—"আরও দেখ চন্দ্র ঠিক্ এইরূপে আবার পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে, এই চন্দ্রকে লইয়াই পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিতেছে, যেমন ঢিলটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে নলিন আমার চারিধারে ছুটিতেছিল। চন্দ্র প্রায় এক মাসে পৃথিবীকে ঘোরে এজন্য এক মাস অন্তর পূর্ণিমা হয়। সে যাহা হইক, পৃথিবী যে কত জোরে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ—প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবী প্রায় এক হাজার ক্রোশ পথ চলিতেছে!! নলিন যেমন একটুখানি বালক, উহার ঢিল তেমনি একটুখানি, তাহার বেগও তেমনি অল্প। সূর্য্য যেমন প্রকাণ্ড পদার্থ উহার পৃথিবীও তদুপযুক্ত ইহার বেগও তেমনি ভয়ানক! তথাপি পৃথিবী যেমন একটী তেমনি আরও কত শতটী 'গ্রহ' সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। উহার কি ভয়ানক আকর্ষণ শক্তি!

বিনয় ঃ—"পৃথিবীর আহ্নিক গতিটা কিরূপ?"

নবীন বাবু ঃ—"সে ত অতি সহজ। যেমন একটা গোলা মনে কর আর একটা গোলার চারিদিক বেষ্টন করিতেছে, সে নিজে দুরকমে চলিতে পারে। এক মাটীতে ঘসিয়া ঘসিয়া, তাহাতে গোলাটীর কেবল এক দিকই মাটীতে ঠেকিয়া রহিবে। আর এক, গড়াইয়া গড়াইয়া গাড়ীর চাকার মত, তাহাতে সব দিক একবার করিয়া উপরে একবার নিচে আসিবে। বুঝিলে? পৃথিবী দ্বিতীয় প্রকারে চলে। একটা মাটীর গোলার ভিতর দিয়া সরু একটী কাটি চালাইয়া দাও, পরে সেই কাটিটীতে পাক দিলে তার সঙ্গে গোলাটীও ঘোরে, এইরূপ ঘোরাকে "আপন মেরুদণ্ডে ঘোরা" বলে, ঐ কাটির নাম মেরুদণ্ড। পৃথিবীরও উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত যদি একটী ঐরূপ প্রকাণ্ড কাটি আছে মনে করা যায় সেইটীর নাম উহার মেরুদণ্ড, এই মেরুদণ্ডে যেন কেহ পাক দিতেছে তাই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী একবার গড়াইতেছে, এজন্য সূর্য্য ও নক্ষত্রগণকে পূর্ব্ব দিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখা যায়। গাড়ীর চাকা যেমন গড়াইতে গড়াইতে অনেক দূর যায়,

পৃথিবীও তদ্রূপ আপনা আপনি গড়াইতে গড়াইতে সেই সঙ্গে সূর্য্যের চারিদিক বেষ্টন করিতেছে।"

কিশোঃ—"সবই বুঝিয়াছি, কিন্তু আমার একটী সন্দেহ আছে। যখন রেল গাড়ীতে যাই, তখন যদি জানালা দিয়া মুখ বাড়াই, তাহা হইলে বাতাসের জোরে যেন পড়িয়া যাইব ভয় হয়, আর তখন যদি কেহ ছাতে গিয়া দাঁড়ায় তবে সে নিশ্চিত পড়িয়া যাইবে। কিন্তু যখন পৃথিবী ফি সেকেণ্ডে ১০০০ ক্রোশ পথ ছুটিতেছে, রেলের চেয়ে কত হাজার হাজার গুণ জোরে, তখন আমরা ছুড়িয়া পড়ি না কেন? আর বাতাসই বা সে রকম তেজে গায়ে লাগে না কেন?"

নবীন বাবু—"বেশ বলিয়াছ, এ প্রশ্ন হওয়াই স্বাভাবিক, তুমিত বালক, বড় বড় পণ্ডিতেরাই একথা তলাইয়া বুঝেন না। ভাল, রেলের গাড়ীর ভিতরে যখন বসিয়া থাক তখন ছুড়িয়া পড় না কেন? তখনই বা বাতাসের অত তেজ হয় না কেন?" (কিশোঃ—'বলিতে পারি না") এইটী বুঝিতে পারিলেই ঠিক হইবে। গাড়ীর ভিতরে বসিলে বায়ুর গতি অনুভব করা যায় না তাহার কারণ এই যে গাড়ীর ভিতরে যে বাতাস আছে তাহা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই চলে ছাতের উপরে ত তাহা নহে, সেখানকার বাতাস গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলে না কাজেই তাহাদের তেজে পড়িয়া যাইতে হয়। পৃথিবী আমাদিগকে যেমন আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, গাছ, বাড়ী, পুকুরে, নদীতে ও সমুদ্রে জল রাখিয়াছে, সেইরূপ বাতাসকেও ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। কদম ফুলের গায়ে পাপ্‌ড়ী গুলি যেরূপ থাকে, আমাদের মাথায় চুল যেরূপ থাকে মণ্ডলাকার পৃথিবীর গায়ে ৫০ মাইল ব্যাপিয়া বায়ুরাশিও ঠিক সেইরূপ আছে। ইহাও পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরিতেছে সেই জন্য আমরা বায়ুর জোর টের পাই না, আর পৃথিবী আমাদিগকে টানিয়া রাখিয়াছে বলিয়া পড়িয়া যাই না। বুঝিলেত? আরও অনেক কথা আছে, বড় হইয়া যখন পড়িবে তখন জানিতে পারিবে। চল আজ বাড়ী যাই, বড় হিম পড়িতেছে।" নলিন—"আমাকে তোমরা খাবার দাও, ভাগ্যিস্ আমি ঢিল ঘুরাইতেছিলাম তাইত এত নূতন কথা শিখিলে?" সকলে হাঁসিলেন। অমূল্য ঃ—"নলিন, ছোট পিসীকে আজ গিয়া জিজ্ঞাসা করিও, বাসুকী কিসের উপর থাকে?" বিনয়ঃ—"তা তিনি বলিবেন 'দেবতা যে বাসুকী'।" সকলে হাসিতে হাসিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। মন্মথ—"দাদা মহাশয়, এবার হিম পড়ে কেন, আমি শুনিব, জানিনা। আরবারে তাই বলিবেন কি?"

শ্বেত ভল্লুক।

উপরে যে জন্তুর নাম দেখিতেছ, তাহা কিরূপ জান কি? এই প্রাণী কি তোমরা কখন দেখিয়াছ? না দেখ নাই। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড, উত্তর রুসিয়া প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশেই ইহারা বাস করে। আমাদের ভারতবর্ষের ন্যায় গরম দেশে ইহারা বাঁচে না। ইহারা খুব মোটা, আকারে এদেশী ভালুকেরই মত, কিছু বড়ও হয়। ইহাদের সর্ব্ব শরীর বড় বড় শাদা লোমে ঢাকা। ইহাদের চক্ষু ছোট ছোট, ও পায়ের তলায় এক এক গোছা বড় বড় পুরু লোম হয়। সচরাচর ইহারা নদী, হ্রদ বা সমুদ্র হইতে বড় বড় মাছ ধরিয়া খায়, আর যখন তাহা না পায় তখন অন্যান্য জন্তু খাইয়াও বাঁচে। আর কিছু না পাইলে অবশেষে ছোট ছোট গাছ পালাও খাইয়া থাকে।

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের রাজ্যে কাহারও অসন্তোষের কারণ নাই। তিনি মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব করিয়া কত বুদ্ধি দিয়াছেন, মানুষ সেই বুদ্ধিবলে সকল অভাব দূর করিতেছে ও কত নূতন নূতন সুখ সচ্ছন্দতার উপায়

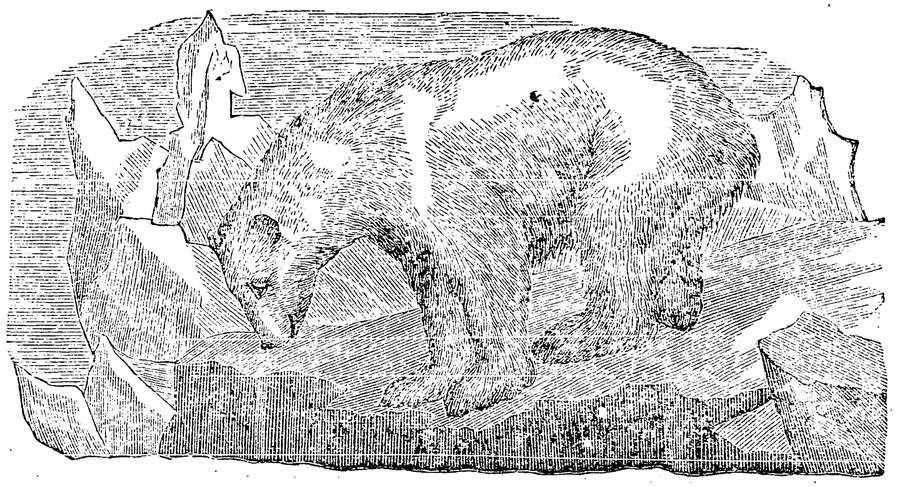

বাহির করিতেছে। ঘোরতর গ্রীষ্ম, যেখানে রৌদ্রে মাটী ফাটিয়া যাইতেছে, মানুষ সেখানে ছাতা, পাখা, খসখসী, বরফ-জল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া গ্রীষ্মের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইতেছে। আবার যেখানে ভয়ানক শীত, নদী হ্রদ সাগরাদি জমিয়া বরফের রাস্তা ও বরফের মাঠ হইয়া থাকে, সেই ভয়ানক স্থানেও বনাত, কম্বল, অগ্নিকুণ্ড প্রভৃতি উপায় করিয়া শীতের দৌরাত্ম্য অনেকপরিমাণে কমাইয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল কাটাইতেছে। কোথাও লাঙ্গল লাগাইয়া ও বীজবপন করিয়া পৃথিবী হইতে শস্য জন্মাইয়া সুখে আহার করিতেছে, কোন স্থানে বা ধনুর্ব্বাণ অথবা গুলি বারুদের সাহায্যে নানাবিধ পশু বধ করিয়া মাংস দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। স্থান বিশেষে বা ঋতু বিশেষে তাহাদের সুখের কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর ত ইতর জন্তুদিগকে এত বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি প্রদান করেন নাই। তিনি কি নিষ্ঠুর? কেবল কষ্ট দিবার জন্যই কি ইতর প্রাণীদিগকে সৃজন করিয়াছেন?—ছি ছি!! বালকগণ! কখন এরূপ ভাব মনে স্থান দিয়া অপরাধী হইও না। তাঁহার দয়ার চোখে সবাই সমান। তিনি ইতর জন্তুদিগকে মনুষ্যের ন্যায় এত বোধশক্তি দেন নাই সত্য, কিন্তু, তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এ প্রকার কৌশল ও দয়ার সহিত গঠিত করিয়াছেন যে, তাঁহাকে অপার করুণাময় না বলিয়া থাকা যায় না।

এই শ্বেত ভালুকেরা ভয়ানক শীতল দেশের নিবাসী, এই জন্যই পরমেশ্বর ইহাদের সর্ব্ব শরীর ঘন লোমে ঢাকিয়া দিয়াছেন। ইহাদিগকে সর্ব্বদা বরফের উপরেই চলিতে ফিরিতে হয়, এই জন্যই ইহাদের পায়ের তলায়ও এক এক গোছা লোম দিয়াছেন! আমাদের দেশীয় ভল্লুকদিগের সেরূপ নাই। আরও দেখ—ইহাদের বর্ণ যদি কাল হইত তাহা হইলে ইহারা কখন প্রাণ ধারণ করিতে পারিত না। আপাততঃ একথাটী যেন ঠিক নহে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে যে কথাটী সত্য। উত্তর কেন্দ্রের সন্নিকটস্থ দেশ সকলে ভয়ানক শীত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তথায় বরফই প্রধান পদার্থ, এবং এই বরফের নিম্নস্থ জলের মধ্যে যে সকল মৎস্য বেড়ায় তাহারাই বাহিরে আসিয়া পড়িলে এই ভালুকের আহার হয়। সাদা রঙ্গের বরফ-রাশি চারিদিকে স্তূপাকারে রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া দেখিয়া মাছেদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহারা নির্ভয়ে মধ্যে মধ্যে এই বরফ স্তূপের উপরে বা পার্শ্বে রৌদ্র ও বায়ু সেবনের জন্য আসিয়া থাকে। ভল্লুকেরা এই বরফের মধ্যে আপনাদের শরীরের

বর্ণ মিলাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, মৎস্যাদি বাহির হইলেই অলক্ষিত ভাবে গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও নষ্ট করে। যদি ইহাদের বর্ণ অন্যরূপ হইত তাহা হইলে শ্বেত বরফের গায়ে সুস্পষ্ট দেখা যাইত, সুতরাং মৎস্যেরাও তাহা দেখিয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিত। এইরূপে পুনঃ পুনঃ মাছ ধরিতে না পারিয়া কাল বা অন্য রঙ্গের ভল্লুককে অবশেষে অনাহারে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই দয়াময় বিধাতা ইহাদিগকে শ্বেত বর্ণের করিয়া দিয়াছেন। আহা! তাঁহার করুণা অপার, মহিমা অতুল! তাঁহার ক্রিয়া কলাপ আমরা যতই পর্য্যালোচনা করি, ততই আশ্চর্য্যান্বিত হই, ততই তাঁহার অসীম বুদ্ধি কৌশল ও দয়ার প্রমাণ দেখিয়া মোহিত হই!

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল।

একজন বড় মানুষের স্ত্রী ফুল বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু সমুদায় ফুলের মধ্যে আবার গোলাপ ফুলই অধিক ভাল বাসিতেন, নানা দেশের, নানা রকমের অতি সুন্দর সুন্দর গোলাপফুলের গাছ তাঁহার বাগানে ছিল। তাঁহার বাড়ীর চারিধারে অতি মনোহর নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া থাকিত। কিন্তু এত শোভা, এত ফুলের বাহারের মধ্যেও হায়! হায়! তাঁহার রাঙ্গার ঘরে দুঃখ, পাপ ও যন্ত্রণা সর্ব্বদাই বাস করিত। এক দিন এই সুন্দর গৃহের মধ্যে তিনি অতি সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সমুদায় চিকিৎসকই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন তাঁহার জীবনের আশা করা বৃথা। তিনি আর এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজন সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী লোক বলিলেন, "এখনও ইহাঁর জীবন রক্ষার এক উপায় আছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে ফুল সুন্দর ও যাহা সর্ব্বদাই পবিত্র ও উজ্জ্বল থাকে এমন ফুল যদি ইহার চক্ষের সম্মুখে ধরা যায় তাহাহইলে কখনই ইহাঁর মৃত্যু হইবে না।" এই কথা শুনিয়া নানা দেশের নানা লোক আপন আপন বাগানের সুন্দর সুন্দর গোলাপ আনিল। কিন্তু কোনটাই ঠিক মনের মত হইল না। এ ফুল ভালবাসার বাগান হইতে তুলিতে হয়; গোলাপটী যেন সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও উচ্চ ভালবাসায় গঠিত হয়। জ্ঞানী লোকটী অবশেষে বলিলেন, "কেহই যথার্থ ফুলের নামটী করেন নাই। কোথায় এ ফুল ফোটে তাহাও কেহ বলেন নাই। এ পুষ্প মহা ধার্ম্মিক লোকদিগের শ্মশানে প্রস্ফুটিত হয়। এ ফুল কখন শুকায় না, কখন ঝরিয়া পড়ে না।" একজন মহিলা হাসিতে হাসিতে ফুলের মত আপনার সুন্দর ছেলেটীর হাত ধরিয়া রোগীর শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। তিনি ফুলের কথা শুনিয়া বলিলেন "আমি জানি কোথায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোলাপ আছে—আমার এই বাছার লাল গালদুটী যেন গোলাপ ফুটিয়া আছে। যখন ললিত আমার শৈশবের পবিত্র ও নির্ম্মল ভালবাসা দেখায়, আর যখন ঘুম থেকে ঐ সরলতা-মাখা বড় বড় চক্ষু দুটী তুলিয়া আমার মুখ পানে চাহিয়া শৈশবের পবিত্র হাসি হাসে, আমি তখনই দেখি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল তাহাতেই ফুটেছে;—এই আমার নির্ম্মল ফুল।" তখন জ্ঞানী-ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "হাঁ, ইহাও একটী অতি মনোহর ফুল বটে; কিন্তু আরও একটী ফুল আছে যাহা ইহা অপেক্ষাও সুন্দর।" আর একটী রমণী বলিলেন "আমি একটী ফুল দেখিয়াছি যাহা এই সুন্দর ফুলটীর চেয়ে আরও মনোহর, সেই ফুল এই।" এই বলিয়া শয্যাগতা রোগকাতরা স্ত্রীলোকটীকে দেখাইয়া দিলেন। "ইহা অপেক্ষা সুন্দর ফুল আর ফোটে না; আমি দেখি-

য়াছি যখন ইনি আপনার সমুদায় সুন্দর সুন্দর বসনভূষণ খুলিয়া ফেলিয়া আপনার প্রাণের পীড়িত সন্তানকে বুকে ধরিয়া সমুদায় রাত্রি কেবল চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন, এবং ভগবানের নিকট "তুমি যা কর, ভগবান!" এই বলিয়া পুত্রের সুকোমল মুখখানি চুম্বন করিয়াছেন।—আমি তখনই দেখিয়াছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল এই বাটীতেই ফুটিয়াছে।" "এই যে ফুল ইহাও চমৎকার কিন্তু বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ ফুল ইহাও নয়।" তখন একজন ধার্ম্মিক বৃদ্ধলোক বলিলেন "এক গরিবের কুটীরে দেখিয়াছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল বাস্তবিকই সেখানে ফুটিয়াছে। আমি দেখিয়াছি যখন সেই পবিত্র ফুলটী প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে হাত দুখানি যোড় করিয়া চক্ষু দুটী মুদিয়া ঈশ্বরের পূজাতে নিযুক্ত থাকে তখন সেই বালিকার পবিত্র মুখ খানিতে স্বর্গের শোভা প্রস্ফুটিত হয়; আমার তখনই মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল বুঝি এই। সেই ফুলটী বাস্তবিকই নির্ম্মল, পবিত্র প্রেমের ছবি। ঈশ্বর এই বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করুন! কিন্তু এখনও কেহই সেই ফুলটীর নাম করেন নাই।" সেই সময় গৃহের মধ্যে একটী অতি সুন্দর বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বালকটীই পীড়িতা রমণীর রত্ন। সে ছলছল চক্ষে মাকে বলিল "মা, আমি তোমাকে এই সুন্দর বই হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।" এই বলিয়া সে একখানি পুস্তক হইতে করুণাময় পরমেশ্বরের মহিমা পড়িয়া শুনাইল। আর এই কথাগুলি শুনিবামাত্র তাহার মায়ের মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। সেই কথা গুলি এই——

"করুণাময় দেবতা আমাদের ইহ-কাল পরকালের এক মাত্র গতি, আর অন্য গতি নাই।"

তখন তাহার মাতা বলিলেন "আমি দেখিয়াছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল কোথায়; এই কথা গুলির ভিতর সেই শ্রেষ্ঠ ফুল ফুটিয়াছে। যে এ ফুল দেখিয়াছে সেই অমর; তাহার আর মৃত্যু নাই।"

ঐতিহাসিক গল্প।

প্রথম গল্প।

যোগীন বাবু বিকাল বেলা ছাদে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছেন। সরলা, বিমলা, তরলা, প্রমীলা, নরেন, সুরেন ও ব্রজেন আসিয়া "দাদা,দাদা" বলিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। যোগীন বাবুর তিনটী বোন ও তিনটী ভাই। বোনেদের মধ্যে সরলা সকলের বড়, তার বয়স ১৪ বৎসর। নরেন সরলার ছোট তার বয়স ১৩ বৎসর। প্রমীলা সকলের ছোট তার বয়স সাত বছর। ইহারা সকলেই দাদাকে বড় ভাল বাসে। দাদাও ভাই বোন সকলকে বড় ভাল বাসেন। প্রতিদিন বিকালবেলা যোগীন বাবু কালেজ হইতে আসিলেই ইহারা সকলে গিয়া তাঁহার মুখে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর গল্প শুনে। আজও গল্প শুনিবার জন্য সকলে গিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াল। ইসরলা দাদার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহার চুলগুলি গুছাইয়া দিতে লাগিল। বিমলা তাঁহার দাড়ি ধরিয়া আদর করিতে লাগিল, তরলা তাঁহার একপাশে দাঁড়াইয়া জামার হাতের বোতামটী একবার খুলিয়া আবার বন্ধ করিতে লাগিল। প্রমীলা তাঁহার বাম হাতের আঙ্গুলগুলি লইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অন্য মনে খেলা করিতে লাগিল। নরেন, সুরেন ও ব্রজেন তাঁহার পায়ের নিকটে আসিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সকলেই "দাদা গল্প বল, গল্প বল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। যোগীন বাবু হাসিয়া হাসিয়া সকলের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন,—"কি গল্প শুনিবে বল দেখি?" প্রমীলা বলিয়া উঠিল,—"সেই বাঘের গল্প বল, দাদা।"

তরলা বলিল,—"না দাদা, সেই জঙ্গলে একটা ছেলে পড়েছিল, ঐ গল্পটা বল।"

সরলা বলিল,—"না দাদা, একটা নূতন গল্প বল।"

তখন সুরেন, নরেন, তরলা, বিমল, সকলেই বলিল,—"বেশ দাদা! আজ একটা নতুন গল্প বল।"

যোগীন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা তবে তোমরা বসো।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই যোগীন বাবুর সুমুখে গিয়া বসিল। কেবল সরলা দাদার অনুমতি লইয়া তাঁহার পাশে তাঁহার হাতটী ধরিয়া দাঁড়াইয়া গল্প শুনিতে লাগিল।

যোগীন বাবু বলিতে লাগিলেন:—"আচ্ছা বল দেখি এ বাড়ী কার?"

সকলে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"আমাদের।"

যোগীন,—"এ পাড়া কার?"

সকলে,—"আমাদের।"

যোগীন বাবু,—"যেমন আমাদের বাড়ী আছে, যেমন আমাদের পাড়া আছে, তেমনি আমাদের একটা গ্রাম আছে ও তেমনি আমাদের একটা দেশও আছে। অনেকগুলি বাড়ীতে একটা পাড়া হয়, অনেকগুলি পাড়াতে একটা গ্রাম হয়, অনেকগুলি গ্রামে একটা জেলা হয়, অনেকগুলি জেলাতে একটা ছোট দেশ হয়, তাহাকে প্রদেশ বলে। আর অনেকগুলি প্রদেশে একটা দেশ হয়। আমাদের দেশ খুব বড়। তাহার নাম তোমরা জান কি?"

নরেন বলিল,—"জানি বই কি? আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ।"

তখন বিমলা, তরলা, ও সুরেনও এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"ভারতবর্ষ, জানি বই কি?"

যোগীন বাবু তখন আবার বলিতে লাগিলেন,—"এই ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। আমাদের পাড়াকে, আমাদের গ্রামকে যেমন আমরা বেশী ভাল বাসি, এই দেশকেও তেমনি আর আর দেশের চাইতে আমরা বেশী ভাল বাসি। আমাদের বাড়ীর লোকেরা যেমন আমাদের আপনার লোক, তেমনি আমাদের যে দেশ সেই দেশের লোকেরাও আর আর দেশের লোকের চাইতে আমাদের বেশী আপনার লোক। যে ভারতবর্ষের লোক সেই আমাদের ভাই, তাহাকেই আমাদের আপনার ভাইয়ের মত আদর করা উচিত।"

"এই ভারতবর্ষ এখন আমাদের আপনার দেশ হইয়াছে, কিন্তু তিন চার হাজার বছর আগে ইহা আমাদের দেশ ছিল না। তখন এই দেশে আর এক জাতের লোক ছিল। তারা বড় অসভ্য ছিল। কাঁচা মাংস খাইত, বনে বনে থাকিত। তারা ভাল করিয়া ঘর বাড়ী বাঁধিতে জানিত না, কাপড় পরিতে জানিত না, চাষ করিতে জানিত না। তারা অতি অসভ্য ছিল। আজ কাল আর এ দেশে সে জাতের লোক বেশী নাই। কেবল কোনও কোনও পাহাড়ে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নাগা, কুকী, সাঁওতাল, ভিল, এই যে সকল অসভ্য জাতি পাহাড়ে আছে, ইহারাই সেই আগেকার অসভ্য লোকদিগের এক জাত।"

"হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে আমাদের জাতের লোকেরা আর এক দেশে বাস করিতেন। সে দেশ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে, অনেক দূরে। এক বাড়ীতে খুব বেশী লোক হইলে যেমন বাড়ীর লোকেরা দুভাগ হইয়া দুটো বাড়ী করে, তেমনি একই দেশে যদি কখনও খুব বেশী লোক হয়, তখন সেই দেশের লোকেরা দলে দলে আর আর দেশে যাইতে আরম্ভ করে। আমাদের আগেকার দেশের লোকেরাও এই জন্য দলে দলে আর আর দেশে যাইতে লাগিলেন। একদল পশ্চিম মুখো গিয়া ইউরোপে ঘর বাড়ী বাঁধিলেন। সাহেবেরা এই দলেরই বংশের লোক। আর এক দল পারস্য দেশে

গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষে আসিয়া এই দেশের অসভ্য লোকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এই দেশ দখল করিলেন।"

সরলা বলিল,—"তবে দাদা, এ দেশ ত আমাদের নয়। আমরা আর এক জাতের দেশ জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছি বইত নয়?"

যোগীন,—"হ্যাঁ, প্রথম প্রথম, এ দেশ আমাদের, এ কথা বলা যাইত না বটে, কিন্তু এখন এটা আমাদেরই হইয়াছে।"

সরলা,—"হ্যাঁ দাদা, জোর করে আর এক জনের জিনিষ কেড়ে নিলে তা কি কখনও আমার হতে পারে?"

যোগীন,—"প্রথম প্রথম এ দেশ আমাদের ছিল না সত্য, কিন্তু যখন আমরা এ দেশে ঘর বাড়ী বাঁধিলাম, তখন আমরাও সেই আগেকার অসভ্য জাতিদের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশেরই লোক হইলাম। এই দেশ তাহাদের ও আমাদেরও; এখন আমরা সকলেই এই দেশের লোক।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা দাদা, সাহেবেরাও কি এই দেশের লোক?"

যোগীন;—"না সাহেবেরা আমাদের দেশের লোক নন; তাঁরা এ দেশে যদি ঘর বাড়ী বাঁধিয়া চিরকালের জন্য বসতি করিতেন, তাহা হইলে এ দেশের লোক হইতেন। এখন তাঁরা এ দেশে কাজ করিতে আসেন, কাজ শেষ হইলেই আবার আপনার দেশে চলিয়া যান, কাজেই সাহেবেরা আমাদের আপনার দেশের লোক নন—আজ আমাদের এই গল্পটা এখানেই শেষ হউক; রাত হয়েছে। তোমরাও এখন একটুকু পড়া শুনা কর গিয়ে।"

সকলেই তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। যোগীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বল দেখি আজ কি শিখিলে?" নরেন বলিল,—"আমি বলিব কি, দাদা?" বিমলা ও সরলা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল "আমি বলিব, দাদা।"

যোগীন বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা সরলা তুমি বল দেখি আজ কি গল্প হলো?" সরলা বলিল, "এই ভারতবর্ষ আমাদের আপনার দেশ, এদেশের লোকদিগকে আমাদের ভাল বাসা উচিত, তাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া উচিত। এই ভারতবর্ষ এখন আমাদেরই দেশ কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে এদেশে নানা অসভ্য জাতের বাস ছিল। ভীল, সাওতাল, খাসিয়া, এরা সেই সকল জঙ্গলী জাতের সন্তান সন্ততি। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে অনেক দূরে এক দেশে বাস করিতেন। সেখানে যায়গার অকুলান হওয়াতে তাঁরা দলে দলে সেই দেশ ছাড়িয়া আর আর দেশে যান। প্রথমে একদল পশ্চিম দিকে গিয়া ইউরোপে ঘর বাড়ী বাঁধেন। তাঁহারাই সাহেবদের পূর্ব্ব পুরুষ। তার কিছুদিন পরে আর একদল পারস্যদেশে যান। ও একদল ভারতবর্ষে ঢুকেন। ইহাঁরাই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ।" যোগীন বাবু বলিলেন,—"বেশ হয়েছে, সকলে এসব কথা মনে রেখো। এখন পড়া শুনা কর গিয়ে।"

এই বলিয়া যোগীন বাবু ভাই ভগিনীদিগকে বিদায় করিয়া আপনার পড়িবার ঘরে গেলেন।

পাহারা ওয়ালার ভেল্কী।

একদিন একজন দারোগা ২৪ জন সিপাহি সঙ্গে করিয়া একটা বড় বাড়ী পাহারা দিতে গেলেন। বাড়ীটাতে ৯টী কামরা, দারোগা সাহেব একবার সব কামরা গুলি ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহার সিপাহি দিগকে ডাকিয়া প্রত্যেক পাশের কামরায় তিন জন করিয়া লোক রাখিয়া মাঝখানের কামরায় আপনি নিজে গিয়া বসিলেন। তাহার মনে এই বন্দোবস্তে বড়ই আনন্দ হইল। প্রতি দিকেই নয় জন করিয়া সিপাহি আর তিনি আপনি মাঝখানে,—বাড়ী রক্ষা করিবার আর ভাবনা কি? প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে দারোগা সাহেব আপনার কামরায় গিয়া নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, কিন্তু চোর ডাকাতের কোনও সাড়া শব্দ নাই; চুপটী করিয়া বসিয়া বসিয়া সিপাহিদিগের বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা দারোগা সাহেবকে জাগাইয়া গিয়া বলিল, —"মহাশয়, এক যায়গায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের পা ধরিয়া গিয়াছে, আপনি যদি হুকুম দেন তবে আমরা একবার স্থান পরিবর্ত্তন করি।" ঘুমের ঘোরে থাকিয়াই দারোগা সাহেব বলিলেন, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে প্রত্যেক দিকে নয় জনা করিয়া লোক থাকা চাই।" দারোগার হুকুম পাইয়া সিপাহিরা বাহিরে আসিলে তাহাদের একজন বলিল, "ভাই যদি এইরূপ দাঁড়াইয়াই পাহারা দিতে হয় তবে আর যায়গা বদল করিয়া লাভ কি? চল আমরা চার জন বাহিরে যাই, আর আমি প্রত্যেক দিকে নয় জন করিয়া সাজাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে এইরূপ করিয়া লোক গুলাকে দাঁড় করাইল:—

৩	৩	৩
৩	দারোগা	৩
৩	৩	৩

ইহাতে প্রতি দিকে নয় জন করিয়া রহিল, অথচ সর্ব্বশুদ্ধ চারি জন লোক কমিয়া গেল। দারোগা সাহেব কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া লোক গণতি করিলেন। সব দিকেই নয় জন আছে দেখিয়া তাঁর বড়ই আনন্দ হইল। প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে আবার আপনার কামরায় গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইলেন।

৪	১	৪
১		১
৪	১	৪

কিছুকাল পরে যে চারি জন সহরে বেড়াইতে গিয়াছিল, তারা আরো চার জন লোক সঙ্গে করিয়া এই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং ২৮ জন মিলিয়া পাহারা দিতে লাগিল। ঘণ্টা খানিক পরে দারোগা সাহেব আবার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন লোকগুলি এই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে:—

২	৫	২
৫		৫
২	৫	২

প্রত্যেক দিকেই নয়জন লোক আছে দেখিয়া দারোগার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"আহা আমার কি ভাগ্য! প্রত্যেক দিকেই নয়জন লোক আছে। এমন বিশ্বস্ত সিপাহি আমার অধীনে পাইয়াছি!" এই ভাবিয় দারোগা সাহেব আবার প্রাণের আহ্লাদে আপনার কামরায় গিয়া ঘুমাইলেন।

দারোগা সাহেব আপনার কামরায় গেলে পরে সহর হইতে আরো চারি জন সিপাহি আসিয়া যুটিল—২৪জনার স্থানে ৩২ জনা হইল, কিন্তু এখনও প্রত্যেক দিকে নয় জনাই রহিল:—

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার দারোগা সাহেব বহিরে আসিয়া সব পরিদর্শন করিয়া গেলেন, কিন্তু চব্বিশ

১	৭	১
৭		৭
১	৭	১

জনার স্থানে যে ৩২ জনা হইয়াছে ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রত্যেক দিকেই নয়জনা আছে, আর ভাবনা কি?

কিছুকাল পরে আরো চারি জনা সিপাহি আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এবারও তাহারা এমন ভাবে দাঁড়াইল, যে প্রত্যেক দিকে ঠিক নয় জনাই রহিল:—

০	৯	০
৯		৯
০	৯	০

এইরূপে বার বার দারোগা সাহেবকে ঠকাইতে পারিতেছে দেখিয়া, সিপাহিদিগের সাহস বাড়িল। তখন এক জন বলিল "চল ভাই এখন আমরা অর্দ্ধেক

সহরে বেড়াইতে যাই।” এই বলিয়া আঠার জন সহরে চলিয়া গেল। যে আঠার জন সেই বাড়ীতে রহিল,—তারা এইরূপ ভাবে দাঁড়াইল, কাজেই প্রত্যেক দিকে নয় জনাই রহিলঃ—

৫	০	৪
০		০
৪	০	৫

দারোগা সাহেব ভোরবেলা আর একবার উঠিয়া তাঁহার লোক গণতি করিয়া দেখিলেন, দেখিলেন সন্ধ্যাবেলা তিনি যেমন প্রত্যেক দিকে নয় জনা করিয়া সাজাইয়া ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনিই প্রত্যেক দিকে নয় জনা আছে। তাঁহার ২৪ জনার মধ্যে যে ছয় জন নাই দারোগা সাহেব এইটী বুঝিতে পারিলেন না।

কি করিয়া পাহারাওয়ালাগণ দারোগাকে ঠকাইল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? কোণের ঘরগুলিতে যারা থাকে তাদের দুইবার করিয়া গণনা হয়। সুতরাং এই ঘরগুলিতে যত বেশী লোক থাকে সমস্ত বাড়ীতে তত কম লোক থাকে, আর এই ঘরগুলিতে কম লোক থাকিলে সমস্ত বাড়ীতে লোক সংখ্যা বেশী হয়।

এই গল্প হইতে আমরা কি শিখিলাম?—যাহা করিতে হয় খুব ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সবদিক দেখিয়া করিবে। নতুবা ভাসা ভাসা ভাবে কাজ করিলে দারোগা সাহেবের মত ঠকিতে হইবে। *

দাদাবাবুর খোস গল্প।

আমি এক দিন চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়াছিলাম,—প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে; খোলা জানালা দিয়া সূর্য্যের লাল কিরণ একটু একটু ঘরে ঢুকিতেছে,—আমি তাহাই দেখিতেছিলাম, আর ছাই পাঁশ কত কি ভাবিতেছিলাম, এমন সময় স্বর্ণ, দেবেন্দ্র, কুমুদিনী, যতীন ও চারু দৌড়িয়া আমার ঘরে আসিল। আমার ভাই বোন গুলি আমাকে বড় ভাল বাসে। গল্প শুনিবার দরকার হইলেই “দাদা বাবু” “দাদা বাবু” করিয়া আমার নিকটে আসিয়া যোটে। আমিও যতদূর পারি নূতন নূতন গল্প বলিয়া সকলকে খুসী করি। আজ তাহারা হুড়মুড় করিয়া হঠাৎ আমার নিকট আসাতে আমি চমকিয়া উঠিলাম।

স্বর্ণ বলিল, “দাদা বাবু! তুমি মাথায় হাত দিয়া কি ভাব?”

কুমুদিনী বলিল—কি আর ভাব্‌বেন? ভাবেন আমরা এলে কি গল্প বল্‌বেন; তাই মনে মনে তোয়ের করে রাখেন?”

দেবেন্দ্র বড় তেজাল ছেলে; সে বলিল “দাদা বাবু সাহেবদের মারবার কথা ভাবেন।”

যতীন বলিল—“দাদা বাবু বিলাতে গিয়ে নানা রকম কল তোয়ের কর্‌তে শিখে আস্‌বেন, তাই ভাবেন।”

চারু ছোট ছেলে,—সে কিছুই বলিল না, কেবল বলিতে লাগিল—“গল্প বল না, ও—দাদা বাবু!”

আমি সকলের কথাতেই হাসিলাম; পরে সকলকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কিসের গল্প বলিব?”

সকলেই বলিয়া উঠিল, “যা হয় নতুন একটা কিছু বল।” কেবল আমার “কুমুদিদী” বলিলেন—“তোমার বাঘা কুকুরের কোন একটা নতুন কাণ্ডের কথা বল না?”

আমি তাহাতেই রাজি হইয়া বলিতে লাগিলাম:—“দেখ, আমি এর পূর্ব্বেই তোমাদের বলেছি আমার বাঘা কুকুরটীর খুব বুদ্ধি আছে, এবং এর অনেক গল্পও বলেছি। কেবল দুটী গল্প এখনও বলা হয় নাই। আজ তার একটী বলিতেছি। আমি এক দিন আমাদের গ্রাম ছাড়াইয়া আর এক গ্রামের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, বাঘা আমার সঙ্গেই ছিল। বিকাল বেলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় বাঘা রাস্তা দিয়া আগে আগে ছুটিতে লাগিল। বাঘা প্রায়ই এইরূপ করিত, কাজেই আমি সে দিকে বেশী মন দিলাম না। আমি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম, এমন সময় ছোট ছেলের কান্নার মত একটা শব্দ আমার কানে আসিল। তখন দৌড়িয়া গিয়া দেখি বাঘা এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াছে; সেই বাড়ীতে একটী ৩।৪ বছরের ছেলে একটী কাচের বাটিতে করিয়া দুধ খাইতে ছিল, এবং এক হাতে একটী “ঝুন্‌ঝুনি” বাজাইতেছিল। আমি ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম তাহার কাচের বাটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ছোট ছেলে বলিতেছে “দুষ্টু কুকুল্! বাঁদল কুকুল্! তোকে ঝুন্‌ঝুনি মাল্‌ব অকন্!” আমি গিয়া বাঘাকে ফিরাইয়া আনিতেছিলাম, এমন সময় সেই ছেলেটীর মা ঘরে আসিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া ভাঙ্গা কাচের বাটি ও দুধের দাম দিয়া চলিয়া আসিলাম। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ বাঘা দুধ কাড়িয়া খাইতে গিয়াছিল, কিন্তু বাঘা সে রকম “লোক” নয়। বাঘা ছোট ছেলেটীকে দেখিয়া তার সঙ্গে “ভাব” করিতে গিয়াছিল; তাহাকে আদর দেখাইতে গিয়া তাহার গায়ে লাফাইয়া উঠাতেই ভয়ে ছেলেটীর হাত হইতে কাচের বাটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া ছিল।

এই ঘটনার পরে অনেক দিন গেল। একদিন আমি বাঘাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক ছেলে মেয়ে যুঠিয়াছিল। বাঘাকে দেখিয়া অনেকে আদর করিতে লাগিল, কেহ কেহ ত্যক্ত করিতেও ছাড়িল না। যাহারা আদর করে, বাঘা তাহাদিগকে দেখিয়া লেজ নাড়িল, আর যাহারা ত্যক্ত করে বাঘা তাহাদিগকে দাঁত দেখাইয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। আমি দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় কি একটা গোলমাল হইয়া উঠিল—শুনিলাম একটী ছোট ছেলে জলে পড়িয়াছে। আমি দৌড়িয়া সেই দিকে গেলাম, বাঘাও সঙ্গে ছুটিল। বাস্তবিকই একটী ছেলে নদীর স্রোতে হাবুডুবু খাইতে ছিল। আমি আঙ্গুলের দ্বারা বাঘাকে দেখাইয়া দিলাম। বাঘা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তখনই ঝাঁপাইয়া জলে পড়িল, এবং ছেলেটীর দিকে যাইতে লাগিল, আমিও জামা ও যুতো রাখিয়া বাঘার পেছনে পেছনে সাঁতার দিলাম। আমরা দুজনে ছেলেটীকে তীরে আনিয়া তুলিলাম। তখন দেখি ছেলেটী আর কেহই নয়, কিছুকাল আগে বাঘা যাহার কাচের বাটি ভাঙ্গিয়া ছিল, এ সেই ছেলে। তখন বাঘার আনন্দ দেখে কে? লাফাইয়া লাফাইয়া বাঘা ছেলেটীর চারধারে ঘুরিতে লাগিল। ছেলেটী চোখ খুলিয়া চারিদিকে তাকাইয়া বাঘাকে দেখিল, দেখিয়া চিনিতে পারিল, এবং বলিল “আল্ আমি তোমায় ঝুন্‌ঝুনি মাল্‌বনা।” বাঘা ছেলেটীর হাত চাটিতে লাগিল। তামাসা দেখিবার জন্য একদল লোক জমিয়া গেল। ছেলেটীর মাও খবর পাইয়া আসিলেন। বাঘা হাত চাটিতে লাগিল এবং এত আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল যে তার অর্দ্ধেক শরীরটা লেজের সঙ্গে নড়িতে লাগিল। বোধ হয় সে মনে মনে এই বলিতেছিল—“আহা! তুমি যে আমাকে মার্‌তে চেয়েছিলে, আমি কি তা মনে করে রেখেছি! পরমেশ্বর যদি আমাকে ছেলে করে দিতেন, তা'হলে আমি দিন দিন ভাল হ'তাম, লোককে ভাল বাসিতাম, কারও মনে কষ্ট দিতাম না, এবং কেউ কোন দোষ করিলে সহজে ভুলে যেতাম।”

ছেলে বাঁচিয়াছে দেখিয়া আহ্লাদে মায়ের চোখে জল পড়িতে লাগিল। আনন্দে দলশুদ্ধ ছেলেমেয়ে হাততালি দিয়া উঠিল। আমি মনের সুখে বাঘাকে লইয়া ঘরে ফিরিলাম।

---

* এইটী ইংরাজী হইতে গৃহীত।

মদ্যপানের ফল।

(৩নং)

আজিকার ঘটনা সমস্তই সত্য। বিনয়-দের বাড়ীতে আজ কেন কান্নার ধূম পড়িয়াছে, বলিতে পার? ঐ দেখ বিনয়ের মা কাঁদিতে কাঁদিতে হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। বিনয় শিশু, সেও সকলের দেখা দেখি কাঁদিতেছে।

বিনয়ের বাপ স্কুল কলেজে বড় ভাল ছেলে ছিলেন, তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া মেডিকাল কলেজে ভর্ত্তি হন। যথা সময়ে মন্মথ বাবু ডাক্তারী পরীক্ষায় 'পাশ' হইয়া ডাক্তার হইলেন। তাঁহার যেমন দয়া, ঔষধ পত্রের জ্ঞানও তেমনি; কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খুব নাম হইল। মন্মথ বাবু দিন রাত্রি রোগী দেখিয়া বেড়াইতেন সময়ে নাওয়া খাওয়া হইত না, রোগীরা তাঁহার নামে এমনি আশা পাইত যে কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িত না। সাহেব মহলেও তাঁর বেশ নাম ছিল, সাহেবেরা তাঁহার ব্যারাম ভাল করিবার ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ে ডাকিত। এই সাহেবদের বাড়ীতে গিয়াই মন্মথ বাবুর সর্ব্বনাশ হইল। তোমরা বোধ হয় জান যে সাহেব বিবিরা মদ খাইয়া থাকেন। তাঁহারা মন্মথ বাবুকে আদর করিয়া মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং অন্য দশটা খাবারের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু মদও খাইতে দিতেন। আমাদের ডাক্তার বাবু প্রথম প্রথম আপত্তি করিতেন বটে, কিন্তু শেষে ভদ্রলোক-দিগের নিকট চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া রাজি হইলেন—তাঁহার কপাল পুড়িল। অল্প অল্প করিয়া তিনি ভয়ানক মাতাল হইয়া উঠিলেন! যদি তিনি আগে হইতেই প্রতিজ্ঞা করিতেন যে কখনও মদ খাইব না, তাহা হইলে এমন চাষা কেহই নাই যে তাঁহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া মদ খাইতে বলিবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর না করিয়া তাঁহার প্রাণ গেল। কলিকাতায় যে সাহেবের অধীনে তিনি সরকারী ডাক্তারের কর্ম্ম করিতেন, এক দিন নেশার ঝোঁকে তাহার সহিত ভয়ানক চটাচটি করিলেন, এই সময় তাঁহার কতকগুলি কুসঙ্গী যুটিয়া গিয়াছিল, তাহারা এই আগুণে বাতাস দিতে লাগিল। তাহাদের পরামর্শে ও নিজের গোঁয়ার বুদ্ধিতে, মন্মথ বাবু কর্ত্তা সাহেবদিগকে বলিয়া চট্টগ্রামের পাহাড়ে বদলী হইলেন। এই দূরদেশে তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না, এমন আপনার লোক কেহ ছিল না যে তাঁহাকে একটু অন্ন করে মদ খাইতে বলে। দিন রাত্রি তিনি মদ খাইতেন, অন্য আহার ছিল না। এইরূপ করিয়া কত দিন চলে? তবুও সেখানকার বড় সাহেব তাঁহাকে ভাল করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সকলকে হুকুম দিলেন—"ডাক্তার বাবুকে যে মদ দিবে, তাহার জরিমানা করিব।" কিন্তু তাঁহার হুকুমে কোন ফল হইল না। যাহাকে মদের ভূতে ধরিয়াছে, সে হতভাগার মত দুঃখী কি আর এ পৃথিবীতে কেউ আছে? মন্মথ বাবু লুকাইয়া লুকাইয়া মদ খাইতেন। এত অত্যাচার যেন পরমেশ্বর সহিতে পারিলেন না! এক দিন রক্ত বমি করিয়া মন্মথ বাবুর প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

আমরা সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের কথা বলিলাম। মদ ধরিবার পূর্ব্বে তিনি কিরূপ দেবতার মত ছিলেন, কিরূপ সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক লোক ছিলেন এবং মদ খাইতে শিখিয়াই বা কিরূপ পিশাচের মত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার কথা বেশী করিয়া লিখিতে পারিলে, পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিতেন মদে কি সর্ব্বনাশ করে। আমাদের আর অধিক লিখিবার স্থান নাই। আমাদের দেশে একটী সংস্কৃত কথা আছে, তাহার অর্থ এই—

মদ পান করিবে না, কাহাকেও দিবে না, কাহারও নিকট হইতে লইবে না।

এই কথা চিরকাল মনে রাখিও। সাহেবেরা যাহা করে, তাই যে ভাল, তাহা মনে করিও না সাহেবেরা মদ খায়, বলিয়া কি আমরাও খাইব? থাক্, বাপু! এ সভ্যতা। মদখোর সভ্য হওয়ার চেয়ে জলখোর অসভ্য হওয়াও ভাল।

আমাদিগের পুরস্কার।

আমরা আগামী বর্ষে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

১। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাঁহারা উত্তর দিবেন, তাঁহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম হওয়া আবশ্যক।

২। ১৬ বৎসরের কমবয়স্ক বালক বা বালিকা যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। রংএ বা পেন্‌সিলে, যিনি যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা চিত্র করিতে পারিবেন। আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌছা আবশ্যক।

৩। আমরা রচনা বিষয়ে তিনটী পুরস্কার দিব;—(ক) ৮ থেকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য; (খ) ১১ থেকে ১৩ বৎসরের পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য; এবং (গ) ১৪ থেকে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য। প্রত্যেক শ্রেণীর রচনার বিষয় এই:—

(ক) "একটী ছোট ছেলে মাকে বেশী ভালবাসে, না আপনার খেলানাকে বেশী ভালবাসে!" এই বিষয়ে গদ্য রচনা।

(খ) "একটী ছোট মেয়ে মরে গেছে, তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন," এই বিষয়ে ৩০ লাইনের মধ্যে একটী পদ্য রচনা।

(গ) "কাক ডাকিতেছে, জলের মধ্যে তাল-গাছ, ঘোড়া ছুটিয়া গেল, ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিল, বাঘের ভয়, শিয়ালের বাচ্ছা, কি সর্ব্বনাশ! জামা যোড়া, বড়লোক, সাহসী পুরুষ, হৈহৈ শব্দ, শিকারী।" এই কথাগুলি বজায় রাখিয়া এবং ভাব ঠিক রাখিয়া একটী অর্থসংলগ্ন গদ্য রচনা। যত ইচ্ছা নূতন কথা বসাইতে পারিবে, কিন্তু রচনাটী ২০ লাইনের চেয়ে লম্বা হইবে না।

এই রচনাগুলি আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌছা আবশ্যক। প্রত্যেক রচনাতে স্কুলের শিক্ষক বা কোন কর্ত্তা ব্যক্তির স্বাক্ষর চাই, তিনি লিখিয়া দিবেন যে বালক বা বালিকা নিজে এই রচনাটী করিয়াছে।

ধাঁধা।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর!

১। ২৬, ৩০, ১৪, ৫৬। ২। যুতোর ব্যবসায়।
৩। একটীও রহিল না, সবগুলি ভয়ে উড়িয়া গেল।
৪। ১০ মোহর।

নূতন।

১। কোন্ জিনিষ এত হাল্‌কি যে কথা কহিলেই ভাঙ্গিয়া যায়?

২। সে কোন্ পুস্তক যাহা চিরকালই নূতন?

৩। হিন্দুর ছেলে ব্যারাম হয়ে পড়েছে; ডাক্তার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "গরুটী খাবে?" ইহা লইয়া ভয়ানক গোল বাধিয়া গেল। রোগী বলিল "আমাকে গরু খাইতে বলিয়াছে।" পাশের একজন লোক বলিল, "না না! তোমাকে গরু বলিয়াছে এবং 'টী' অর্থাৎ চা খাবে, কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছে।" ডাক্তার বলিলেন "আমি যা বলিয়াছি, তাতে দুই বুঝা যায়, কিন্তু আমি দুয়ের একটীও বলি নাই; তোমাদের শোনবার বা বোঝবার ভুল।" বলতো কেমন করে ভুল হ'ল!

৪। সে কোন্ খাবার যা খেলে পেটও ভরে না, পয়সাও যায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে লোকেও নিন্দা করে ?

৫। ভাল করে রাখ মোরে, আমি সবই হই,
আঁচড় দিলে মোর পিঠে আমি কেহ নই।

৬। দুইটী অক্ষর মোর—প্রথম থাকে সঙ্গে,
দ্বিতীয় বলিলে শিশু ধেয়ে যায় রঙ্গে ;
সবে ভাল বাসে মোরে, বল দেখি সখা,
কে আমি ?—না জান যদি তুমি বড় বোকা।

বিজ্ঞাপন।

আমরা পাঠকপাঠিকাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে সখার মূল্য অগ্রিম দেয়! দুঃখের বিষয় অনেকে এখনও মূল্য প্রদান করেন নাই। আমরা আশা করি যাঁহারা এখনও মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অবিলম্বে দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

'সখা' প্রত্যেক ইংরাজী মাসের ৭ দিবসের মধ্যেই বাহির হয়। কিন্তু মুদ্রা-যন্ত্রের গোলমালে এই দুই মাস তাহা না হইয়া ৭ দিন পিছাইয়া পড়িতেছে। এ জন্য আমরা বড় লজ্জিত আছি। আমরা আশা করি আগামী মাস হইতে 'সখা' যথা সময়ে সকলকে দেখা দিতে পারিবে। বাঙ্গালার অনেক মাসিক পত্র যেমন যে মাসের কাগজ, তাহার ৪.৫ পরে বাহির হয়, অনেকে মনে করেন, ইহারও সেই দশা হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে বলিতে পারি যে সেরূপ অবস্থা হইলে, 'সখা' আর কাহাকেও আপনার মুখ দেখাইবে না। মূল কথা, পত্রিকাখানির যদি সুবন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে আমরা উহাকে রাখিতে চাই না। আগামী মাস হইতে এইরূপ সুবন্দোবস্ত হইবে, আমরা আশা করি।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণি অর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

৮। ঠিকানা পরিবর্ত্তন তিন মাসের কম সময়ের জন্য হইলে, তাহা করা যাইবে না; অল্প সময়ের জন্য হইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরের সহিত পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবেন।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।
সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

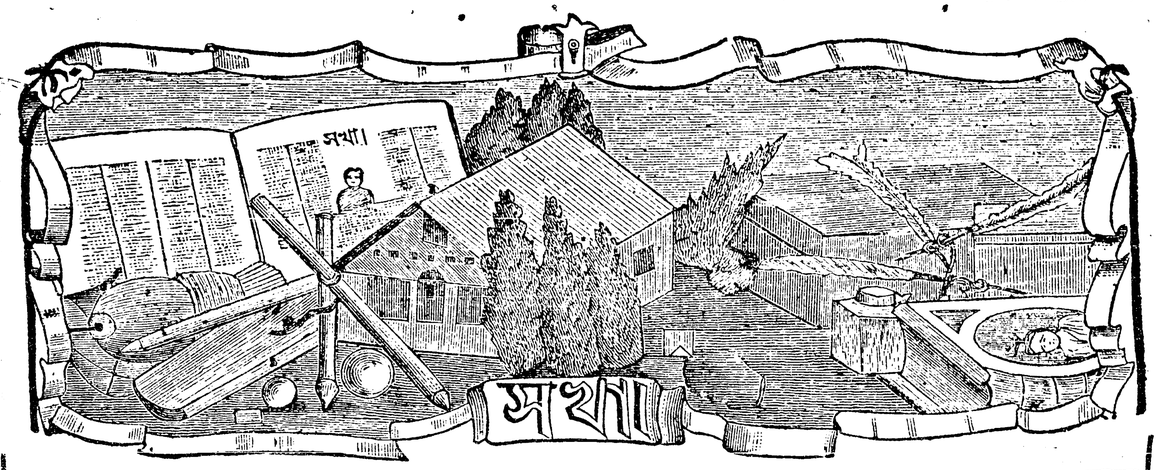

দ্বিতীয় ভাগ।] এপ্রেল, ১৮৮৪। [৪র্থ সংখ্যা।

ছি দাদা! এমন ঘুম!!

"ছি! দাদা! এমন ঘুম!! এই মা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া গেলেন, আর অমনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলে? এখনও যে নটা বাজেনি?"

অবিনাশের ভ্রুক্ষেপই নাই, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন। গিরিবালা দু তিন বার ডাকিয়া বলিতে চেতনা হইল, বড় বিরক্ত ও হইলেন, ছোট বোনটীকে খুব বকিয়া উঠিয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করা হইল। গিরিবালা আপন মনে বৈ দেখিয়া অর্থ লিখিতেছিল, ৯টা পর্য্যন্ত লিখিয়া বৈ টৈ গুছাইয়া রাখিল, এবং মার নিকটে গিয়া মার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া ধীর ভাবে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া আবার প্রার্থনা করিয়া গিরিবালা পড়িতে বসিল, কিন্তু বেলা ৮টার সময়ে অবিনাশ চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া ঘরে কেদারায় ধূপ করিয়া বসিল, এবং খানিক পরে আবার কেদারার উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল। গিরি বারবার ডাকিল, কিন্তু অবিনাশ তাহা শুনিল না; তখন গিরি অগত্যা মাকে ডাকিয়া আনিব বলিয়া ভয় দেখাইল; তখন মার বকুনির ভয়ে অবিনাশ মুখ ধুইতে গেল, কিন্তু তখন প্রায় বেলা ৯টা, সুতরাং স্কুলে যাইবার সময় হইল, সকলে স্নানের জন্য ব্যস্ত হইল, অবিনাশের আজ আর পড়া তৈয়ার হইল না।

এইরূপ রোজই হয়, কাজেই এক দিন ও তাহার পড়া তৈয়ার হয় না। মাষ্টার মহাশয় এত বলেন, বকেন কিছুতেই কিছু হয় না। বালকটীর মুখ দেখিলেই তাহাকে খুব বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঘুম ও অলসতার জন্য তাহার পড়া শুনা কিছুই হয় না। সব ছেলেরা তাহার ঘুমের জন্য তাহাকে তামাসা করে। সে স্কুলে গিয়া ক্লাশে বসিয়াও ঘুমায়!! তাই তাহারা সকলে তাহার নাম রাখিয়াছে "কুম্ভকর্ণ।" এ বৎসর গিরি কত পুরস্কার পাইয়াছে, কত রকম রকম খেলানা, একটা পোষাক, একটা ঘড়ী, আরও কত জিনিশ! কিন্তু দাদা তার কোন কাজেই নয়। পারিতোষিক বিতরণের দিন সকলে উঠিয়া গিয়া পুরস্কার লইয়া হাসি মুখে আসিয়া নিজ নিজ স্থানে বসিতেছে, অবিনাশের মনটা বড়ই খারাপ হইল, সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মনে যে কি ক্লেশ হইতেছে তা বরং তোমরা বুঝিয়া লও, আমি লিখিতে পারি না। হঠাৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেব, যিনি পারিতোষিক

বিতরণ করিতেছিলেন, তাহাকে ডাকিলেন। আস্তে আস্তে ম্লান মুখে অবিনাশ তাঁহার নিকটে গেল। সাহেব তাহার সুন্দর মুখ দেখিয়া বড় খুসী হইয়াছিলেন,—তাই আশ্চর্য্যও হইয়াছিলেন যে এমন বুদ্ধিমান বালক কেন ভাল পড়ে না? ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি পারিতোষিক পাইলে না কেন?" একেত তাহার মনে ঐ ঘোর দুঃখ ছিল, তার পরে সকলের মধ্যে ডাকিয়া যেই সাহেব ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অমনি অবিনাশ "ভ্যাক্" করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুই বলিতে পারিল না! সাহেব কাছে আনিয়া রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া ভাল বাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বড় দুঃখের সহিত বলিল "ঘুমের জন্য।" তিনি তখন দুঃখিত হইয়া তাহাকে একখানি বৈ দিবেন বলিলেন, তাহা মন দিয়া পড়িতে বলিলেন।

সে দিনের দুঃখ লজ্জা, অপমান, অবিনাশ আর ভুলিল না। সেদিন হইতে সে ঘুম ছাড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনও মতে এই বহুদিনের কুঅভ্যাস ছাড়িতে পারিল না। কিছু দিন এইরূপে যায়, পরে গিরি ও তাহার দুঃখে কাতর হইয়া বলিল "দাদা তুমি অত কষ্ট কর কেন মিছামিছি? পরমেশ্বরের নিকট রোজ প্রার্থনা করিলেই তোমার ঘুম সারিয়া যাইবে।" সে তখন অবধি তাহাই করিতে লাগিল। এমন সময়ে সাহেবের সেই বৈ খানি আসিয়া উপস্থিত হইল। অবিনাশ তাহা আগাগোড়া পড়িল। তখন তাহার মন স্থির হইল, যেন কি অমূল্য ধন লাভ করিল; ক্রমে চেষ্টা করিয়া ও ঐ বৈএর কথামত কাজ করিয়া সে এখন ঘুমকে পরাজয় করিয়াছে। অবিনাশ একদিন পারিতোষিক পায় নাই বলিয়া কত কাঁদিয়াছিল, সে আজ খুব ভাল করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, ক্লাশে সর্ব্বদাই প্রথম থাকে এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ প্রতি বৎসর ঐ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়।

আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যেও হয়ত অনেকে আছেন যাঁহারা অবিনাশের মত বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উপকারের জন্য সেই বইখানি হইতে গোটাকতক কথা তুলিয়া দিব, তাঁহারা মন দিয়া পড়িয়া প্রার্থনা ও যত্নের সহিত চেষ্টা করিলেই শীঘ্র ঘুমকে বশে আনিতে পারিবেন।

(১) পড়িতে বসিবার সময়ে, যে যে বইগুলি পড়িতে হইবে সে গুলিকে সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে কাজটাকে একবার বেশ করিয়া বুঝিয়া লইবে, এবং "সমস্ত করিবই" বলিয়া মনে করিবে।

(২) যে সকল বই বেশ সহজ ও পড়িতে ভাল লাগে সেই গুলিই রাত্রে পড়িবে। অঙ্ক কসাও মন্দ নহে। যাহাতে সহজে ঘুম পায় না এমন বই পড়িবে। একখানা পড়িতে পড়িতে ঘুম পাইলে আর এক খানা লইবে ও গা ঝাড়া দিয়া বসিবে।

(৩) মুখে জোয়ান বা লবঙ্গ থাকিলে ভাল হয়। ঠিক সোজা হইয়া বসিবে ও হস্তে বই লইয়া উঁচু করিয়া ধরিবে। পেন্সিল বা আর কিছু লইয়া টেবিলে "ঠক ঠক" শব্দ করিলে ও অনেক সময় ঘুম যায়। ঘুম পাইলে পা দুটী নাড়া দিলেও ভাল হয়। কিন্তু সাবধান! যেন ঘুম তাড়াইতে গিয়া এই অভ্যাস না হইয়া যায়, তা হলে বড় দোষ।

(৪) আহার করিবার পূর্ব্বেই পড়া শেষ করা উচিত। পড়া হইয়া গেলে আহার করিয়া একটু বাহিরে ছাতে টাতে বেড়াইয়া ধীর মনে প্রার্থনা করিয়া বা সৎবিষয়ের কথা কহিয়া, কিম্বা সমস্ত দিন কিরূপে কাটাইয়াছি ও কিরূপে কাটান উচিত, এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া পরে শয়ন করা উচিত। খাওয়ার পরেই প্রায় ঘুম পায়,—এ জন্য যদি খাওয়ার পরে পড়িতে হয় তবে যেন এই প্রথম ঘুমের তেজটাতে পরাস্ত না হও, দেখিবে। কোন রকমে এই প্রথম ধাক্কাটী সামলাইতে পারিলে আর ভয় থাকে না। ইহাকে "ভাতঘুম" বলে; ইহার হাত এড়াইতে পারিলে আর প্রায় ঘুম পায় না।

(৫) ইহাতেও ঘুম না গেলে, একটু বাহিরে বেড়াইয়া পরে টেবিলের উপর উচ্চ আলো রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়া উচিত। দাঁড়াইলে ঘুম পায় না। পরে ঘুম গেলে বসিবে। কিন্তু এটী ইচ্ছা পূর্ব্বক করিবে, কেহ করিতে বলিলে অভিমান ও দুঃখ হইবে, সুতরাং সে বিষয়ে সাবধান।

(৬) প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিয়মিত ব্যায়াম, করিবে; তাহা হইলে শরীর বেশ কর্ম্মঠ, অনলস, ও সবল থাকিবে এবং ক্ষীণ ও অলসের প্রধান দোষ যে নিদ্রা, তাহা ঘুচিয়া যাইবে। অনেকের ভ্রম আছে যে পরিশ্রম করিলে বড় ঘুম পায়, সেটী ঠিক নহে, তবে এই হয় যে, যে টুকু ঘুম হয় তা অতি প্রগাঢ়। সেত ভালই, সুস্থতার চিহ্ন।

(৭) ঘুম পেলে যদি ঘুমকে আস্কারা দেও তবে আরও ঘুম পাবে, সুতরাং আজি যদি ৭ টার সময় ঘুম পায় তবে ৭॥০ টার সময় শুইবে, কালি আবার ৮ টার সময় শুইবে, তার পর এইরূপ ক্রমে ঘুমকে পিছাইয়া দিলে তোমার কার্য্য সিদ্ধ হবে।

(৮) অনেকে রাত্রের ঘুম বন্ধ করিবার জন্য স্কুল হইতে আসিয়া একবার ঘুমাইয়া লয়, সেটী বড় অনিষ্টকর। কেহ কদাচ সেরূপ করিও না, তাহাতে আলস্য বৃদ্ধি হয় এবং যে সময়টী খেলায় কাটান উচিত, তাহা নিদ্রাতে যাওয়ায় শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। খুব সাবধান! কখনও এরূপ মন্দ কাজ করিও না।

(৯) দিনের বেলায় বসিয়া যদি ঘুম পায়, তবে বসিবে না, কখন না, কদাচ না। যে দিনে ঘুমায় তাহার শরীর একেবারে যায়, ছাই হইয়া যায়। অতএব সাবধান! চলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পড়িবে। বাগানে গাছ তলায় বসিয়া, কি নদীর ধারে বসিয়া, কি নূতন ইটের পাঁজা বা পাহাড়ের উপর বসিয়া পড়া উচিত—যেখানে স্বভাবের শোভাতে মনকে আকৃষ্ট রাখিবে, পড়িতে বেশ ইচ্ছা হবে, নির্জ্জনে সুবিধাও হবে। আর ওরূপ স্থানে একা বসিয়া একটু ভয়ও হবে তাহাতে ঘুম অসম্ভব। অতএব এ সম্বন্ধে যাহার যেরূপ সুবিধা হইবে সেইরূপই করিবে।

(১০) রাত্রি ৯ টার অধিক বালক বালিকাদিগকে যেন জাগাইয়া না রাখা হয়। ইহার অধিক হইলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। আর ওদিকে ৫ টার সময়ে ভোরে উঠা অভ্যাস করা বড় ভাল। প্রথমে উঠিয়াই হাত মুখ পরিষ্কার করিয়া একটু প্রার্থনাদি করিবে, পরে একটু বাহিরে বেড়াইয়া পড়িতে বসিবে। সর্ব্বশুদ্ধ ৮ ঘণ্টা নিদ্রা চাই।

"লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।"

আমাদের দেশে শিয়ালের বড়ই উৎপাত। শিয়ালের জ্বালায় ঘরের ভিতরে পর্য্যন্ত কোন বস্তু নির্ব্বিঘ্নে রাখা যায় না। বুদ্ধিমান শিয়ালগণ এমনি কৌশলে দরজা খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া দ্রব্যাদি খায় এবং নষ্ট করে যে তাহা টের পাওয়া যায় না। একদিন রাত্রে আমাদের বড় ঘরের বারান্দায় ভুল ক্রমে একটা গুড়ের হাঁড়ি পড়িয়াছিল। হাঁড়ির মধ্যে গুড় অতি অল্পই ছিল। শিয়াল রাত্রিতে আহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। বারান্দায় উঠিয়া হাঁড়িতে গুড় আছে বুঝিতে পারিল। অনেকেরই খাদ্য দ্রব্য দেখিলে লোভ সম্বরণ করা দায়। শিয়াল প্রথমেই হাঁড়িটার মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। হাঁড়ির মুখ খুব ছোট ছিল, সুতরাং মাথা ঢুকাইতে না পারিয়া হাঁড়িটা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাও পারিল না, তখন খুব জোরের সহিত হাঁড়ির মুখে মুখ দিয়া ঠেলিতে লাগিল। ইহাতে হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়া গেল, আর শিয়াল স্বচ্ছন্দে

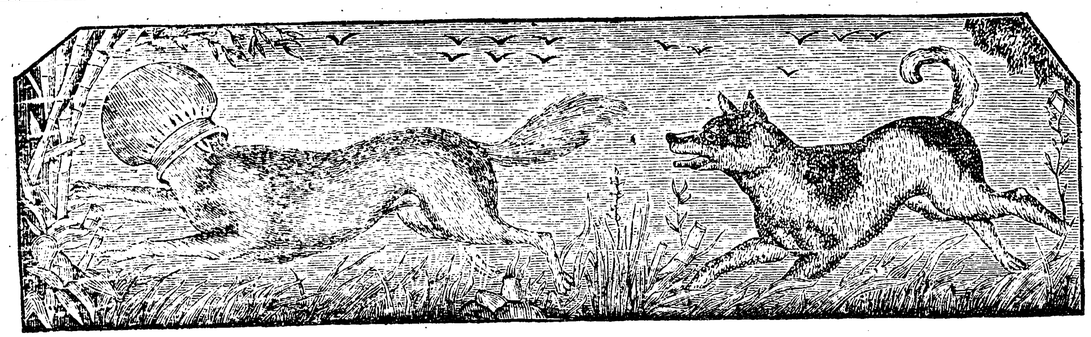

পেট ভরিয় গুড় খাইতে লাগিল। এমন সময় আমাদের বাড়ীর কুকুরটা টের পাইয়া শিয়ালকে তাড়া করিল। শিয়াল পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইল বটে কিন্তু মাথা আর হাঁড়ির মধ্য হইতে বাহির হয় না। পলাইতে একটু বিলম্ব হইলেই কুকুর আসিয়া তেড়ে ধরিবে, কাজেই প্রাণ ভয়ে তাড়াতাড়ি হাঁড়ি লইয়াই দৌড়িতে আরম্ভ করিল। হাঁড়িও ভাঙ্গে না, মাথাও খুলে না, এদিকে কুকুরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া আসিতেছে। ভয়ানক বিপদে পড়িয়া শিয়াল কোন্ স্থান দিয়া কোন্ দিকে যাইবে তাহা ঠিক পাইতেছে না। আবার হাঁড়ির মধ্যে মাথা থাকাতে চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না। যাহা হউক, সেই হাঁড়ি-মুখো শিয়াল এই অবস্থাতেই রাস্তার উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল। রাস্তার পাশেই ছোট একটা পুকুর ছিল। হঠাৎ হাঁড়ি লইয়া শিয়াল সেই পুকুরের মধ্যে পড়িয়া গেল। সাঁতরাইয়া পারে উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুকুরটী পানায় পোরা ছিল সুতরাং পথ এগোবার পক্ষে হাঁড়ি পানায় বাধিয়া অত্যন্ত বাধা জন্মাইতে লাগিল। শিয়াল এইরূপ বিপদাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া আর কি করে? অগত্যা হাঁড়ির মধ্যে মাথা রাখিয়া সমস্ত শরীর জলে ডুবাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অনেক ক্ষণ চেষ্টা করিল। যতক্ষণ বায়ু ছিল বহু কষ্টে ভয়ানক যাতনায় ছটফট করিয়াও বাঁচিয়া ছিল। পরে বায়ু অভাবে জলের মধ্যেই মরিয়া গেল। সকাল বেলা আমরা পুকুর হইতে তুলিয়া মাঠে ফেলিয়া দিলাম। এই জন্যই লিখিয়াছি "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।"

প্রার্থনা ও সাবধানতা।

বাল্যকালে রাজকুমার ও কেশবের বড় ভাব ছিল। খুব ছেলেবেলা দুজনেই সমান দুরন্ত ছিল, পরামর্শ করিয়া দুষ্টুমি করিত, পথ দিয়া লোক গেলে গায়ে ধুলো দিত, গালাগালি দিত, একত্রে মাঠে ফড়িং ধরিতে যাইত ও পাখীর বাসা সন্ধান পাইলেই ভাঙ্গিয়া ছানা আনিয়া মারিয়া ফেলিত। স্কুলে গিয়া দুজনে যুক্তি করিয়া পলাইয়া আসিত, আসিয়া পথে ঘাটে দাঙাগুলি খেলাইত, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে পরিষ্কার মিছা কথা কহিয়া দোষ কাটাইত। ভয়ানক দুরন্ত ছেলে দুটী, পাড়ার লোক জ্বালাতন হইয়াছিল। রাজকুমারের পিতা সন্তানের চরিত্র দূষিত হইতেছে দেখিয়া তাহাকে পশ্চিমে লইয়া গেলেন। সেখানে দু বৎসর থাকিয়া এখন সে কি সৎ ও শান্ত সুবোধ হইয়াছে! এখন তাহার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র; কেশবেরও এই বয়স, কিন্তু সে এমন ভয়ানক বদমায়েস হইয়াছে যে তাহার আর কথা নাই। তামাক, চুরট, সিদ্ধি প্রভৃতি নেসায় চুরচুরে, লেখাপড়ার নামও নাই। স্কুলের বেতন লইয়া চাড়াইভাতী করা হয়, এক এক দিন মদও পান করা আছে। রক্ত উঠা, জ্বর, প্লীহা রোগে ধরিয়াছে, মধ্যে এক দিন নাকি

'ফীট্' ও হইয়াছিল। তাহার পিতা মাতা হতাশ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সে অঞ্চলে সে বিখ্যাত ছোকরা।

রাজকুমার বাড়ী আসিলে তাহার শান্ত সুশীল ভাব, বিনয় ও সুমিষ্ট ব্যবহার, বিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছা ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিয়া গ্রামশুদ্ধ লোক অবাক হইয়া তাহার পিতার বড় প্রশংসা করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এই কথা—"এমন বদ ছেলে কেমন করে এত ভাল হইল?" সব লোক তাহার তুলনা দিয়া কেশবকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করিতে লাগিল। রাজকুমারের পূর্ব্ব চরিত্র ও এখনকার স্বভাব স্মরণ করিয়া কেশব বড় লজ্জিত হইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাঠাইলেও সে তাহার সহিত দেখা করিতে গেল না। দিন রাত্রি কেবল ঐ কথাই ভাবে, ভাবিয়া এক রকম কেমন হইতে লাগিল? মধ্যে এক একবার ইচ্ছা হইত একেবারে হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া সৎ হইয়া যাইবে, কিন্তু অভ্যাস ও চক্ষু লজ্জাতে ভাল হইতে দিত না। মা কাছে আসিলেই কেমন যে গালাগালি দেওয়া অভ্যাস.—পূর্ব্বে থেকে ঠিক করিয়া রাখিলেও সেই "পোড়ার মুখী" বৈ অন্য কথা বাহির হইত না। মহা বিপদ! মনে আর কাজে এই ঘোর বিবাদের জন্য বেচারা ক্রমে খুব রোগা হইতে লাগিল। এমন সময়ে এক দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিল যে রাজকুমার তাহাকে যেন মেঘের ভিতর হইতে কি সৎপরামর্শ দিতেছে, সে যেন শুনিতে চাহিতেছে না। হঠাৎ অমনি রাজকুমার রাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর মেঘের ভিতর থেকে "কড় কড় কড় কড়" করিয়া ভয়ানক একটা বাজ তাহার মাথায় পড়িল। ভয়ে সে ঘুমন্ত অবস্থায় খুব চীৎকার করিয়া উঠিল, গা হাত পা কাঁপিতে লাগিল, এবং বুক দুর দুর করিতে লাগিল। মা ভীতা হইয়া বলিলেন "কি? কি?" সে মাকে সব বলিল। তখন মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তবে বুঝিয়াছি, তুমি কা'ল রাজুর কাছে গিয়া তাহার কথা শুনিও, তাই ঈশ্বর তোমাকে বলিলেন।" ভয়ে, চিন্তায়, হতাশ্বাসে কেশব অবশেষে স্বীকৃত হইল।

তার পর দিন অনেক কষ্টে মনকে বুঝাইয়া রাজুর কাছে গেল। রাজু পূর্ব্বেই সব শুনিয়াছিল; অনেক কথার পর কেশবের অসুখের কথা পাড়িল। তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল, আর বলিল 'ভাই রাজু! বলিতে লজ্জা করে এক সময়ে তুমিও আমার মত দুষ্ট ছিলে, ভাগ্যে তোমার বাবা তোমায় লইয়া গেলেন, তাই। তা ভাই আমারত দশা দেখিতেছ, কি করিলে এখন আমি বাঁচি তা বলিয়া দাও। কিরূপে পাপ দুশ্চরিত্রতা দূর করিতে পারিব তাহা ভাই তোমায় বলিতেই হইবে। আমি মরিতে বসিয়াছি। আর না! খুব শিখিয়াছি, আর না। আমার আজ লজ্জা দূর হোক, আর আমার অভিমান নাই, এখন কিসে আমি বাঁচি, কিসে আমার চরিত্র ভাল হয় তা' তোমায় করিতেই হইবে।" এই বলিয়া রাজুর হাত ধরিয়া তাহার উপর কপাল রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, চক্ষের জলে দুজনেরই হাত ভিজিয়া গেল। রাজুও খুব কাঁদিতে লাগিল।

খানিক ক্ষণ এইরূপে নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল। পরে রাজকুমার কেশবের চক্ষের জল কাপড় দিয়া মুছাইয়া দিয়া তাহাকে শান্ত করিল ও বলিল, "দেখ ভাই, আমি গিয়াছিলাম. কেবল ঈশ্বরের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি, তুমিও তাঁহাকে ডাক, তিনিই রক্ষা-কর্ত্তা।" কেশব বলিল "তাঁহাকে কিরূপে ডাকিতে হয় জানি না ত?" রাজকুমার বলিয়া দিল, বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে ঈশ্বর সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, সব দেখিতেছেন, সব যায়গায় আছেন, সকলি করিতে পারেন, তিনি মহান্ ও পরম দয়াবান। তৎপরে বলিল "দেখ ভাই! তুমি সর্ব্বদা দুটী কাজ করিবে, মন দিয়া শুন:—(১মতঃ) সদা সর্ব্বক্ষণ যেখানেই থাক, কাজই কর, আর যাই কর, সকল সময়েই সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের দিকে মন দিয়া

ভাল হইবার জন্য কাতর মনে প্রার্থনা করিবে। তাঁহার দিকে মন থাকিলে আর কুকর্ম্মে ইচ্ছাই হইবে না। (২য়তঃ) যখনই কোন মন্দ কাজ করিতে ইচ্ছা হবে, মন্দ কাজ করিবার সুযোগ হবে, বা কোন কুকর্ম্ম প্রায় কর কর, এমন হবে, অমনি ঝাঁ করে মনে ক'রবে যে এটা করা অন্যায়। তখনই ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া আপনার হাত, পা, বা জিহ্বাকে হুকুম করিবে যেন তাহারা আর সে কাজ না করে। তাহারা ত আমারই চাকরের মতন? এই আমি হাত রাখিয়াছি, মনে করিয়া হুকুম করিলেই নড়িল। বুঝিলে? মন্দ কাজ না করা ও ভাল কাজ করা, মন্দ কথা না কহা ও ভাল কথা কহা, এবং মন্দ বিষয় চিন্তা না করিয়া ভাল বিষয় চিন্তা করাকেই সৎচরিত্র কহে। না হইলে সৎচরিত্র ত আর গাছের ফল নয়? দেখিও, প্রথম প্রথম তোমার মনের বিরুদ্ধে কাজ করিতে কষ্ট হবে, খুব লজ্জা হবে, কিন্তু সে জন্য যেন পেছিও না। স্থির অটল প্রতিজ্ঞা কর, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া আরম্ভ কর দেখি, ঠিক সফল হইবেই হইবে, আমি এই রকমে ভাল হইয়াছি। একবার অভ্যাস হইয়া গেলে তখন মন্দ কাজ করা অসম্ভব হবে এবং ভাল কাজেই সুখ হবে।"

কেশব নিস্তব্ধ হইয়া শুনিল। সেই কথা দুটী ও রাত্রের বাজ পড়া মনে করিতে করিতে বাড়ী আসিল। আসিয়া অবধি কেশব ধীর ভাবে সেই কথা মত কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে আজ প্রায় এক মাসের কথা। ইহারই মধ্যে সে খুব ভাল হইয়াছে। নেশা ত্যাগ, মিথ্যা কথা ত্যাগ, গালি ত্যাগ, এগুলি হইয়া গিয়াছে। প্রার্থনা ও সাবধানতা দ্বারা সবই হইতে পারে।

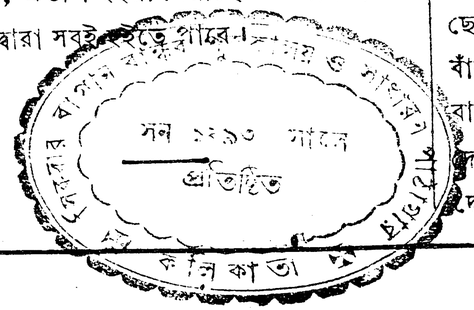

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়?

চতুর্থ অধ্যায়।

রামলোচন বাবু আমাদের ওদিককার লোক। তিনি ধু—তে থাকেন; সেখানকার একজন নামজাদা উকীল। আমি ভাবিলাম, দেশের একজন লোক, তাঁর কাছে গেলে তিনি অবশ্যই কিছু খাতির করিবেন। জাহাজ হইতে উঠিয়াই তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। একটী ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলেন। আমি আস্তে আস্তে বাড়ীর এক জন চাকরের মত লোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "রামলোচন বাবুর এই বাড়ী?" সে লোকটা আমার কথার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। মুখ বিকৃত করিয়া একটা বড় ঘরে চলিয়া গেল। অগত্যা আমি অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে যাহা বলিল তাহাতে জানিলাম, আমি যাঁহাকে রামলোচন বাবুর চাকর মনে করিয়াছিলাম তিনিই রামলোচন বাবু। তাই অত রাগ! আমি ভয়ে ভয়ে রামলোচন বাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইলাম। তিনি একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অত কালো লোক আমি আর দেখি নাই। মোটা বেশী নন, কিন্তু প্রায় বুকের উপর কাপড় পরেন। গোঁপগুলি সোজা সোজা। চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। কাণে একটা কলম। হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত কাপড় টানিয়া বসিয়াছেন। উরুদেশের উপর একটা লম্বা খাতা রাখিয়া তাহাই দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে উদ্দেশে কাহার প্রতি মুখ বাঁকাইতেছেন। তাকিয়ার একটা অংশ কলম পুঁছিবার স্থান বলিয়া বোধ হইল। কিছুকাল পরে দেখিলাম যে তাহা নহে। পাশে একটী মাটির দোয়াত। তাহা হইতে ঘাঁটিয়া এক কলম কালি লইয়া খাতায় যেন কি লিখিলেন। তার পর কলমটী মাথার চুলে ঘসিয়া কাণে বসাইয়া হাতের দুটী আঙুল তাকিয়ার ঐ স্থানটীতে পুঁছিলেন। তার পর ক্ষণেই এক হাতের কনুই তাকিয়ার উপর রাখিয়া, একখানা পা আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া 'ভোঁউ' শব্দে উদ্গার করিলেন। শেষটা আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথম প্রশ্ন হিন্দি ভাষায় হইল; তাহার পর বাঙ্গালা।

"কি চাই?"

"আজ্ঞে আমি অনেক দূর থেকে এসেছি—"

"আমিও অনেক দূর থেকে এসেছি।"

"আমার নিবাস সু—"।

"আমারও নিবাস সু—। তার পর?"

"মহাশয় যদি—"

"ম—হা—শ—য়—যদি! কি—ঞ্চিৎ—সা—হা—য্য? দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার আমার কাছে নাই। হিয়াছে চলে যাও।"

আমি আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে বিলম্ব করিলাম না। কোথা যাইব ঠিক নাই, কিন্তু রামলোচন বাবুর বাড়ীতে আর পদার্পণ করা হইবে না। রাস্তার বাহির হইয়া একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন "যে কোন মুদীকে পয়সা দিলেই থাকবার যায়গা আর খেতে দেবে।" মুদীর দোকান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন বোধ হইল না। দু দিন মুদীর দোকানে খাইলাম। কিন্তু এরূপভাবে খাইলে বেশী দিন পয়সায় কুলাইবে না এই চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। এক দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মুদীর পয়সা হিসাব করিয়া দিলাম। তার পর পুঁটলিটী হাতে করিয়া বাহির হইলাম। রাস্তায় কতদূর হাঁটিয়া দেখি একটা বড় বাড়ী। এ বাড়ীর কর্ত্তা রামলোচন বাবুর মত নাও হইতে পারেন। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দিকে গিয়া দেখিলাম কর্ত্তা বসিয়া আছেন, আর ইয়ার গোছের একটী অভ্যাগত লোক তাঁহার সহিত হাসির কথা কহিতেছেন। আমি দাঁড়াইবা মাত্রই কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কে বাবু?"

আমি।—"আমি পথিক, কষ্টে পড়েছি।"

ইয়ার।—"বড্ড খিদে পেয়েছে বুঝি?"

আমি কোন উত্তর করিলাম না; ইয়ার বাবু উত্তরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চোখ বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

"হোটেল আছে, হোটেল! বাবুরচি লোক দিব্বি রাঁধে! রোজ পাঁচ টাকাতেই চলে।"

আমি নিরাশ হইয়া বাবুর দিকে তাকাইলাম। বাবু ইয়ারের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন "নিজের বাড়ীতে একটী লোককে খেতে দিতে পার না, আবার অন্য লোকের বাড়ী এসে চাষামো কর! তুমি আর আমার বাড়ী এসো না।" বলা বাহুল্য, বাবুর উপর আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা সম্মান ইত্যাদি যত হইতে পারে সব কয়টা জন্মিয়া গেল। বাবু আমাকে বলিলেন "তোমার অন্য কোন রূপ কষ্ট না হইলে আমার বাড়ীতে তোমার থাকবার যায়গা আর খাবার বন্দোবস্ত হতে পারে।"

"আজ্ঞে আমি অমনি থাক্তে চাইনে। আপনার কিছু কাজ করে দিব, তার পরিবর্ত্তে যদি কিছু খাবার দেন তাহা হইলে ভাল হয়।"

"উত্তম! তুমি ইংরাজী লিখ্‌তে পার?"

"কিছু কিছু ইংরাজী পড়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাল লেখা পড়া জানিনা।"

"কতদূর পড়িয়াছ?"

আমি বলিলাম।

"বেশ্। তাতেই হবে।"

আমি বাবুর বাড়ী রহিলাম। কাজের মধ্যে এই—বাবুর চিঠি পত্র সব একটা করে নকল করিয়া রাখিতে হয়। এখানে থাকিয়া মাসে মাসে বাড়ীর কথা ভাবিতাম। বড় লোক হইবার জন্য কত কষ্ট পাইলাম, কিন্তু বড় লোক হইবার যে লক্ষণ

দেখিতেছিনা। কেবল বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলেই কি বড় লোক হওয়া যায়? আরো কিছু চাই, আমার তাহা নাই। এইরূপ যত ভাবিতে লাগিলাম ততই বাড়ী ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। শেষটা ঠিক করিলাম বাড়ী যাইতে হইবে। আমার হাতে যে কিছু টাকা আছে তাহাতে পথ খরচ চলিবে না। সুতরাং এবার আর ষ্টিমারে যাওয়া হইবে না। বৈ—তীর্থ এখান হইতে বড় বেশী দূরে নয়; সেখানে গেলে সঙ্গী পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর মনে করিলাম, বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ—যাইব; সেখানে সঙ্গী পাইলে তাহাদের সহিত বাড়ী যাইব।

ঐতিহাসিক গল্প।

দ্বিতীয় গল্প।

পরদিন বিকাল বেলা আবার তাঁহার ভাই বোন সকলে গল্প শুনিবার জন্য একত্রিত হইলে, যোগীন বাবু বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এদেশে আসিয়া দেখিলেন যে এক জাতীয় বড় কাল, বড় অসভ্য লোক এই সুন্দর দেশ দখল করিয়া রহিয়াছে। বহুকাল ব্যাপিয়া এই সকল অসভ্য লোকের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের যুদ্ধ হইল। বার বার যুদ্ধে হারিয়া গিয়াও এই অসভ্য জাতেরা আর্য্যদিগকে বিরক্ত করিতে ছাড়িল না। যখনই সুবিধা বুঝিত তখনই আসিয়া তাঁহাদিগের উপরে উৎপাত করিত। ইহাঁদের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিত, জিনিষ পত্র লুটপাট করিত, ও ইহাঁরা যে সকল যাগ যজ্ঞ করিতেন তাহার ব্যাঘাত জন্মাইত। এই সকল অসভ্য জাতিকে পূর্ব্ব পুরুষেরা রাক্ষস বলিয়া ডাকিতেন। বহুদিন ধরিয়া রাক্ষসদিগের সঙ্গে আর্য্যদিগের যুদ্ধ হইল. পরে রাক্ষসেরা যুদ্ধে একেবারে হারিয়া গেল, ও তখন আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পঞ্জাব দেশে আপনাদের রাজ্য স্থাপন করিলেন।'

বিমলা—"দাদা, পঞ্জাব দেশ কোথায়?"

যোগীন,—"ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণে যে দেশ তাহাকেই পঞ্জাব বলে। আর্য্যগণ নাকি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়াই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, সুতরাং সেই দেশই সকলের প্রথমে তাঁহাদের দখলে আসে।"

একটুকু পরে যোগীন বাবু আবার বলিতে লাগিলেন,—"আজ কাল তোমরা এদেশে নানা জাতির লোক দেখ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইংরাজ, ইহুদি, এই যে নানা জাতি আছে তাহার কথা বলিতেছি না। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, এই রূপ নানা জাতি দেখিতেছ। এক জাতির লোক আর এক জাতির লোকের হাতে খায় না, এক জাতির লোক অপর জাতির লোককে ঘৃণা করে, এই সকল দেখিতেছ। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন সর্ব্ব প্রথমে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ জাতিভেদ ছিল না। তখন সকলেই এক জাতি ছিল। আবার এখন যেমন বৈষ্ণব শাক্ত এইরূপ নানা ধর্ম্মের লোকও হিন্দুদের ভিতর দেখিতে পাও, তাহাও ছিল না। তখন সকলেই এক ধর্ম্ম মানিত। মুরুব্বি যিনি তিনিই পরিবারের সকলের মঙ্গলের জন্য দেবপূজা, যাগ যজ্ঞ সকল করিতেন। পূজা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ছিল না। সকলেই দেবতার পূজা করিতে পারিত। সকলেই যখন আপন আপন ঘরে দেব পূজা করিত, তখন আর আলাদা দেব মন্দিরেরও দরকার ছিল না। তখন সকলেই চাষ করিত, আপন আপন গো মহিষাদি প্রতিপালন ও রক্ষণ করিত, এবং আদিম অসভ্য জাতিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই সকলেই তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতে বাহির হইত।"

তার পর যখন ক্রমে লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল তখন সমাজের কাজও বাড়িয়া উঠিল; এবং ক্রমে এক একদল লোক এক একটা আলা'দা কাজ ভাল করিয়া শিখিতে লাগিল। এই সময়ে যত লোক বাড়িতে লাগিল, ততই নূতন জায়গার দরকার হইল, কাজে কাজেই অসভ্য জাতিদের সঙ্গে আবার ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। তখন একদল লোক যুদ্ধ কার্য্যেই একেবারে নিযুক্ত হইল। কিন্তু ইহাদের পরিবারের দেবপূজা চলে কিসে? ইহাঁরা যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া অপর কতকগুলি লোককে তাঁহাদের হইয়া তাঁহাদের পরিবারের মঙ্গলের জন্য দেব পূজা করিতে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে যারা যুদ্ধ ব্যবসায় গ্রহণ করিল তারা আর তাহা ছাড়িল না,—তাহারা ক্ষত্রিয় নাম লইয়া স্বতন্ত্র এক জাত হইল। আর যাহারা দেবপূজার ভার লইয়াছিল তাহারাও ক্রমে ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র এক জাত হইল। এইরূপে যাহারা চাষবাস করিত তাহাদেরও এক জাত হইল, ইহাদের নাম বৈশ্য হইল; এবং অপর যাহারা রহিল তাহারা সকলের নীচ জাত শূদ্র হইল। এইরূপেই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা নানা জাতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

"আজ কাল ইংরাজেরা আমাদের রাজা; তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক বিদ্যা শিখিতেছি। তাঁহারা আজ আমাদের শিক্ষক,—আমাদের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর আগে যখন এদেশে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের রাজত্ব ছিল, তখন এরূপ ছিল না। তখন ইংরাজেরা অতি অসভ্য ছিল। কাচা মাংস খাইত, কাপড় পরিত না, বিবাহ করিত না, ভাল করিয়া ঘর বাড়ী বাঁধিতে জানিত না। বনের পশুর মত বনে থাকিয়া, বনের জন্তু মারিয়া, তাহার দ্বারাই প্রাণ বাঁচাইত। আজ কাল আমরা মূর্খ তাহারা বিদ্বান, কিন্তু হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মত এত সভ্য লোক পৃথিবীতে ছিল না। ইংরাজেরা আজ আমাদিগকে যে সকল বিদ্যা শিখাইতেছে, তার অধিকাংশই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট হইতে আরব দেশের লোকেরা শিখিয়া নিয়াছিল, এবং এই আরবদিগের নিকট হইতে ইউরোপের লোকেরা ও তাহাদের নিকট হইতে ইংরাজেরা শিখিয়া লেয়।"

"আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, আজও সেই অতি পুরাতনকালের অতি সুন্দর সুন্দর অনেক পুস্তক প্রচলিত আছে। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, এই সকলই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের লিখিত অতি প্রাচীন বই। তাঁহারা অনেক বিষয়ে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভাল ইতিহাস একখানিও লিখিয়া যান নাই। তাই আমরা অতি প্রাচীন সময়ের অনেক কথা জানি না। কেবল এই মাত্র জানি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতি সুসভ্য, অতি বিদ্বান, অতি সাহসী, ও অতি ধার্ম্মিক ছিলেন।"

সন্ধ্যা হইতেছে দেখিয়া যোগীন বাবু ভাই ভগিনীদিগকে বিদায় দিয়া বলিলেন,—"আজ এই খানেই থাক্ কাল আবার বলিব।"

এলাইচ।

কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, সকলেই ছোট ছোট, সাদা, শুকনো, গুজরাটী এলাইচ গুলিকে বড় ভাল বাসেন। যত প্রকার মসলা আছে, এলাইচ সকলের শ্রেষ্ঠ। এলাইচের মত এমন সুন্দর গন্ধ আর কোনও মসলায় নাই। এলাইচ তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, এলাইচ যে এক রকমের ফল তাও অবশ্য জান। কিন্তু এলাইচের গাছ কখনও দেখিয়াছ কি?

গুজরাটে এইলাচ খুব প্রচুর পরিমাণে জন্মে তাই আমরা ছোট ছোট এলাইচগুলিকে গুজরাটী এলাইচ বলি। কিন্তু গুজরাট ভিন্ন আর আর

দেশেও এলাইচ জন্মিয়া থাকে। মান্দ্রাজ অঞ্চলের কোনও কোনও পার্ব্বতীয় প্রদেশে, নীলগিরিতে, ও কুর্গের পাহাড়েও প্রচুর পরিমাণে এলাইচ জন্মিয়া থাকে। আমরা একবার মান্দ্রাজ দেশে গিয়াছিলাম, তখন এই সকল মান্দ্রাজী এলাইচের গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। আদা, হলুদ, বা শুঁটের গাছ কখনও দেখিয়াছ কি? ছোট এইলাইচের গাছও ঠিক তাহারই মতন। তবে আদা, ও হলুদের গাছ সোজা ভাবে বাড়িয়া উঠে, আদার ক্ষেতের গাছগুলি আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া একটার গায় আর একটী লাগিয়া সারি সারি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু এলাইচ গাছের অতটুকু শক্তি নাই। গাছগুলি একটু বড় হইলেই মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়, লতার মত মাটির উপর ভর করিয়া মাঝে মাঝে শিকড় গাঁথিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু এলাইচ গাছের পাতা ও ডালপালা সবই ঠিক আদা হলুদের গাছের মত।

আদার পাতায় আদার গন্ধ পাওয়া যায়, হলুদের পাতায় হলুদের গন্ধ পাওয়া যায়, শুঁটের পাতা হাতে লইয়া রগড়াইলে তাহা হইতে ঠিক শুঁটের গন্ধ বাহির হয়। এলাইচের পাতাতেও কি এলাইচের গন্ধ পাওয়া যায়? না। এলাইচ বড় মানুষ, সে কি আর যাতে তাতে তার গন্ধ মাখিয়া দিতে পারে? এলাইচের পাতা রগড়াইলে তাহা হইতে কেমন এক প্রকার বুনো গন্ধ বাহির হয়, এ যে এলাইচের পাতা ইহা ঠিক করা অসাধ্য। এলাইচের গন্ধ কেবল তার আপনার ভিতরেই বন্ধ থাকে, পাতা বা মূলে সে গন্ধ পাওয়া যায় না।

এলাইচ এত দরের জিনিষ, এমন ভাল জিনিষ, এমন গন্ধ, এলাইচের চাষ করিতে কতই না যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়! কত ভাল উর্ব্বরা, মোলাম মাটীর দরকার! প্রতিদিন কত জল দিতে হয়! তোমরা ভাবিতেছ এলাইচের ক্ষেত করা কতই না কষ্ট-সাধ্য! কিন্তু বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে। এলাইচের ক্ষেত করিতে হয় না, এলাইচ রোপণ করিতে হয় না, তার নীচে 'সার' দিতে হয় না, জল দিতে হয় না, এমন কি এলাইচের ক্ষেতের চারি ধারে কোনও বেড়া দেওয়া পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় নহে। গুজরাট অঞ্চলে এলাইচের ফসল কি করিয়া হয় আমরা জানি না, কিন্তু নীলগিরি ও কুর্গ প্রদেশে এলাইচের রীতি মত চাষ বা ক্ষেত কিছুই করিতে হয় না। জঙ্গলে এলাইচের গাছ আপনি হয়, এবং এলাইচ ব্যবসায়ীগণ জঙ্গল হইতে কাঁচা এলাইচ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া শুকাইয়া বিক্রী করে।

কুর্গ প্রভৃতি মান্দ্রাজের যে সকল স্থানে এলাইচ জন্মায়, সেখানকার কৃষকেরা কোন্ সময়ে এলাইচের ফুল হয় তাহা জানে, ফুল বাহির হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে তাহারা একবার যে যে জঙ্গলে এলাইচের গাছ আছে সেখানে যায়। আগেই বলিয়াছি এলাইচের গাছ মাটীর উপর ভর করিয়া 'লতাইয়া' বেড়ায়, ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিলেও যদি গাছগুলি মাটীতেই পড়িয়া থাকে, তবে ফুলগুলি ভিজা মাটীর গায় লাগিয়া পচিয়া যাইবে। এই জন্য এলাইচ ব্যবসায়ীগণ ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে এলাইচের জঙ্গলে গিয়া লতা গুলিকে বড় বড় পাথরের উপর রাখিয়া আসে। ইহার পর প্রায় দুই মাস কাল আর কিছুই করিতে হয় না। তার পর ক্রমে যখন ফুল হইতে ফল বাহির হইয়া ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করে, তখন আর একবার ইহারা জঙ্গলে গিয়া যত এলাইচ পায়, সব কুড়াইয়া লইয়া আইসে। তার পর যত্ন করিয়া শুকাইয়া বিক্রী করে। আমাদের এ দেশের জমি এলাইচের ফসলের উপযুক্ত নহে।

কওনা কথা, কাকাতুয়া!

কওনা কথা কাকাতুয়া! চাওনা একটীবার!
অমন তর ঘাড়টি গুঁজে, চুপটি করে চক্ষু বুজে,
আজ কেন রয়েছ যাদু! মুখটি করে ভার!
আস্‌লে আমি তোমার কাছে, রঙ্গ কর নেচে নেচে
কত খেলা খেল তুমি,—আজ কেন বিরসে
মনটি-মরা হয়ে আছ একটী পাশে বসে!
বল বল কি হয়েছে, কে তোমারে কি বলেছে,
তাইতে এমন অভিমানে হচ্চো জ্বলে খুন্?
তোল পাখী ঘাড়টি তোল, বারেক দুটী চক্ষু খোল
বুকটি কেমন করে তোমার মুখটি দেখে চুণ!
মায়ের কাছে পড়া নিতে, তোমায় যাদু খাবার দিতে
একটু খানি তিলের তরে হয়ে গেছে বেলা,
তাইতে কিরে এমন করে, বসে আছ রাগের ভরে,
মুখটি বুজে চুপটি করে ভুলে সাধের খেলা?
ছি ছি ছি ছি লজ্জা বড়, দুষ্ট ছেলে এমন তর
একটু খানি ছুতোয়-নাতায় মুখটি করে ভার!
সেই কারণে সবাই মিলে নিন্দা করে তার!
এই দেখ ধন! বাটি ভরে, খাবার নিয়ে তোমার তরে
মুখটি পানে চেয়ে আছি দাঁড়িয়ে কত বেলা;
ছোট খাট ঠোঁটটি দিয়ে, খাওনা যাদু নিয়ে নিয়ে,
আর কেন দুখ দাওরে মনে, কথায় করে হেলা?
তোল যাদু মুখটি তোল, বারেক দুটী চক্ষু খোল,
রাগ করোনা রাগ করোনা একটী কথা কও
যাদু একটী কথা কও!
ছোট খাট ঠোঁটটি দিয়ে খাবার তুলে লও!

দাদা বাবুর খোস গল্প।

আজ আবার কুমুদিনী, স্বর্ণ, দেবেন্দ্র, প্রভৃতি সকলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়াছে। ছেলে মেয়েদের যে কি গল্প শোনা রোগ, এত বুড়ো হইয়াছি, কৈ এপর্য্যন্ত একটী ছেলেকেও বিশেযতঃ একটী মেয়েকেও, গল্প বলিয়া ঠাণ্ডা করিতে পারিলাম না। যত শোনে, তত চায়, "আর না" একথা বলিতে চায় না। ভাইদের চাইতে বোনেরা এবিষয়ে আরও পাকা। বরং ভাইদের দুটোর যায়গায় তিনটা গল্প বলিলেই তারা খুসী হইয়া চুপ করে, কিন্তু আমি এপর্য্যন্ত বোনেদের এক জনকেও খুসী করিতে পারিলাম না। যেমন আগুণে ঘি ঢালিয়া দিলে আগুণ আরো জ্বলিয়া উঠে, 'দুষ্টু' মেয়েগুলো সেই রকম একটা গল্প শুনিলে আর একটা শুনিতে চায়, আরও চায়, আরও চায়; বলিতে বলিতে আমার মুখে গাঁজা উঠে, তবুও আমার পাগ্লী বোনগুলি আমায় ছাড়ে না। "অ্যাঁ অ্যাঁ—আ—র একটা বল—বল! ও—দাদা বাবু!" এই রব ধরিয়াই আছে। আমায় এত ত্যক্ত করে, মা বিরক্ত হন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে মিষ্ট কথা ছাড়া অন্য কথা বলি না। যারা ভালবাসে, আমি-যাদের ভালবাসি, তারা কষ্ট দিলেও মনে সুখ হয়। আমারই বোন, আমায় ত্যক্ত করিবে না ত কি রাস্তার লোককে ত্যক্ত করিবে? আমার কাছে গল্প শুনিতে আসিবে না ত কি পাড়ার লোকের কাছে গল্প শুনিতে যাবে? কি আশ্চর্য্য! এতে ত্যক্ত বিরক্ত হইলে চলিবে কেন?

আমার ভাই বোনেরা আসিল। কেহ কোলে, কেহ পাশে, কেহ সুমুখে, কেহ পেছনে দাঁড়াইয়া গেল। গল্প শোনার "সর্দ্দার" স্বর্ণ এবং কুমুদিনী; সকলের আগে স্বর্ণ কথা তুলিল;—

"দাদা বাবু! তোমার বাঘার কি আর একটা গল্প বলিবে বলেছিলে। বল! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলিতে হবে। হ্যাঁ, কক্ষনই ছাড়ব না।"

দেবেন্দ্র বলিল, "ও সব গল্পে কি হবে? যে দিন রেলের গাড়ীতে সেই একজন বাঙ্গালী কোন্ সাহেবকে মেরেছিলেন, সেই গল্পটা ভাল করে বল।"

কুমু বলিল, "নানা বাপু! মারামারির কথায় কাজ নাই, কুকুরের গল্পই ভাল।"

আমি গোলে পড়িলাম, কার কথা রাখি? আচ্ছা, দেখি কার কি মত? বলিলাম "কুকুরের গল্পে কার কার মত?" স্বর্ণ, কুমুদিনী, এবং চারু এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল "আমার।" দেবেন্দ্র ও যতীন একদিকে, আর তিন জন অন্য দিকে, তাই কুকুরের গল্প বলাই ঠিক হইল। আমি বলিতে লাগিলাম:—

অনেক দিন আগে আমাদের বাড়ীতে একবার গরু রাখিবার লোক ছিল না। ইহার পূর্ব্বে কিছুকাল বাঘা রাখালের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাতেই তাহার গরু রাখা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। আমাদের গরুর রাখাল চলিয়া গেলে আমিই দিন কতক মাঠে গরু বাঁধিয়া দিয়া আসিতাম। অবশেষে একদিন কর্ত্তা বলিলেন, "এখন বাঘাই গরু রাখিতে পারিবে।" তাহাই হইল। গরু ছাড়িয়া বাঘাকে সঙ্কেত করিলেই বাঘা গরুর সঙ্গে সঙ্গে যাইত, এবং সমস্ত দিন মাঠে থাকিয়া সন্ধ্যাবেলা গরুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিত। বাঘা কেমন করিয়া গরুটীকে লইয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য একদিন বড়ই ইচ্ছা হইল। আমি চুপি চুপি গরু এবং বাঘার পেছনে পেছনে চলিলাম। দেখিলাম গরুটা যাই পথ ছাড়িয়া কাহারও ধানের ক্ষেতে বা বাগানে ঢুকিয়া যাইতে চেষ্টা করে, অমনি বাঘা তাহার মুখের কাছে গিয়া "খেউ" "খেউ" করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দেয়। মাঠে

গিয়া গরু চরিতে আরম্ভ করিলে, বাঘা গাছের ছায়ায় শুইয়া থাকে।

এইরূপে অনেক দিন যায়. একদিন আর গরু ঘরে আসে না, বাঘারও খোঁজ পাওয়া যায় না। আমাদের বড় ভয় হইল। তাইতো কি হবে, কোথায় খোঁজ পাওয়া যাবে, কে সন্ধান বলে দেবে, এই রকম সাত পাঁচ ভাবিতেছি. এমন সময় বাঘা সেইখানে আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু গরু কোথায়? এদিকে বাঘার রকম সকম দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল;—সে একবার খেউ খেউ করিয়া কাছে আসে, আবার ছুটিয়া যায়, একবার আসিয়া পা আঁচড়ায়, আবার দৌড়িয়া যায়। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কোথাও যাইতে বলিতেছে। আমি উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। বাঘা আগে আগে ছুটিতে লাগিল। অবশেষে আমরা এক বাড়ীতে আসিলাম. এবং দেখিলাম আমাদের গরুটা সেইখানে বাঁধা রহিয়াছে। আমার গলার স্বর এবং বাঘার খেউ খেউ শব্দ শুনিয়া সেই বাড়ীর কর্ত্তা বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, "আমাদের ফুলের গাছ নষ্ট করিয়াছে বলিয়া বাঁধিয়াছি।" আমি শুনিয়া বড় লজ্জিত হইলাম। তিনি আমাকে লজ্জিত দেখিয়া বলিলেন "যাক্! আপনাদের গরু লইয়া যান। কিন্তু আপনাদের কুকুরটী আচ্ছা পাহারাওয়ালা। আমরা গরু বাঁধিলে খেউ খেউ করিয়া আমাদিগকে অনেক ত্যক্ত করিয়াছে, এক দিক দিয়া তাড়া দিলে আর এক দিক দিয়া খেউ, খেউ করিয়া আসিয়াছে; যেন গরুটা ছাড়িয়া দিতে বলিতেছে। শেষে, যখন কোন মতেই ছাড়িলাম না, তখন চলিয়া গিয়াছে।" আমি বুঝিলাম বাঘা একটু অমনোযোগী হওয়াতেই গরুটীর এই বিপদ; কিন্তু গরুটীকে ছাড়াইয়া আনিবার জন্য বাঘা বিস্তর ঝগড়া করিয়াছিল। অবশেষে যখন দেখিল, তাহার চেষ্টায় কিছুই হয় না, তখন আমাদিগকে ডাকিতে গিয়াছিল।

আমি বাঘার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে, সেই বাড়ীর কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিয়া, গরু লইয়া ঘরে আসিলাম।

স্বর্ণ এবং কুমুদিনী এতক্ষণ 'হুঁ' করিয়া গল্প শুনিতেছিল, হঠাৎ গল্প শেষ হওয়াতে যেন কিছু বিরক্ত হইল। কুমুদিনী বলিল, "মোটে এই—আরও বল।" এমন সময় মা খাবার খাইতে ডাকিলেন। আমি বলিলাম "আজ তবে এই পর্য্যন্ত থাক্,—আর এক দিন বলিব।"

"যতনে রতন মেলে।"

বাণীকণ্ঠ বাবু একজন প্রাচীন লোক। অনেককাল ধরিয়া স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। তিনি যেখানে চাকুরী করেন, সেখানকার ছেলেদের সঙ্গে তাঁর বড় ভাব। প্রথমে তিনি স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন, ক্রমে তিনিই এখন সে স্কুলের কর্ত্তা। কেবল যে ছেলেদের সঙ্গেই তাঁর ভাব, তাহা নহে; ছেলের বাড়ীর লোকেরাও তাঁকে বেশ আদর করিয়া থাকেন। বাড়ীর ছোট বড় কোন মেয়েই তাঁকে দেখিয়া ঘোমটা দেন না; আর লজ্জাই বা কি? একে বুড়ো মানুষ, তাতে দেবতার মত চরিত্র। বাণীবাবু হোমিওপ্যাথী ডাক্তারি জানিতেন, স্কুল দেখিয়া সময় পাইলেই বাড়ীতে যে সকল রোগী আসিত, তাহাদিগকে দেখিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে রোগীর বাটীতে গিয়া, রাত্রি জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন।

একদিন বাণীবাবু গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। একজন বিধবা স্ত্রীলোক তাঁর একটিমাত্র ছেলেকে লইয়া সেই বাড়ীতে থাকিতেন। ছেলেটীর বয়স ৯ বৎসর মাত্র, কিন্তু গরিব বলিয়া ছেলেটী কোন স্কুলে পড়িতে পাইত না। বালকটীর নাম পশুপতি নাথ। পশুপতির পিতা মরিবার সময় কিছু টাকা রাখিয়া যান, তাহারই

সুদে এবং দুধ যোগান দিয়া ও তরকারি বেচিয়া বিধবা একটী ছেলেকে লইয়া কোন মতে দিন চালান। পশুপতির মা মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "ছেলে একটু বড় হইলে কাহারও চাকর হইয়া যদি দুপয়সা আনিতে পারে, তাহার উপায় দেখিব।" কিন্তু বেচারা কোথায় গিয়া কাহার চাকর হইবে, সেখানে সে সুখে থাকিবে কি না, মায়ের প্রাণে এই সব কথা বড়ই নড়াচড়া করিতে ছিল। বাণীকণ্ঠ বাবু বেড়াইতে আসিলে, বিধবা তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া, একথা ও কথার পর ছেলের কথা তুলিলেন।

"আমার ছেলের কি হবে? সে মাটীতে অক্ষর লেখে, বড় বেশী খেলা টেলা করে না। তাই দেখে পাড়ার লোকেরা বড় ঠাট্টা করে।"

বাণীবাবু বলিলেন—"পাড়ার লোকের আর বুঝি খেয়ে খেয়ে কাজ নাই? এ ছেলের এত শেখবার ইচ্ছা? আপনার কপাল ভাল মা! লোকের ঠাট্টা শুন্‌বেন না।"

পশুপতির মা উত্তর করিলেন—"ভগবান কি আমার ভাল কর্‌বেন? আপনি তো বুঝ্‌তেই পারেন, আমার সবে একটী ছেলে; লোকে 'পণ্ডিত চাষা' বলে তাকে ঠাট্টা করে, আর বাছা আমার সমস্ত দিন মুখ ভার করে বসে থাকে, কেমন করে সহ্য করি?"

বাণীবাবু।—"তাইতো! তাইতো! ছেলেমানুষ, মনে কষ্ট হয়। তা আপনি এক কাজ করুন না কেন? ছেলেটীর বেশ বুদ্ধি আছে, লেখাপড়া শেখবার উদ্যোগ আছে; আপনি ছেলেটীকে স্কুলে পাঠিয়ে দিন না কেন? সেখানে তো আর কেউ ত্যক্ত কর্‌তে যাবে না? আমি আপনার অবস্থা জানি। আমার স্কুলে দিন, ওকে স্কুলের বেতন দিতে হবে না। কি বলেন? এতে বোধ হয় রাজি আছেন?"

বিধবা বড়ই সুখী হইলেন, বলিলেন—"আঃ এ হলে আপনি আমাকে বাঁচান। কিন্তু এর একটু অসুবিধা দেখ্‌ছি।"

বুড়ো ভদ্রলোক একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"বটে? বটে? কি অসুবিধা, বল্‌বেন কি?"

পশুর মা বলিলেন,—"আমি রোজ দুবেলা বাবুদের বাড়ীতে দুধ দিতে যাই; কিন্তু আমি তো গরুটীর কাছে যেতে পারি না। গরু কেবল পশুপতিকেই চেনে, আর কেউ তার দুধ দুইতে পারে না।"

বাণীকণ্ঠ বাবু বলিলেন—"দশটা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুল, দুধ দোহা বন্ধ হইতেছে না তো!"

বিধবা আবার বলিলেন,—"আলুর ক্ষেত রোজই খুঁড়ে দিতে হয়, আমি মেয়ে মানুষ একলা পার্‌বো কেন?"

বাণী বাবুর কি দয়ার মন, যেন পরের উপকার করিতেই হইবে, তাই বলিলেন "ভোরবেলা একটু একটু অন্ধকার থাকিতে উঠিয়াই একাজ করা হয়! এতে শরীরের চালনাতে শরীর ও ভাল থাক্‌বে আর বাড়ীর কাজটীও হবে। বেলা সাড়েসাতটা আটটার মধ্যেই হয়ে যাবে, তার পরে দুধ দুহিয়া পড়িতে বসিলেই চলিবে, কেমন আর কিছু আপত্তি আছে?"

আহ্লাদে পশুপতির মার চক্ষে জল আসিতে লাগিল। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বড়ই সুখ হইয়াছে।

পশুপতির কথা এই খানে একটু বলা আবশ্যক। অতি অল্প বয়সেই পশুপতির বাপ মরিয়া যান। তাহাদের দুই বিঘা চাষের জমি ছিল, তাহাতে আলু বেগুণ প্রভৃতি ফসল হইত, এবং একটা গরু ছিল, তাহার দুধ 'বাবু'র বাড়ীতে যোগান্ দেওয়া হইত। এ ছাড়া টাকার সুদ ছিল, এই পাঁচ রকমে তাদের দিন চলিত। পশুপতিকে জমি দেখিতে হইত, গরু দুহিতে হইত, এবং কখন কখন টাকার সুদ আনিতে

যাইতে হইত। এই সকল কাজ করিয়া যে একজন ছেলে মানুষ আর পড়াশুনার দিকে মন দিবে, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? পশুপতির চেয়ে কয়েক বছরের বড় একটী ছেলের সঙ্গে পশুপতির বড় ভাব। পাড়ার ছেলেরা পশুকে "পণ্ডিত চাষা" বলিয়া ঠাট্টা করে কিন্তু সেই ছেলেটী পশুপতিকে লেখা পড়া শিখাইত। নিজে খোঁড়া বলিয়া চলিয়া ফিরিয়া কাজ করিতে পারিত না, তাই ঘরে বসিয়া সময় কাটাইবার জন্য একটু একটু লেখা পড়া শিখিয়াছিল। তাহার যত টুকু বিদ্যা তাই শিখাইবার জন্য সে রোজই লাঠি ভর করিয়া পশুদের বাড়ীতে আসিত। যে দিন বাণী বাবু এই বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সে দিনও "খোঁড়া দীননাথ" পশুপতিকে পড়াইতে আসিয়াছিল। দীননাথ বা পশুপতি কেহই জানিত না যে বাড়ীতে আর কেহ আসিয়াছে। তাই তাহারা কিছু পরে একটু চেচাইয়া আলাপ করিতে লাগিল। দুটী গলার স্বর শুনিয়া বাণী বাবু বলিলেন "পশুপতি আর কে?" পশুর মা সমস্ত বলিলেন। বাণী বাবু কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কেমন শিক্ষক একবার দেখিতে হইল"। এই বলিয়া উঠিয়া পাশের ঘরে উঁকী মারিলেন। দেখিলেন দীননাথ কয়লা দিয়া মেজেতে সুন্দর অক্ষরে, তিন-অক্ষর-যুক্ত কথা লিখিয়াছে, আর তার অর্থ পশুপতিকে বুঝাইয়া দিতেছে। বাণী বাবু দেখিলেন ছেলেটী কথা গুলির অর্থ বেশ বোঝে। মাঝে মাঝে গুরু ছাত্রে মিলিতেছে না। তখন দীননাথ বলিতেছে, "ঠিক বলেছ, পশু! তুমি ভাই যা বলেছ, তাই ঠিক্। যাক্, চিরকাল আমার মত মূর্খের কাছে পড়িতে হবে না? কিন্তু ভাই! তোমায় আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হবে? তুমি যখন বড় লোক হবে"—(পশুপতি মাথা নাড়িল)—"না ভাই! আমি ঠাট্টা করিতেছি না, তুমি নিশ্চয়ই বড় লোক হবে"।

পশুপতি বাধা দিয়া বলিল, "তুমি বড় লোকের কথা বলিও না। ওতে আমার মনে মনে অহঙ্কার হতে পারে? আর আমি যে গরিব দুঃখীর ছেলে, তা' ভেবে আমার মনে দুঃখ ও কষ্ট হতে পারে"।

দীননাথ বলিল, "বড় হওয়া তোমার কপালে আছে। সৎকার্য্যে যার এত যত্ন, তার তো কপাল খুলে রয়েছে। তা' ভাই! আমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা কর, যখন তুমি একজন বড় লোক হবে, তখন ভুলবে না যে এক সময় তুমি বড় গরিব দুঃখী ছিলে, আর ভুলবে না যে তোমার মা তোমার মুখ চেয়ে আছেন। আর ভাই দুটী কাজ ক'রো। যেখানেই থাক, কাণা, খোঁড়া, প্রভৃতি হতভাগাদিগকে, আমার কথা মনে ক'রে দয়া ক'রো—আর, পাপ মদটাকে বিষের মত জেনে, দুই হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিও। আমাদের দেশের অনেক বড় লোক এই বিষে গেল।"

বালক দিগের এই সকল কথা শুনিয়া বাণীকণ্ঠ বাবু আর থাকিতে পারিলেন না। সেই ঘরে ঢুকিয়া দীননাথকে যথেষ্ট আদর করিলেন এবং পশুপতিকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। আর অধিক বলিবার নাই। বাণী বাবুর স্কুলে যত টুকু শিখিবার ছিল, তাহা শিখিয়া পশুপতি হিন্দু কালেজে ঢুকিল এবং অল্প দিনেই মধ্যে আপনার বিদ্যার তেজে সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল।

উপরে যাহা লেখা গেল, সমস্ত সত্য কথা, কেবল নামও স্থান গুলি আমরা গোপনে রাখিলাম। আজ পশুপতি নাথ আপন দেশের মধ্যে এক জন প্রধান পণ্ডিত। যে বালক এক সময়ে গরু দুহিত এবং মাটীতে অক্ষর লিখিত, আজ তাহার কত সম্মান! যত্ন করিলেই সব হয়।

ধাঁধা।

গত বারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। নিস্তব্ধতা। ২। নূতন পঞ্জিকা। ৩। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, "ওগো, রুটী খাবে?" ৪। নেশার জিনিষ। ৫। আয়না। ৬। সখা।

নূতন।

১। আমার আশায়, পথ পানে চেয়ে, শত শত নর-
নারী; দুখের দিবস, ভাবিছে সকলে, দিব আমি
দূর করি। হায়রে কপাল! যবে আমি আসি,
আশার মুখেতে ছাই; আগের যা ছিল, তাহাই
রাখিয়ে, হেসে হেসে চলে যাই। যা আছে
করিতে, আজিকেই কর—থেকনা আমার
আশে। আমি বড় চোর, আয়ু চুরি করি—বাঁধি
অলসের ফাঁসে।

২। আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ-
নাকে কত ছেলে মেয়েকে পড়াইতে হয়?"
আমি বলিলাম, "এই দেখ না কেন? ½ অঙ্ক
পড়ে; ¼ বিজ্ঞান পড়ে; ¼ চুপ করে থাকে,
কিছুই করে না; এ ছাড়া আমার তিনটী মেয়ে-
কেও পড়াইতে হয়। এ থেকে তুমি বুঝে দেখ
আমার কত ছাত্র ও ছাত্রী?"

৩। ভয়েতে প্রথম তার নাহি রয় বনে;
গহনে দ্বিতীয়ে হেরি, গজগণ সনে;
তৃতীয় বাগান মাঝে বাহারেতে রয়;
চতুর্থ নদীর ধারে ভ্রমে সুখময়;
বল সখা! সেই জন কোন্ মহাজন——
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের সেই সে কারণ?

বিজ্ঞাপন।

আমরা পাঠক পাঠিকাদিগকে দুঃখের সহিত স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছি, যে সখার মূল্য এক টাকা মাত্র হইলেও, অনেকের নিকট আজি পর্য্যন্ত এই সামান্য মূল্য পাওয়া গেল না। আমরা আশা করি সকলেই এক মাসের মধ্যে দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। আগামী বারে যেন এইরূপ বিজ্ঞাপন আর প্রকাশ করিতে না হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণি অর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, 'সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

৮। ঠিকানা পরিবর্ত্তন তিন মাসের কম সময়ের জন্য হইলে, তাহা করা যাইবে না; অল্প সময়ের জন্য হইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরের সহিত পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবেন।

সখা কার্য্যালয়;
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।
সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

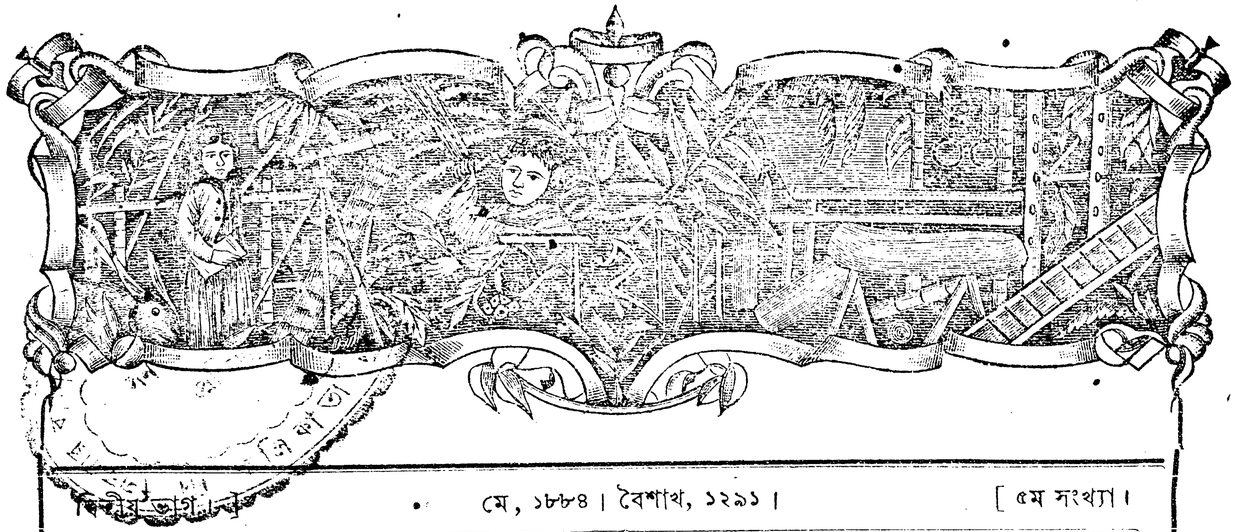

দ্বিতীয় ভাগ। মে, ১৮৮৪। বৈশাখ, ১২৯১। [৫ম সংখ্যা।

সুখী কে?

ঠিক পাঠিকাগণ! তোমরা কি জান পৃথিবীতে খুব সুখী কোন্ লোক? তোমরা হয়ত বলিবে যাহার অনেক টাকা, গাড়ী, ঘোড়া, শাল, জামিয়ার, সে খুব সুখে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, কোন ভাবনা নাই, কোন ভয় নাই, যা মনে করে তাই হয়, বেশ ত! সেই রকম লোকই বড় সুখী, কেমন? এই বলিবে না? তোমাদের মধ্যে যিনি ভাল ভাল পোষাক ভাল বাসেন, তিনি যাহার গায়ে খুব ভাল পোষাক দেখিবেন তাহাকেই সুখী মনে করিবেন। যিনি আবার পীড়িত, কেবলই ব্যামো হয়, তিনি প্রায় সুস্থ সবল লোক দেখিলে তাহাকেই সুখী বলিবেন। যাঁহাকে মাষ্টার ভাল বাসে না, তিনি হয়ত ক্লাশের ভাল ছেলে যাহারা তাহাদিগকেই সুখী মনে করিবেন। বাস্তবিক আবার একটা মজা আছে, বালকেরা মনে করে "যুবারা বেশ সুখে থাকে। কেমন! তাদের বাপ মারে না, কেমন কলেজে পড়ে, আহা! বেশ আমরা কবে এরূপ হব?" যুবারা আবার মনে করে যে তাদের অপেক্ষা বড় যারা তারা কেমন সুখী, কেন না তাদের ত আর কারো অধীনে থাকিতে হয় না, কেমন চাকরি বাকরি করিতেছে, যা ইচ্ছা করিতেছে, বেশ। আবার বুড়োরা চিরকাল বলে "আহা! বাল্যকালে কি সুখের দিনই গিয়াছে? সংসারের কোন জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না; বাবা খেতে পোর্‌তে দিতেন। মনের আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতাম, সে এক দিনই গেছে!" আমি এক জন ছেলেকে চিনি যে কাটবেরালিদের পর্য্যন্ত হিংসা করে, "আহা! ওরা কি সুখী, ওদের পড়া কর্ত্তে হয় না, কেবল দিন রাত্রি খেলা করে, বাঃ!"

এ দিকে আবার যিনি খুব ধনী তিনি বলেন "যদি গরিব হ'তাম তা হলে এত ঝঞ্ঝাট থাকিত না, মিছা মিছি কেবল হাজার হাঙ্গামায় রাত পোহাতে হোত না। বাবা রে! রাত্রে ঘুম হয় না, পাছে টাকা চুরি যায়, আর কত যে ভাবনা, কত যে মান সম্ভ্রমের চিন্তা, কত যে বিপদের আশঙ্কা, এর চাইতে গরিব দুঃখী হইয়া পাতার কুঁড়েতেও সুখী হওয়া যায়।" গরিব যিনি তিনি আবার ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলেন, দুঃখ সহিতে পারেন না, ক্ষুধায় অন্ন যোঠে না, শীতে কাপড় পান না, নানা কষ্টে শরীর মৃতপ্রায়—কেবল বিধাতাকে নিন্দা করেন।

জগৎ শুদ্ধ লোকের ত এই দশা! কেহই আর আপনার অবস্থাতে সুখী বোধ করেন না, সকলেই পরস্পরের অবস্থাকে সুখের মনে করে। একি আশ্চর্য্য ভাই! তবে কি সুখ কোথাও নাই? আবার সুখ সব অবস্থাতেই আছে! হাঁ বাস্তবিকই তাই। সুখ মনে, সুখ সন্তোষে, সুখ নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। নিজে যদি মনে করি আমি পরম সুখী, তবে ঘোর দারিদ্র্যে, খুব কষ্টেও আমি সুখী

হইব। নহিলে সংসারে সুখ নাই। হাজার সুখের জিনিষ থাকুক, আর তার সঙ্গে যদি একটু অসুখের কারণ থাকে,—এক ফোঁটা, এক তিলমাত্র,—অমনি আমার সব সুখ গেল। লাখ্ টাকার মধ্যে, ধূম ধাম আমোদের মধ্যে, একশতটা গাড়ী ঘোড়ার মধ্যে হয়ত আমার একটু রোগ আছে, কাজেই আমি সুখী নই,—অম্নি বলি "আহা যদি এই রোগটী যায় আর আমাকে ফকির হইতে হয় তাতেও আমি সুখী।" গেল আমার রোগ, ফকির হলাম। তখন আবার বাবুর কথা বদ্‌লে যাবে। "আহা! এ আমার কি হ'লো; একটু খানি অসুখ ছিল বৈত নয় তাও কত ডাক্তারের কত ঔষধ দিতাম, কিন্তু তা ছাড়া কত সুখে ছিলাম, এখন আমার দুঃখ দেখে কে। হায়! হায়! আমার কি হোলো?" এই রকম স্বভাব যে সকল লোকের, "সুখ সুখ" ক'রে যারা হা হা কার করে, তাহারা সুখী হয় না। তবে কে হয়?—

যে শান্ত মনে পরম পিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সুখে দুঃখে, ভালতে মন্দতে, কোন সময়েই যে মনে করে না "আমি দুঃখী," কেন না, ঈশ্বর তাহার অপেক্ষা অনেক জানেন, কোন্ অবস্থা তাহার ভাল তাহা তিনি বেশ জানেন, জানিয়াও যখন তিনি ঐ দশায় তাহাকে রাখিয়াছেন তখন উহাই তাহার সুখের অবস্থা। এই ভাবিয়া যে প্রতিদিন সেই মঙ্গলময় দেবতাকে ধন্যবাদ দিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিয়া দিন কাটায়, বাস্তবিক সেই যথার্থ সুখী, তা না হ'লে জগতে কোথাও সুখ নাই।

ছোট ছোট ভাই বোন্! তোমরা যদি সুখী হবার ইচ্ছা কর, তবে এই রকমে পরম ধন ধর্ম্ম ও সন্তোষের বলে সুখী হইতে চেষ্টা কর, তা না করিলে আর কোথাও সুখ পাবেনা, কেবল "হা সুখ যো সুখ" ক'রে ক'রে,—দুঃখ ভোগেই জীবন কাটিয়া যাইবে।

অভয়ের সুশিক্ষা।

অভয়, রমণী, বিজয়, যোগীন, প্যারী প্রভৃতি অনেকগুলি বালক এক সঙ্গে খেলা করে; খুব ভাব। রোজ বিকালে বাবুদের বাগানে খেলা-ধূলা, কুস্তি, জীম্‌নাষ্টিক প্রভৃতি করে, গায়ে বেশ জোর আছে, মনেও খুব ভরসা। অভয় বড় মানুষের ছেলে, তার খুব রাগ বেশী, মন বড় চঞ্চল। আজ এক কথা বলে কাল তা বদ্‌লে যায়, মতের একটুও ঠিক নাই। মনে মনে একটু অহঙ্কার আছে "আমি বড় মানুষের ছেলে, আমার গায়ে এত জোর!" ক্রমে আরও একটি অহঙ্কারের কারণ যুটিল। তাহাদের একটি ছোট সভা আছে, তাহাতে অভয় একজন প্রধান, সে জানে যে সে একজন সৎ ও ধার্ম্মিক বালক! অহঙ্কার যে মানুষের কি সর্ব্বনাশ করে তাহা একবার দেখাইব।

একদিন একজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান ছেলেদের সব কি গালাগালি দেয়, তারা এসে সকলের কাছে নালিস করে। ছোট লোক দরওয়ান বৈত নয়! তাকে কি সব বলেছে, সে চড়া মেজাজ, বেশ কোরে গাল দিয়েছে। তা তার মনিবকে বলিয়া দিলেই ঠিক হইত, তাহা না করিয়া বোকা বালক বাবুদের বুদ্ধিতে স্থির হইল দরওয়ান বেটাকে মারিতে হইবে। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমরা বড়লোক, আমরা কুস্তি টুস্তি করি, আমাদের কিনা গালি দিয়া যাইবে? তার কিছু সাজা হবে না? রমণী ত রাগে একেবারে উন্মত্ত! যেমন ভালকুত্তা গর্জ্জায় এমনি ফুলিতে লাগিল, সমস্ত দিন খেলে না, রাগে একেবারে জ্ঞান হীন!! তার রাগ দেখিয়া ও একজন লোককে মারিবার সুযোগ পাইয়া দুরন্ত ছেলেদের মহা আহ্লাদ। বিজয় ত মহা উৎসাহী। সব প্রস্তুত, ঠিক ঠাক। সন্ধ্যার সময় যখন দরওয়ানটা রাস্তা দিয়া যাবে তখন মারা হইবে।

দু এক জন শান্ত স্বভাব বালক বারণ করিলে বিজয় বাবু বলিয়া উঠিলেন—"কি ভীরু!! ছি ছি!! আমাদের এক সঙ্গে যিনি যিনি না থাকিবেন তাহাদের লইয়া আর আমরা খেলিব না, আর তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিব না।" কাজেই সকলে একত্রে যুটিয়া দরওয়ানটীকে লাঠী মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইল। পরে সকলে প্রস্থান!! সেদিন বাবুদের রোক্ কি? তেজে ধরণী ফাটিতেছে। অভয়ের ও বিজয়েরই উদ্যোগ বেশী। বিজয়ই লাঠী যোগাড় করিয়া দিল আর অভয়ই সজোরে মাথা ফাটাইলেন। ধন্য বীরত্ব! খুব বাহাদুর!!

দরওয়ান ত নালিশ করিল। এইবার আমার ইচ্ছা করিতেছে, পাঠক পাঠিকাগণ একবার দেখিতেন যদি ছেলেমহলে কি রকম মজা হইতে লাগিল!! সে কথা আর কি বলিব? প্রধান চাঁই অভয় ত ভয়ে আকুল। আহার নিদ্রা বন্ধ; কেবলই দিন রাত ঐ ভাবনা। কি হবে? কেহ বলিল তাহার জেলে যাইতে হইবে, কেহ বলিল তাহারা বেশী দাবী দিবে, হয়ত দ্বীপান্তরিত হইতে হবে, কেহ বলিতেছে "নানা! ঘা কতক বেত।" কেহবা বলিল জরিমানা। মহা দুর্ভাবনা। অভয় রমণী ও যোগীন এই তিন জনকে চিনিতে পারিয়া আসামী করিয়াছিল। ইহাদের পক্ষের লোকেরা যুক্তি করিয়া স্থির করিল যে "সটান মিথ্যা কথা বলিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিতে হইবে, নইলে রক্ষা নাই।" সেও মহা বিপদ। অভয়ের বিপদের সীমা নাই, উভয় সঙ্কট। সত্য বলিলে মেয়াদ হইবে। মিথ্যা বলিলেও সভায় বন্ধুগণের কাছে অপমান। মহা বিপদ! অভয় ত মৃত প্রায়। শেষ নিরুপায় হইয়া রফা করিবার চেষ্টা করিল। তাহাও হইল না। আহা! সেই অহঙ্কার কোথা? পাঠক পাঠিকা তোমাদের হাসি পাচ্ছে না? আমার ত পাচ্ছে। সেই বুক ফোলান কোথা? সেই সত্য কথার গর্ব্ব কোথা? সেই ধন ও বলের গর্ব্ব এখন চূর্ণ। এক-জন সামান্য দরওয়ানকে মারিয়া জেল!! কি লজ্জা! কি ঘৃণা!! অভয় যে কতবার নাক কান মলিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় ১০০ বার হবে! হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! কেমন মজা! ঈশ্বর এই রকমেই অহঙ্কারীকে শাস্তি দেন।

আবার এক আশ্চর্য্য দেখ। এক দল ছেলেতে মারিল। তার পর যাকে জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলে "আমিত ছিলাম না। হ্যাঁ! আমাকেও বুঝি জড়াইবে?" যে বিজয় সে রূপ তেজের সঙ্গে বলিয়াছিল "যে আমাদের সঙ্গে যোগ না দেবে তার সঙ্গে কথা কহিব না," যে বিজয়ই অভয়ের হাতে লাঠী তুলিয়া দিল, যে বিজয় শত শত গালাগাল ও কটূক্তি করিয়া দরওয়ানকে চটাইয়া দিল—সেই "পালের গোদা" বিজয়ই এখন আবার গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন "যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল, মার্‌লে অভয়, সাজা পাবেই ত!! অভয় বড় গোঁয়ার নির্ব্বোধ, ইত্যাদি।" এম্‌নি কালই বটে! যাহোক্ বিজয়, তোমাকে খুব চেনা গেল। তুমিই না লাঠী বাড়াইয়া দিয়াছিলে আর সেই "কথা কবোনা" বলে ছিলে? এমনি বন্ধুই বটে? বিপদের অংশ কেহই লইতে চাহে না। বেশ, বেশ!

মকদ্দমার দিন আসিল। সমস্ত ঠিক ঠাক। মিথ্যা কথা বলিয়া সব উড়াইয়া দেওয়া হইবে। বিচার হইতেছে। যোগীন ও রমণী সমস্ত মিথ্যা বলিয়াছে। কিন্তু মিছা কথা কতক্ষণ থাকে? উকীলের জিজ্ঞাসার মুখে সব সত্য প্রকাশ হইয়া গেল। সাহেব রাগে পেন্সিল মুখে দিয়া কামড়াইতে লাগিলেন। অভয়ের এইবার বলিবার পালা আসিল। অভয় দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল। একটাও মিথ্যা কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সমস্ত সত্য বলিয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল "সাহেব, আমি অপরাধ বাস্তবিক করিয়াছি, আমাকে আজ দশ দিন ধরিয়া মিথ্যা শিখাইতেছে, কিন্তু একবার

অপরাধ করিয়া আবার আর একটা বড় দোষে উহা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে আমি পারিলাম না। আমি বড় অহঙ্কারী ছিলাম। আমার সাজা হওয়াই উচিত। আপনার বিচারে যাহা হয় তাহাই আজ্ঞা করুন। আমার মনের ভিতর এ কয়দিন যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা অপেক্ষা জেলের কষ্ট হাজার গুণে ভাল।" এই বলিতে বলিতে চাদরে চক্ষু রাখিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল। আদালত শুদ্ধ লোক বালকের সরলতা, সত্য কথা বলিতে সাহস, মিথ্যা বলাতে ঘৃণা ও দোষ করিয়া অনুতাপ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। অনেকের চক্ষে জলও আসিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরও ক্রোধ দূর হইল।

অবশেষে তিনি এই হুকুম করিলেন যে "রমণী ও যোগীন যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে তাহা তাদের দোষ নয়, সে কেবল তাহাদের কর্ত্তাদের দোষ। সুতরাং আমি তাহাদিগকে বেত বা জেল দিব না কিন্তু মিথ্যা বলা যে দোষ ইহা শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইল। আর অভয় বিনা শাস্তিতে মুক্তি পাইল, আমার বিশ্বাস যে সে আর কখন এরূপ অন্যায় কার্য্য করিবে না।"

অভয় উত্তম শিক্ষা পাইল। সে ভাল হইয়া গেল, সে শিখিল যে

(১ম) কোন বিষয়েই অহঙ্কার করা উচিত নয়।

(২য়) মানুষ যতই গরিব হউক, দরওয়ানই হউক আর যেই হউক, তাহাকে বিনা দোষে বা অল্প দোষে মারা উচিত নয়। মানুষ সবই সমান।

(৩য়) যে কোন মন্দ বিষয়ে সহায় হয় সে কখন বন্ধু নহে, বিপদের সময়ে সে নিশ্চিতই ফেলিয়া পলাইবে।

(৪র্থ) দোষ করিলেই তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

(৫ম) একটী দোষ করিয়া তাহা ঢাকিবার জন্য মিথ্যা কথা কহিলে বাঁচা যয় না, বরং বিপরীত হয়। কেননা ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা কথা থাকে না। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। কখনও মিছা কথা কওয়া উচিত নয়।

(৬ষ্ঠ) পাপের জন্য যে অনুতাপ হয়, শরীরের শাস্তি তাহার কাছে কিছুই নয়।

(৭ম) ধর্ম্মের দিকে যাহার দৃষ্টি জগতের সমস্ত লোক তাহার সহায় হয়।

নববর্ষের নূতন গল্প।

নরেন্দ্র বাল্যকালেই পিতৃমাতৃ হীন হইয়াছে, এখন তাহার বয়স এগারো বারো বৎসর হইবে। মরিবার সময় নরেন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রকে চন্দ্রনাথ বাবু নামক কোন আত্মীয়ের নিকট রাখিয়া যান; ইহাঁর নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না, নরেন্দ্রকে পাইয়া তিনি অতি যত্নে তাহাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া নরেন্দ্র প্রথমতঃ মনোযোগের সহিত লেখা পড়া করিতে লাগিল, কিন্তু এ অবস্থা চিরদিন থাকিল না। নরেন্দ্র মন্দ বালকদিগের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিল, কুসঙ্গে পড়িয়া দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল; লেখা পড়ায় অমনোযোগ হইল; ক্রমে শিক্ষকের অবাধ্য হইয়া উঠিল, দুষ্ট বালকদিগের সহিত মিশিয়া সর্ব্বদাই খেলা করিয়া বেড়াইত, কাহারই কথা শুনিতনা। কিন্তু এ সমস্ত দোষ সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের একটি গুণ ছিল,—সে চন্দ্রনাথ বাবুকে বেশ ভালবাসিত এবং প্রায়ই তাঁহার অবাধ্য হইতনা। একদিন চন্দ্রনাথ বাবু শুনিতে পাইলেন যে নরেন্দ্র কতকগুলি দুষ্ট বালকের সঙ্গে মিলিয়া অন্য কতকগুলি বালকের সহিত মারামারি করিয়াছে, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক এই জন্য গালাগালি দেওয়াতে নরেন্দ্র শিক্ষককে অমান্য করিয়া

বিদ্যালয় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু ইহাতে যারপর নাই দুঃখিত হইলেন; যাহার পিতা অত্যন্ত সৎ এবং ধার্ম্মিক ছিলেন তাঁহার সন্তান এরূপ হইল দেখিয়া তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি নরেন্দ্রকে ডাকিয়া অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন, বলিলেন "নরেন্দ্র! তোমার ব্যবহার দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, তোমার পিতামাতা তোমাকে আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন, আমি তোমাকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতেছি, তোমাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেছি, যাহাতে তুমি তোমার ধার্ম্মিক পিতার ন্যায় হইতে পার তার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা মাটী হইয়া যাইতেছে, তুমি দিন দিন খারাপ হইতেছ, তোমার পিতার নাম ডুবাইতে চলিয়াছ, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি নরেন্দ্র চন্দ্রনাথ বাবুকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, কাজেই সে মাথা হেঁট করিয়া এ সমস্ত শুনিল, তাহার চক্ষে জল আসিল, নরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া শয়ন করিল। আজ পাঁচ ছয় বৎসর হইল নরেন্দ্র বাপ মাকে হারাইয়াছে, সে এক প্রকার তাঁহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ চন্দ্রনাথ বাবুর তিরস্কারে পিতামাতার কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল; সে নানা প্রকার চিন্তায় একেবারে ডুবিয়া পড়িল, অবশেষে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই ভাবে অনেক রাত্রি হইল, নরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রাযোগে নরেন্দ্র এক চমৎকার স্বপ্ন দেখিল;—দেখিল যেন অতি উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক আলোকিত হইয়াছে, প্রথমতঃ সে আলোকের দিকে সে চাহিতে পারিলনা, কিন্তু কিছুকাল পরে দেখিল একজন সুন্দর পুরুষ আকাশ হইতে ধীরে ধীরে, তাহার দিকে উড়িয়া উড়িয়া নামিয়া আসিতেছেন, নরেন্দ্র দেখিয়া ভীত অথচ আশ্চর্য্য হইল; ক্রমে সেই পুরুষ নরেন্দ্রনাথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নরেন্দ্র ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন সেই পুরুষ বলিলেন "নরেন্দ্র! তুমি কাঁদিতেছিলে কেন?" নরেন্দ্র সেই স্বর্গীয় পুরুষের মুখে নিজের নাম শুনিয়া অবাক্ হইল, পরে বলিল "আমি আমার পিতার জন্য কাঁদিতে ছিলাম। আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে একবার তাঁহার নিকট যাই এবং তাঁহাকে দেখি।" তখন সেই পুরুষ বলিলেন "নরেন্দ্র! আমি তোমাকে যে কার্য্য করিতে বলিব, যদি তুমি তাহা করিবেই করিবে এরূপ প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে তোমাকে তোমার পিতার নিকট লইয়া যাইতে পারি।" নরেন্দ্র পিতার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছিল, সে তখনই এই কথাতে সম্মত হইল। তখন সেই পুরুষ নরেন্দ্রকে এক মনোহর বাগানে লইয়া গেলেন; নরেন্দ্র দেখিল বাগানটি অতি সুন্দর, নানা প্রকার সুন্দর বৃক্ষ লতার বাহারে পোরা, কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও ফলের ভরে গাছগুলি নোয়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা ঝরণা হইতে জল উঠিয়া মিষ্ট শব্দে চারিদিক পূর্ণ করিতেছে, কোথাও পাখীরা সুমিষ্ট গানে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে; নরেন্দ্র সে মনোহর শোভা দেখিয়া মোহিত হইল। তখন সেই স্বর্গীয় পুরুষ নরেন্দ্রকে সেই উদ্যানের মধ্যের একটি সুন্দর সাজান গৃহে লইয়া গেলেন, এবং বলিলেন "নরেন্দ্র! এই ঘর তোমারই জন্য, এই ঘরে দাস দাসী রহিয়াছে তাহারা তোমার কথা শুনিয়া চলিবে, এই উদ্যান মধ্যে যেখানে ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতে পার—ইহা তোমারই জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।" স্বর্গীয় পুরুষ পুনরায় আর এক স্থানে নরেন্দ্রকে লইয়া গেলেন; নরেন্দ্র দেখিল একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ফুটন্ত পদ্মে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; স্বর্গীয় পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন—"নরেন্দ্র! কি দেখিতেছ?" নরেন্দ্র বলিল "হাজার হাজার সুকোমল পদ্ম ফুটিয়া রহি-

য়াছে, তাহাই দেখিতেছি।" তখন আবার প্রশ্ন হইল "আর কি দেখিতেছ?" নরেন্দ্র দেখিল এক একটি পদ্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা গাছ রহিয়াছে,—বলিল "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটাগাছ।" স্বর্গীয় পুরুষ বলিলেন এই ফুলগুলি তোমার পিতার অতি প্রিয়, এই পদ্ম গুলিকে তিনি বড় ভালবাসেন, ঐ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টক বৃক্ষগুলি দেখিতেছ, উহারা ঐ পদ্মগুলির মহাশত্রু। কণ্টকবৃক্ষ গুলিকে যদি নষ্ট করিয়া ফেলা না হয় তাহা হইলে শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া সমুদায় পদ্ম গুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই পদ্ম গুলি তোমার পিতার অতি প্রিয়, এগুলি নষ্ট হইলে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইবে, অতএব প্রত্যহ তুমি এক একটি কণ্টক তুলিয়া ফেলিবে, দেখিও যেন এগুলি বর্দ্ধিত হইয়া পদ্মগুলি নষ্ট না করে। ইহাতে কখনও অবহেলা করিও না, তুমি কার্য্যে নিযুক্ত থাক, সময় হইলে আমি আসিয়া তোমাকে তোমার পিতার নিকট লইয়া যাইব।" নরেন্দ্র সম্মত হইল; তখন সেই পুরুষ বলিলেন "সম্মুখে চাহিয়া দেখ।" নরেন্দ্র দেখিল কিছু দূরে অতি উজ্জ্বল সোনার দরজা; ফিরিয়া দেখিল সেই স্বর্গীয় পুরুষ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, নরেন্দ্র খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে সেই গৃহে ফিরিয়া আসিল। নরেন্দ্র প্রত্যহ এক একটি কণ্টক বৃক্ষ তুলিয়া ফেলিত এবং সেই বাগানের মধ্যে আপনার মনের আনন্দে দিন কাটাইত। এইরূপে কয়েক দিন গেল, একদিন নরেন্দ্র দেখিল যে সম্মুখে বৃক্ষ ডালে একটি অতি সুন্দর পক্ষী বসিয়া গান করিতেছে, বড় ইচ্ছা হইল পক্ষীটিকে ধরিয়া আনে। ধরিবার জন্য সে বৃক্ষে উঠিতে লাগিল; কিন্তু কতক দূর উঠিতেই পাখীটি উড়িয়া আর এক বৃক্ষে গিয়া বসিল, নরেন্দ্র আবার সেই বৃক্ষে উঠিতে গেল, পক্ষীও আর এক বৃক্ষে উড়িয়া গেল, এই রূপে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে নরেন্দ্র পক্ষী ধরিবার চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল; অবশেষে পক্ষী উড়িয়া কোন্ দিকে চলিয়া গেল, নরেন্দ্র আর দেখিতে পাইল না। অতিশয় ক্লান্ত হইয়া নরেন্দ্র এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল। তখন তাহার মনে হইল যে সেদিন কণ্টক বৃক্ষ তোলা হয় নাই, ভাবিল অদ্য বড় ক্লান্ত হইয়াছি। কল্য একেবারে দুইটি বৃক্ষ তুলিব তাহা হইলেই হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিল পূর্ব্বদিনের শ্রমের জন্য শরীর বড় অসুস্থ হইয়াছে, তখন মনে করিল আজ অসুখ বোধ করিতেছি, আজ থাক্, কাল অনেকগুলি তুলিয়া ফেলিব। দিনের পর দিন আসে এদিকে নরেন্দ্রেরও এক একটি বাধা উপস্থিত হইয়া কার্য্য বন্ধ থাকে। এই রূপে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই কার্য্যে অবহেলা হইতে লাগিল, অবশেষে একদিন দেখিল সেই ক্ষুদ্র কণ্টক বৃক্ষগুলি বর্দ্ধিত হইয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে, এখন আর সে গুলি ছোট নয়, বড় বড় বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর পদ্মফুল গুলি শুকাইয়া গিয়াছে, সে পুষ্করিণীর আর সে শোভা নাই। দেখিয়া তাহার মনে বড়ই ভয় হইল। মনে ভাবিতে লাগিল আমি কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি, পিতার প্রিয় জিনিষগুলি অমনোযোগ করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তাঁহার প্রিয়পদ্ম গুলি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। কণ্টক বৃক্ষগুলি বাড়িয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে, এখন আমি কি উপায় করিব, ক্ষুদ্র থাকিতে যদি তুলিয়া ফেলিতাম তাহাহইলে এ গুলি এত বড় হইতে পারিত না। এত বড় বৃক্ষ কেমন করিয়া তুলিয়া ফেলিব, হায়! আমি কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি! এইরূপ দুঃখ করিতে করিতে নরেন্দ্র কাঁদিতে লাগিল; তখন দেখিল তাহার সম্মুখে সেই স্বর্গীয় পুরুষ এক ধারাল কুঠার হস্তে উপস্থিত, দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া গেল, তাহার মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল; নরেন্দ্র ভাবিল পিতার কথা শুনি নাই, সেই জন্য বুঝি আমায় মারিয়া ফেলিবে। এখনই বুঝি এই কুঠার দ্বারা আমার শরীরটা দুখণ্ড করিয়া ফেলিবে; এইরূপ ভাবিতেছে,

তখন সেই পুরুষ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "নরেন্দ্র! তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর, ভাবিয়া দেখ তুমি কি ভয়ানক অপরাধ করিয়াছ, তোমার পিতার অতি প্রিয় পদার্থগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ, এই কণ্টক বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্র থাকিতে তুলিয়া ফেলিলে এত বড় বৃক্ষ হইতে পারিত না এবং এই সুন্দর পদ্মবন একেবারে ছারখার হইয়া যাইত না, আর দেখদেখি সেই স্বর্ণময় দ্বার আর দেখিতে পাও কি না।" নরেন্দ্র সভয়ে দেখিল আর সে দ্বার দেখা যাইতেছে না, চারিদিকে কণ্টকবৃক্ষ মাথা তুলিয়া অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার প্রাণ কম্পিত হইতে লাগিল, সে মাথা হেঁট করিয়া ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিল। তখন সেই পুরুষ বলিলেন "নরেন্দ্র! এখনও আশা আছে, এখনও যত্ন করিলে তোমার পিতাকে খুসী করিতে পার; এবং তাঁহার নিকটে যাইতে পার।" আশার কথা শুনিয়া নরেন্দ্র এক দৃষ্টে সেই পুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি বলিলেন "এই লও, এই কুঠার লইয়া এই বনের মধ্যে যাও, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া এক একটি করিয়া বৃক্ষ কাটিতে থাক, যে দিন তোমার এই কার্য্য শেষ হইবে সেই দিন তোমাকে তোমার পিতার নিকট লইয়া যাইব।" নরেন্দ্র আশান্বিত হইয়া উৎসাহের সহিত কুঠার হস্তে লইল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইল, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে লাগিল। অবশেষে সেই শুভদিন উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত হইয়াছে, চারিদিক যেন সোণার রঙে চিত্রিত, পক্ষীগণ সুমিষ্ট স্বরে গান করিতেছে, বৃক্ষ লতা ফল ফুলে শোভা পাইতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথের কার্য্য শেষ হইল, সেই সরোবর আবার সহস্র পদ্মে পূর্ণ হইয়া গেল, আবার পূর্ব্বের শোভা ধারণ করিল, নরেন্দ্র আবার সেই স্বর্ণময় দ্বার দেখিতে পাইল। হাসিতে হাসিতে সেই স্বর্গীয় পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নরেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে কুঠার গ্রহণ করিলেন, সযতনে তাহাকে দুটি ডানা পরাইয়া দিলেন। তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "নরেন্দ্র! তবে চল তোমার পিতার কাছে যাই।" এই বলিয়া সেই স্বর্গীয় পুরুষ আকাশ পথে সেই স্বর্ণময় দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নরেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে শূন্য পথে চলিতে লাগিল। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সেই পুরুষ দ্বারে হাত দিলেন, দ্বার খুলিয়া গেল, নরেন্দ্র দেখিল এক সুন্দর দেশ, সেখানে চিরসুখ বিরাজ করিতেছে, চতুর্দ্দিক শোভাময়, সেখানে বিবাদ কলহের চিহ্নমাত্র নাই, নরেন্দ্র সেই স্বর্গীয় পুরুষের সঙ্গে যতই যাইতে লাগিল ততই আনন্দ উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ এক আশ্চর্য্য এবং অত্যুজ্জ্বল আলোক তাহার চক্ষে পড়িল।

এমন সময় নরেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, চক্ষু মেলিয়া দেখিল আকাশে সূর্য্য উঠিয়াছে। জানালা দিয়া সূর্য্যের কিরণতাহার চক্ষে আসিয়া পড়িতেছে। নরেন্দ্র শয্যা হইতে উঠিয়া পূর্ব্ব রাত্রের আশ্চর্য্য স্বপ্ন ভাবিতে ভাবিতে চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল; তাঁহার নিকটে সমস্ত ঘটনা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ইহার অর্থ কি?" চন্দ্রনাথ বাবু অবাক্ হইয়া নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে খানিকক্ষণ মনস্থির করিয়া বলিলেন "নরেন্দ্র! অতি সুস্বপ্ন দেখিয়াছ, স্বপ্নটি অতি গভীর উপদেশে পূর্ণ, ইহা তোমার জীবনের একটি বড় সুখের ঘটনা বলিতে হইবে; এই স্বপ্নে যে গভীর উপদেশ রহিয়াছে তাহার মত কার্য্য করিলে চিরকাল সুখী হইতে পারিবে, ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয় হইয়াছেন।" চন্দ্রনাথ বাবু বলিতে লাগিলেন "দেখ নরেন্দ্র! সেই যে স্বর্গীয় পুরুষ দেখিয়াছ, উহা বিবেক অর্থাৎ আমাদের ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার শক্তি, মানুষ যখন অসৎ পথে যায়, পাপ কার্য্য করে তখন এই স্বর্গীয় পুরুষ মানুষকে সেই

একটা পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে জল খাবারের জন্য কতকগুলি ভিজান চা'ল আর কিছু সন্দেশ লইয়া বড় ছেলেটী আমার ঘরে বসিয়া আছে। চা'ল গুলি ভিজিয়া ঠিক ভাতের মত হইয়াছে। সেখানে খাবার সময় ঐরূপ চা'ল অনেককে খাইতে দেখিয়াছি। আমি খাইতে বসিলাম। ছেলেটী আমার কাছে বসিয়া রহিল! তাহার ভাব ভঙ্গীতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিছু বলিতে আসিয়াছে। কিছুকাল পরেই সে আমার গায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আমি কিছু চমৎকৃত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। সে বলিল——

"মা বলে দিয়েছেন আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি শাপ দিলে আমার অনিষ্ট হবে। আমি আপনাকে মন্দ কথা বলেছি।"

"তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। তোমার কথায় আমার কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর্‌বো যেন তিনি তোমার ভাল করেন।

তাহাকে বুঝান কিছু কষ্টকর বোধ হইল। কিন্তু শেষটা সে যেন সুখী হইল এবং বলিল "তবে যাই মার কাছে বলি গে।"

সরোজবাসিনী ও সুশীলা।

সরোজ বাসিনী বড় লোকের মেয়ে। তার বয়েস প্রায় বার বৎসর শেষ হইতে চলিল তবু স্বভাব ভাল করিতে পারিল না। এক বয়সীদের সঙ্গে বড় একটা মিল নাই; সর্ব্বদাই পাড়ার লোকদের নিন্দা—কনকের ভাল অলঙ্কার নাই, কুমুদের কাপড় বড় কম দামের, বিন্দুবাসিনীর বর্ণ কালো—এ সমুদয় কথা মুখে লেগেই আছে। ঘৃণা করিয়া অন্যান্য বালিকাদের সঙ্গে কথা কয় না, এই সকল কারণে গ্রামে যত লোক সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, অনাবিষ্ট বলিয়া বড় কেউ আদর করে না। এক বয়সী এক সঙ্গে খেলা করে না, এই জন্য সরোজ মধ্যে মধ্যে একটু দুঃখিত হইত। বালিকারা বলিত "না ভাই! তুমি বড় লোকের মেয়ে আমরা তোমার সঙ্গে খেলাবার যোগ্য নই।" নির্ব্বোধ সরোজ মনে ভাবিত উহারা যথার্থ কথাই বলিতেছে। কাহার সঙ্গে খেলা করিবে, কাহার কাছে দুটী কথা বলিবে, সময় সময় সরোজ ইহা ভাবিয়া মনে অনেক কষ্ট পাইত। ফলতঃ সরোজ সুন্দর অলঙ্কার, নূতন কাপড়—বহুমূল্য শাড়ী উৎকৃষ্ট জামা ইত্যাদি পাইয়া মনে যেমন সুখ পাইত, তাহার প্রতি একবয়সীদিগের কেমন এক প্রকার ভাব, গ্রামের অন্যান্য বড় লোকদিগের বিরক্তি তাহাকে আবার তেমনি লজ্জিত এবং দুঃখিত করিত। সে ভাল পোষাক, মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা সুন্দর সাজ করিয়া বিকালে বেড়াইতে যাইত বটে, কিন্তু তাহার সুন্দর মুখ খানিতে একবারও হাসি দেখা যাইত না। যাহার মনে আমোদ আহ্লাদ নাই সে আবার হাসিবে কি প্রকারে?

সরোজের পিতা তাহার লেখা পড়া শিক্ষার জন্য বাড়ীতেই একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; গ্রামের অন্যান্য বালিকারাও ঐ স্কুলে পড়িতে যাইত। সরোজ পড়ায় বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু সেই শ্রেণীতেই সুশীলা নামে একটী বালিকা বড়ই চমৎকার পড়া বলিতে পারিত। সে পড়ায় যেমন সমুদায়ের উপরে থাকিত চরিত্রে ও সেই রূপ সকলের প্রধান ছিল। সুশীলা পড়ায় উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহাকে পাড়ার সকলে ভালবাসিত—প্রশংসা করিত; চরিত্রে সব চাইতে উত্তম বলিয়া সকলেই তাহাকে আদর করিত, যত্ন করিত। সুশীলা বুদ্ধিমতী বালিকা, সে বুঝিতে পারিত এ ভালবাসা তার শিক্ষার, এ আদর তার চরিত্রের। সুশীলাকে সকলই ভালবাসে, আদর করে, দেখিয়া সরোজের নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিল তার সঙ্গে খুব

আত্মীয়তা করে। নির্ব্বোধ বালিকা এই সৎ ইচ্ছার মত কাজ করিতে গিয়া অহঙ্কারের জন্য পারিয়া উঠিল না। সে মনে করিতে লাগিল আমি এত বড় লোকের মেয়ে, আমার এত ভাল ভাল পোষাক, এত উৎকৃষ্ট অলঙ্কার, এ সমস্ত দেখিলেই সুশীলা ভুলিয়া যাইবে। সরোজ মনে মনে স্থির করিল তার যত উৎকৃষ্ট পোষাক এবং মূল্যবান অলঙ্কার আছে তা সব গায়ে জড়াইয়া সুশীলাকে অবাক্ করিয়া ফেলিবে। একদিন স্কুলের ছুটীর পর সরোজ খুব ঘটা করে সাজগোজ করিয়া সুশীলার বাড়ীতে গেল; গিয়া দেখিল সুশীলা একলা এক স্থানে বসিয়া 'সখা'র "ঠাকুর দাদার গল্প"টী পাঠ করিতেছে। ধীরে ধীরে নিকটে বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তার পর বলিল "সুশীলা! দেখ দেখি বোন! আমার কেমন সুন্দর পোষাক। দেখতো কেমন ভাল ভাল অলঙ্কার—এ সব অনেক দামী জিনিষ; বাবা বিদেশী কামার দ্বারা গড়াইয়া দিয়াছেন।" সুশীলা অনেকক্ষণ কিছু কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল; পরে বলিল "দেখ সরোজ! তোমাকে আমার বলা যদিও ভাল দেখায়না, তবু আমি যাহা ভাল বুঝি তাহা তোমাকে বলিব তাতে দোষ কি? মা এক দিবস বলিয়াছেন পোষাকের জাঁক জমক কিছু নয়। পোষাক দুদিন ব্যবহার কর অমনি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে, অলঙ্কার দশ দিন ঘরে রাখিয়া দাও, অমনি মর্চ্চে ধরিবে, ময়লা হইয়া যাইবে। অহঙ্কার করিবার জিনিষ এ সব নয়। সৌন্দর্য্য যদি জাঁক করিবার জিনিষ হইত তবে ময়ূর প্রভৃতি কত সুন্দর প্রাণী এপৃথিবীতে আছে, তাদের নিকট আমাদের এ কোন্ ছার জিনিষ? শিক্ষা, সদ্বুদ্ধি, দয়া এবং ধর্ম্মভাব এই কয়টী গুণই মানুষকে দেবতার ন্যায় করে। এসমুদায় ব্যবহারে নষ্ট হইয়া যায়না বরং যত ব্যবহার করিবে ততই উন্নত হইবে; ইহা কখনো ছিন্ন হয় না বা মর্চ্চে ধরিয়া ময়লা হইতে পারে না। তুমি যাহাতে এই সমুদায় ভাব মনে প্রবল করিতে পার তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন কর। পরের প্রতি ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ এ সমুদায় কুভাব মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। দেখিবে তোমাকে লোকে কত ভাল বাসে কত যত্ন করে। প্রশংসা করে।" সরোজ এত দিনে তাহার ভুল বুঝিতে পারিল—বুঝিতে পারিল কাপড় বা অলঙ্কার, শিক্ষা এবং চরিত্রের নিকট কিছুই নয়। বলিল—"সুশীলা! তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, ভাই! আমি আজ হতে তোমার উপদেশ মত চলিব।"

বালক বালিকাগণ! তোমরাও যদি লোকের ভালবাসা, স্নেহ, ও আদর পাইতে চাও তাহা হইলে সুশীলার উপদেশ মত চল।

আয় যাদু কোলে আয়!

"আয় যাদু কোলে আয়! তোকে বুকে করে রাখি। তোর ঐ চাঁদমুখ খানি আমার বড় ভাল লাগে। তোর মুখে কি সুধা মাখান আছে তাই আমার এত ভাল লাগে? ও সোণার মুখ খানি দেখি। দেখি ও চাঁদ মুখখানি দেখি। ইচ্ছা হয় তোর ঐ নির্ম্মল পবিত্র মুখ খানি দিন রাত দেখি। একটী চুম খাই! আমার এই চাঁদ মুখ খানিতে—সোণার মুখ খানিতে—একবার চুম খাইলে হবে না। তোর হাসি মাখা মুখ খানিতে সমস্ত দিন চুম খাই। আমায় একটী চুম দাও, যাদু! দাও! দেবেনা? দাওনা সোণার ভাই! আমি তোমায় কত খেলাম, একটিও ফিরাইয়া দিবে না। না দাও যাদু! আমি আবার খাই। তোরে যে আমার কি করিতে ইচ্ছা করে! ইচ্ছা করে তোরে আমার বুকের হার করে রাখি। আমাদের বাড়ীর আলো! আমাদের সর্ব্বস্বধন। আমাদের রতন। এ আলো যাদের বাড়ী আছে তাহাদের বাড়ীতে কি অন্ধকার আসিতে পারে? তুমি আমাদের সাধের ফুল!

আমাদের সোণার ফুল। তুই আমাদের বাড়ীতে ফুটেছিস্। আহা কে এ ফুল ফোটালে! তুই চিরকাল আমাদের বাড়ীতে ফুটে থাক্! ঘর আলো করে থাক্!

ধন! ধন! ধন! অমূল্য রতন!
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথাই জীবন!
তোকে নাচাই। নাচ! নাচ! নাচ!
খোকা নাচে কোন্ খানে;শতদলের মাঝখানে;
সেখানে খোকা কি করে?
ডুব দিয়ে দিয়ে মাচ ধরে।"

এই বলিয়া একজন দিদী ছোট ভাইকে আদর করিতেছে; দেখিলে কি চোক্ জুড়ায় না?

বালকের বিশ্বাস।

যাহারা সৈনিকের কাজ করে, তাহাদের যে কত সময় কত বিপদাপদের মধ্যে পড়িতে হয়, তাহা তোমরা বোধ হয় জান না। যুদ্ধ করিতে গিয়া হয়ত প্রাণ গেল, না হয় এমন একটা শক্ত আঘাত লাগিল, যে চিরকালের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিতে হইল; এই তো সৈনিকের দশা। তার মধ্যে যে বিবাহ করে নাই, বা বুড়ো মা বাপ নাই, তার তবু মরিয়াও সুখ, কিন্তু যার পরিবারে বুড়ো মা বাপ, কি স্ত্রীপুত্র আছেন, যে মরিয়া গেলে ইহাঁদের কি দশা হইবে, তাহা ভাবিবার লোক নাই, তাহার কত কষ্টের অবস্থা ভাবিয়া দেখ দেখি। কয়েক বৎসর গত হইল, কোন দেশে এইরূপ একজন সৈনিকের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রী একটী ছেলে এবং একটী মেয়েকে লইয়া যে কি কষ্টে পড়িলেন, তাহা বলিতে দুঃখ হয়। হাজার হউক, মায়ের প্রাণ! নিজে না খাইয়াও সৈনিকের স্ত্রী ছেলে মেয়েদের খাওয়াইতেন, কিন্তু তাহাতেও বাছাদের পেট ভরিয়া খাওয়া যুটিত না। বালিকার বয়স ৮ বৎসর

এবং ছেলেটীর বয়স ৬ বৎসর মাত্র, সুতরাং তারাই বা তাদের দুঃখিনী মায়ের কি সাহায্য করিবে? অতি সামান্য অবস্থায়, গৃহস্থ বাড়ীতে চাকরাণীর মত থাকিয়া দুঃখিনী মা কিছু কিছু রোজগার করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে সামান্য টাকায় কি তিনটী প্রাণীর দিন চলে? মা ছেলেদের লুকাইয়া কখনও উপোষ করিতেন, কখনও বা ছেলেরা "মা তুমি খাও না!" বলিয়া পীড়াপীড়ি করিলে আধ-পেটা খাইতেন। এরূপ কষ্টে শরীর কদিন থাকে? অভাগিনী অল্প দিনের মধ্যেই ভয়ানক ব্যারামে পড়িলেন। তখন ছেলেটী মেয়েটীর কি কষ্ট! যে গৃহস্থ বাড়ীতে তাহাদের মা চাকরী করিতেন, বালিকাটী তাহার ভাইকে লইয়া মাঝে মাঝে সেই বাড়ীতে যাইত, তখন বাড়ীর গৃহস্থ প্রায়ই তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দিতেন। কিন্তু সব দিনতো আর এরূপ যুটিত না! কাজেই তাহারাও উপোষ করিতে শিখিতে লাগিল।

এ দিকে মা বিছানায় পড়িয়াও মেয়েটীকে শান্ত করিতেন; একদিন তিনি বলিলেন—"ভয় কি বাছা! আমি যদি মরি, ঈশ্বর তোমাদের দেখিবেন।"

বালিকা বলিল—"মা! তিনি কোথায়? তিনি কি আমাদের কোন কথা শুনিতে পান?"

মা উপর দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—"দেখ মা! তিনি স্বর্গে। তাঁর কাছে কষ্টে পড়িয়া যে যা চায়, তিনি তাই দেন। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তিনি তা নিশ্চয়ই করিবেন।"

বালিকা চুপ করিয়া শুনিল; তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; মায়ের কথায় তার মন বসিল না—মা মরিয়া গেলে কি হবে, পরমেশ্বর দুঃখ দূর করিবেন কি না, এই ভাবনায় তার মন বড় অস্থির হইল।

এ দিকে বালকটী ঈশ্বরের কথা শুনিয়া শুনিয়া মনে ভাবিল—"বাঃ, তবে কেন ঈশ্বরকে বলে পাঠাই না, যে আমাদের বড় কষ্ট।" কিন্তু ঈশ্বরের কাছে কে খবর লইয়া যাইবে? বালক তাহাও ঠিক করিল। ঈশ্বর অনেক উচুতে থাকেন, সেখানে মানুষ যাইতে পারে না, কিন্তু একখানি ঘুড়িতে আমাদের কষ্টের কথা লিখিয়া কেন পাঠাইয়া দিই না! বালক তাহাই করিল। আপনার ঘুড়ি বাহির করিয়া বালক তাহাতে এই কথাগুলি লিখিল——

"পরমেশ্বর! মা বলেছে লোকে কষ্টে পড়লে, তার যা দরকার, তুমি তাকে তা দিয়ে থাক। মা ব্যারামে বড় কষ্ট পাচ্ছে, আর আমরা খেতে পাই না। মায়ের জন্য ওষুধ পাঠিয়ে দিও, আর আমাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য টাকা দিও।"

বালক এই ঘুড়ি লইয়া মাঠে গেল। লম্বা সুতো যুড়িয়া সুন্দর বাতাসে ছাড়িয়া দিতে দিতে ঘুড়ি সমস্ত সুতো লইয়া অনেক উপরে উঠিয়া গেল। তখন বালক একটা গাছের সঙ্গে সুতো বাঁধিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীর দিকে ছুটিল। বালকের এই ভাবিয়া মনে আনন্দ হইল যে যখন ঈশ্বরের কাছে কষ্টের কথা জানাইয়াছি, তখন আমাদের আর কষ্ট থাকিবে না!

যখন বালক বাড়ীর দিকে ছুটিতেছিল, তখন একজন ধর্ম্মপ্রচারক অর্থাৎ পাদ্রী সেই দিকে যাইতেছিলেন। তিনি বালকটীকে ঘুড়ি বাঁধিয়া ছুটিতে দেখিয়া, তাহাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে! তুমি গাছে সুতো বাঁধিয়া কোথায় ছুটিতেছ? তোমাদের বাড়ী কোথায়?" বালক বলিল,—"আমাদের বাড়ী ওই দেখা যায়। ঘুড়িতে কি আছে তা বল'ব না।" এই বলিয়াই বালক ছুটিল। ধর্ম্মপ্রচারক কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গাছের তলায় গেলেন এবং ঘুড়ি নামাইয়া তাহাতে কি লেখা আছে, তাহা পড়িয়া দেখিলেন। লেখাগুলি পড়িয়া ভদ্রলোকের মনে যে কি ভাব হইল, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। বালকের বিশ্বাস দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন; তাঁহার মনে হইল

যেন এ বালকের দুঃখ ভগবান রাখিবেন না। ইহার পর ঘুড়িখানি হাতে করিয়া তিনি আপনার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

পাদ্রী প্রায় রোজই অনেকগুলি লোককে একত্র করিয়া উপদেশ দিতেন; এই লোকগুলি তাঁহার নিতান্ত বাধ্য ছিল। যে দিন তিনি এই ঘুড়ির কাণ্ড দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পরের দিনই সকলের নিকট এই আশ্চর্য্য কথা বলিলেন। সকলে শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। "আহা! এমন বিশ্বাসী যে বালক তাহার যেন কোন কষ্ট পাইতে না হয়"—এই কথাগুলি যেন পরমেশ্বর নিজে সকলের মনে তুলিয়া দিলেন। তখনি সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোক ও তাঁহার ছেলে মেয়ের জন্য টাকা উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাদ্রীর নিকটে শত শত টাকা জমিয়া গেল। বিকাল বেলা সেই টাকা লইয়া তিনি নিজে বালকের বাড়ীতে গেলেন।

এ দিকে বালক বাড়ীতে আসিয়া, মায়ের কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে অথচ পরমেশ্বর কষ্ট দূর করিবেন, এই ভাবনায় হাসিতে হাসিতে, হাসি কান্নায় মিশাইয়া মাকে বলিল,—"মা! পরমেশ্বরকে ব'লে পাঠিয়েছি; তিনি সব দেবেন।" মা বালকের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। সে রাত্রি গেল, পরের দিনও শেষ হয় হয়, এমন সময় ধর্ম্মপ্রচারক টাকা লইয়া সেইখানে আসিলেন। বালক ঠিক বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিল পরমেশ্বর নিশ্চয়ই সাহায্য পাঠাইবেন; পাদ্রীকে দেখিয়া বুঝিল ঐ সাহায্য আসিয়াছে। পাদ্রী নিকটে আসিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা! তোমার কথা পরমেশ্বর শুনেছেন; তিনি আমাকে দিয়ে এই টাকা পাঠিয়েছেন; আর তোমাদের কোন কষ্ট থাকবে না। এখনই তোমার মায়ের জন্য ওষুধ আসিবে।" এই বলিয়া ধর্ম্মপ্রচারক একজন ভাল ডাক্তারকে দেখাইয়া, তাহার মায়ের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন. এবং বালক বালিকাদিগের খাওয়া পরা ও লেখা পড়ার সুবিধা করিয়া দিলেন। অভাগিনী মা ভাল চিকিৎসার গুণে শীঘ্রই ভাল হইলেন; বালক বালিকারাও বেশ লেখা পড়া শিখিতে লাগিল। এ দিকে দেশের রাজাও তাঁহারই একজন মৃত সৈনিকের পরিবারের এরূপ দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, হুকুম করিলেন যে প্রত্যেক মাসে যেন কিছু কিছু টাকা তাঁহাদের দেওয়া হয়। সকল দিকেই সুবিধা হইয়া গেল। ধর্ম্মপথে থাকিলে, ঈশ্বর কখনও মন্দ করিবেন না, এই ভাবনাটী প্রাণে গাঁথিয়া, সেই পরিবারের দুঃখ চিরদিনের মত ঘুচিয়া গেল।

বাঁদরের বাঁদরামি।

১

একজন বড় লোকের একটী ভয়ানক তেজাল ঘোড়া ছিল। সেটা কাকেও পিঠে চড়িতে দিত না। কর্ত্তা ঘোড়াটীকে লইয়া কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে তাঁহার একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, "পোষা বাঁদরটার হাতে চাবুক দিয়া ঘোড়ার উপরে তুলে দাও।" তাহাই করা হইল। ঘোড়াটা প্রথমে বড়ই অপমান বোধ করিয়া একবার সুমুখের পা, একবার পেছনের পা তুলিয়া বাঁদরটাকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। এদিকে হনুমানের পো শক্ত হয়ে বসিয়া সপাং সপাং করিয়া চাবুক মারিতে লাগিল। মার খাইয়া ঘোড়াটা নক্ষত্রের মত ছুটিল, একবার মাঠে, একবার রাস্তায়, একবার বাগানে, একবার জঙ্গলে, কখন শুইয়া পড়িয়া, কখন হঠাৎ দাঁড়াইয়া, কখন গাছের সহিত গা ঘসিয়া, নানা রকম ফিকিরে বাঁদরটাকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বাঁদর কি যে আসন লইয়া বসিয়াছে, কোন মতেই পড়ে না। এদিকে

দৌড়িয়া দৌড়িয়া ঘোড়ার মুখে গাঁজা উঠিতে লাগিল, জিব বাহির হইয়া পড়িল, তখন আর কি করে, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া আপনার আস্তাবলে ঢুকিয়া গেল। বানর তখন পিঠ হইতে লাফাইয়া পলাইল। সেই অবধি সে আস্তাবলে এই ঘোড়ার মত ঠাণ্ডা শান্ত ঘোড়া আর ছিল না।

২

একবার এক জাহাজে দুটী বাঁদর ছিল। তাহার মধ্যে একটা পুরুষ, আর একটী মাদী। জাহাজের লোকেরা পুরুষটাকে খুব যত্ন করিত, কিন্তু যাই মাদীটাকে কেহ কেহ একটু আদর করিত, অমনি পুরুষটা মাদীটার উপর অত্যাচার করিত। এইরূপে অনেক দিন মাদীটা চুপ করিয়া আছে—(আর কিই বা করিবে? সব জাতিতেই মেয়েদের প্রতি অত্যাচার হয়, আর সবার সঙ্গেই বেচারিরা চুপ করিয়া সহ্য করে)—এমন সময় একদিন পুরুষ বাঁদরটার একেবারে ভয়ানক "চোখ টাটাইয়া" উঠিল। সে মাদীটাকে ডাকিয়া অনেক আদর করিয়া জাহাজের মাস্তুলের উপরে লইয়া গেল, এবং যেন কতই ভাল বাসে, এই ভাবে আদর করিয়া সমুদ্রের মধ্যে নানারূপ জিনিষ দেখাইতে লাগিল। অবশেষে, যাই মাদীটা একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে, পুরুষটা অমনি তাহাকে এক ধাক্কা মারিয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিল। বেচারী ডুবিয়া মরিল; আর পুরুষটা, জাহাজের সমস্ত লোকের আদর একলা পাইবে, এই আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে নামিয়া আসিল।

আমাদিগের পুরস্কার।

আমরা এই বর্ষে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

১। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাঁহারা উত্তর দিবেন, তাঁহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম হওয়া আবশ্যক।

২। ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বা বালিকা যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। রং বা পেন্‌সিলে, যিনি যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা চিত্র করিতে পারিবেন। আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

৩। আমরা রচনা বিষয়ে তিনটী পুরস্কার দিব;—(ক) ৮ থেকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য; (খ) ১১ থেকে ১৩ বৎসরের পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য; এবং (গ) ১৪ থেকে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য। প্রত্যেক শ্রেণীর রচনার বিষয় এই:——

(ক) "একটী ছোট ছেলে মাকে বেশী ভালবাসে, না আপনার খেলানাকে বেশী ভালবাসে!" এই বিষয়ে গদ্য রচনা।

(খ) "একটী ছোট মেয়ে মরে গেছে, তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন," এই বিষয়ে ৩০ লাইনের মধ্যে একটী পদ্য রচনা।

(গ) "কাক ডাকিতেছে জলের মধ্যে তালগাছ, ঘোড়া ছুটিয়া গেল, ছোট খুঁকী কাঁদিয়া উঠিল, বাঘের ভয়, শিয়ালের বাচ্ছা, কি সর্ব্বনাশ! জামা যোড়া, বড়লোক, সাহসী পুরুষ, হৈহৈ শব্দ, শিকারী।" এই কথাগুলি বজায় রাখিয়া এবং ভাব ঠিক রাখিয়া একটী অর্থসংলগ্ন গদ্য রচনা। যত ইচ্ছা নূতন কথা বসাইতে পারিবে, কিন্তু রচনাটী ২০ লাইনের চেয়ে লম্বা হইবে না।

এই রচনাগুলি আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছা আবশ্যক। আর এক মাস সবে সময় আছে; এর মধ্যেই সকলে পাঠাইবেন। প্রত্যেক রচনাতে স্কুলের শিক্ষক বা কোন কর্ত্তা ব্যক্তির স্বাক্ষর চাই, তিনি লিখিয়া দিবেন যে বালক বা বালিকা নিজে এই রচনাটী করিয়াছে।

সংবাদ।

বরাহনগর হইতে বাবু কৃষ্ণবন্ধু সান্ন্যাল লিখিয়াছেন—"আমাদের একটী বন্ধু ধূমপান পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিবেন, এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে দণ্ড স্বরূপ দশ টাকা দিবেন, বলিয়াছিলাম; আজ অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে তিনি জানুয়ারি মাস হইতেই ধূমপান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সভার সভ্য হইয়াছেন। তিনি ইহার দ্বারা আমাদিগকে যারপর নাই উৎসাহিত করিয়াছেন।" সুখের কথা সন্দেহ নাই, তবে এরূপ ভাল কাজে নিজের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য টাকা 'বাজি' রাখা ভাল নহে। তুষের আগুনের মত প্রতিজ্ঞা ভিতরে জ্বালবে, লোকে সেই প্রতিজ্ঞার কাজ দেখিবে, কিন্তু বাহিরে জাক জমক দেখাইয়া লাভ কি?

তেলিনীপাড়া গ্রাম হইতে সংবাদ পাইলাম যে, সেখানকার বালকেরা ৪০।৫০ জন একসঙ্গে মিশিয়া নিজেদের সব রকমের উন্নতির জন্য "বালক মিলনী" নামে একটী সভা করিয়াছেন। আমাদিগের কয়েকজন বন্ধু প্রতি সপ্তাহে এই বালক দিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহা বড় সুখের কথা। বালকগণ এইরূপে এক সঙ্গে মিশিয়া সকলের চেষ্টায় কাজ না করিলে তো তাহাদের পরে সৎ ও বড়লোক হইবার উপায় দেখি না। আমরা আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা অধিক বয়স্ক, তাঁহারা নিজেদের জন্য এবং ছোট বালক বালিকাদিগের জন্য স্থানে স্থানে এইরূপ যত্ন করিবেন। নিজেদের যত্ন থাকিলেই ঈশ্বর সহায় হন।

আমরা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, যে আমাদের একজন গ্রাহিকা—কুমারী লীলাবতী সেন ওলাউঠা রোগে মারা পড়িয়াছেন। বাপের আদরের ধন, ও তাঁহার প্রাণের আশার বস্তু বাপকে দুঃখের সাগরে ডুবাইয়া গিয়াছে। বাপের যে কি কষ্ট, তাহা ভাবিতেও আমাদের কষ্ট হয়। পরমেশ্বর তাঁহাকে এই শোকের সময় শান্ত করুন।

ধাঁধা।

গতবারের প্রশ্ন গুলির উত্তর।

১। কল্য। ২। ২৮ জন। ৩। ভগবান।

নূতন।

১। নিম্নলিখিত কথা গুলিতে যে যে স্থানের নাম লুকাইয়া আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করতো:—

(ক) তোমার কায মুনাসেফ হইলে টাকা দিব; আগে দিব না।

(খ) এক জন চাষা গান করিতেছিল—"গেঁটে কল্‌কে, তামাক খর্‌সান; খেতে খেতে যায় গো পরাণ।"

(গ) একটা জমীদারী নিলাম হইতেছিল; এক সাহেব কিনিল। দুর্গাচরণ লাহা এবং সাগর দত্ত কিনিতে গিয়া হারিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া পাশের একজন লোক বলিয়া উঠিল, "এ লাহা বা দত্তের কর্ম্ম নয়; এর নাম সাহেব!"

(ঘ) আমি আর দাঁড়াতে পারি না, হিঃ হি! মা, চলতো চল; না হয় আমি তোমায় ফেলে বাড়ী যাই।

২। আমার প্রথম খণ্ড দেবতাদের রাজা; দ্বিতীয় খণ্ড চওড়া। এক সঙ্গে একটী সেকেলে রাজ্য, যেখানে দ্বাপর যুগে ভয়ানক—যাক্ আর বল'ব না! বলতো কি?

৩। "কেরেও পাখীর বাছা! ডালেতে আমার!
দেও পরিচয়।"
শুনি পাখী ডেকে বলে—"জাননা আমায়?
তবে, শোন, মহাশয়!
প্রথম আমার সদা কোলে বসি রয়
যেন, আদুরে গোপাল!
দ্বিতীয় খাইতে সাধ কারো নাহি হয়
সুধু, বোকার কপাল!
গুরু হাতে তার পিঠে পড়ে যেন তাল!"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

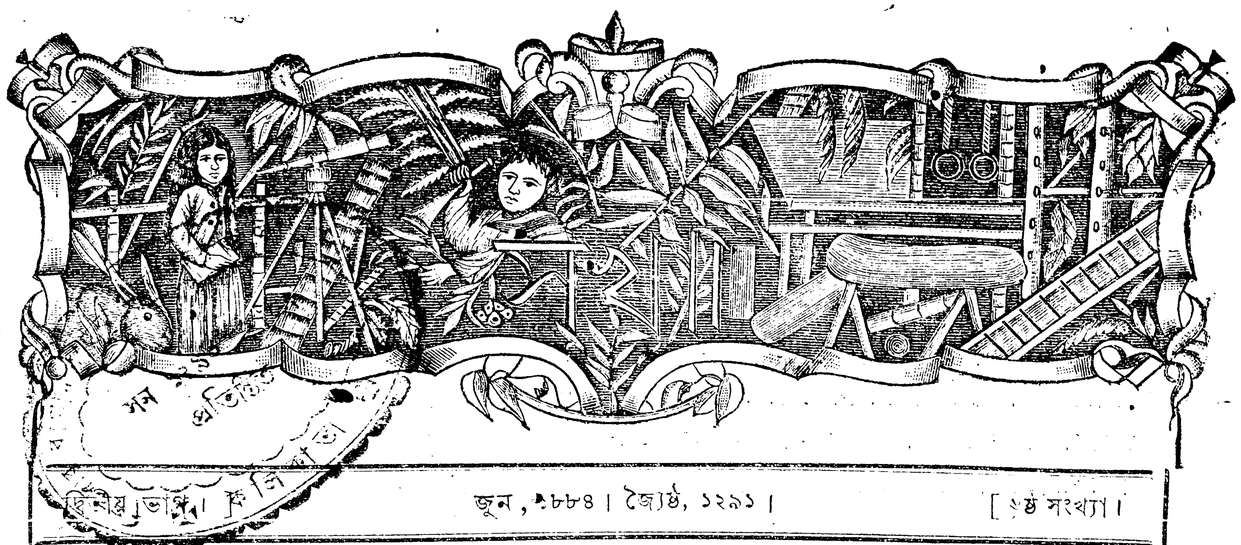

জুন, ১৮৮৪। জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

'সখা' পড়িবার কয়েকটী নিয়ম।

আমাদের একটী বড় দুঃখ হয় যে "সখা"র আমাদের যে সকল পাঠক পাঠিকা আছেন তাঁহারা সকলে ভাল করিয়া "সখা" পড়িতে জানেন না। অনেকেই স্কুলের পড়া লইয়া ব্যস্ত থাকেন, "সখা"কে নূতন বেলা একবার তাড়াতাড়ি পাঠ করিয়াই তুলিয়া রাখেন, পরে প্রায় সমস্তই ভুলিয়া যান, সুতরাং আমরা যে এত কষ্ট করিয়া সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া ভাল ভাল কথাগুলি লিখিয়া দিই তাহা বৃথায় যায়, আর তাঁরাও যে বাৎসরিক টাকাটী দেন তাহারও ভাল ব্যবহার হয় না, এজন্য অনেকে আপনাদের কোন বিশেষ উপকার না দেখিয়া "সখা" লওয়া বন্ধ করেন। এইরূপে আমাদের নানা প্রকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই অদ্য আমরা কিরূপে পড়িতে হয় তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব;—আশা করি প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা মন দিয়া এইটী পাঠ করিয়া স্মরণ রাখেন ও এই কথা অনুসারে চলেন। তাহা হইলেই আমাদেরও শ্রম সার্থক হয়, তাঁহাদেরও অর্থ ব্যয় সফল হয়।

"সখা"তে যে সকল বিষয় সচরাচর লেখা হয় তাহাদিগকে প্রায় এই কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়:—(১ম) গল্প, যথা "ভীমের কপাল" "সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়," "অন্ধ সীলের কথা" ইত্যাদি। (২য়) উপদেশ—যথা "কে বড়লোক," "ধূম পান," "না আমি প্রতারণা করিব না" ইত্যাদি। (৩য়) বর্ণনা,—যথা "আলোক-মঞ্চ," "কেন্দ্রীয় ঊষা," "শ্বেত ভল্লুক" প্রভৃতি। (৪র্থ) বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নূতন শিক্ষা, যথা "ঠাকুরদাদার গল্প" ইত্যাদি। (৫) জীবন চরিত,—যথা "হেয়ার সাহেব," "কেশবচন্দ্র সেন," "গারফীল্‌ড্", ইত্যাদি। (৬) পদ্য যথা "আঃ ছেড়ে দাওনা", "ওরে আমার পায়রা মণি" "কওনা কথা কাকাতুয়া" প্রভৃতি। (৭ম) ধাঁধা (৮) অন্যান্য। এগুলির মধ্যে প্রথম জাতীয় গল্পগুলি খুব মন দিয়া পড়িবে, আর মনে করিয়া দেখিবে পূর্ব্বে কি হইয়াছে। যদি ভুলিয়া গিয়া থাক, তবে আবার পড়িয়া দেখিবে। এই রকম করিয়া পড়িলে খুব মনে থাকে। ঠিক যেন গল্প শুনিতেছ, আর "সখা" পড়া হইয়া গেলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিকট গিয়া আবার আবার পড়িয়া শুনাইবে। কোথাওবা ভীমের কপাল প্রভৃতি গল্পগুলি মা কি ঠাকুরমাদিগকে মুখে শুনাইবে। এরূপ করিলে আর ভুলিয়া যাইবে না। সর্ব্বদা চর্চ্চা করিবে। (২য়তঃ) উপদেশগুলি মনের সহিত পড়িবে, পড়িয়া মনে মনে ভাবিয়া দেখিবে

তোমাদের চরিত্রে সেপ্রকার কোন দোষ আছে কি না? যদি থাকে তবে তখনই অবধি তাহা দূর করিতে যত্নবান হইবে, এবং যত দিন না তাহাতে সফল হও ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিবে না। কিছুতেই না পার তবে কোন বন্ধুর কাছে প্রকাশ করিয়া বলিবে কিম্বা আমাদিগকে লিখিবে,—আমরা বলিয়া দিব কিরূপ করিলে সে দোষের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু খুব সাবধান, যে উপদেশ পড়িয়া বা শুনিয়াও নিজের দোষ তাড়াইতে যত্ন না করে তাহার পরকালের মাথা একেবারে খাওয়া হইয়া যায়। তাহার লক্ষ টাকা আয় হলেও সে পরম বিদ্বান হলেও তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই, সে পশু। (৪র্থতঃ) বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল নূতন কথা শিক্ষা করিবে, সেগুলি প্রায়ই শক্ত, সহজে বুঝিতে হয়ত পারিবে না, এজন্য তোমার নিজের চেষ্টার পরে দাদার বা শিক্ষকের নিকট বসিয়া পড়িবে ও বুঝাইয়া লইবে। বৃষ্টির কথা পড়িলে, বৃষ্টির সময় সেই কথাটী আবার ভাবিবে, মনে না থাকিলে আবার পড়িবে। এইরূপে সমস্ত বিষয় যাহা শিখিয়াছ তাহা যেন মুখাগ্রে থাকে; যখনই ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিলেই সব বলিতে পারিবে, এমন হওয়া চাই। (৫মতঃ) ভাল ভাল যে সকল জীবন চরিত লেখা হয় সেগুলি এমন ভাবে রাখিবে যেন তোমরাও ঐরূপ বড়লোক হইতে পার। কত লোক সামান্য অবস্থা হইতে কেমন উন্নত হইয়া বিখ্যাত বড়লোক হইয়াছেন, দেখিয়া যেন তোমাদের সকলেরই মনে মনে লোভ হয়, আশা হয়। ঐরূপ হইতে দিন রাত্রি মনে ভাবিবে, কিরূপে "আমি ঐরূপ হইব;" তাহা হইলে আর অন্যায় কার্য্যে মন যাবে না, বৃথা সময় নষ্ট করা হইবে না, পড়াতে মন খুব হবে। কাজেই শেষে বড় লোক ত আপনিই হইতে পারিবে। বড় লোক ত আর গাছে ফলে না, কারও অদৃষ্টে লেখাও থাকে না! বাল্যকাল হইতে এইরূপ যত্ন করিলে প্রত্যেক মানুষই বড় লোক হইতে পারে।

(৬ষ্ঠতঃ) পদ্য। এগুলি বার বার না পড়িয়া কি থাকা যায়? এগুলি একবার পড়িবে যে তোমাদের মুখস্থ হইয়া যাইবে। আর যাঁহার কুকুর আছে তিনি যেন কুকুটীর সঙ্গে তেমনি করিয়া কথা কন:— "আঃ! ছেড়ে দাওনা" ইত্যাদি। যাঁহার পায়রা আছে, তিনি তাহাকে হাতে করিয়া "ওরে আমার পায়রা মণি" বলিয়া আদর করিবেন। তাহলে দেখিতে শুনিতেও মিষ্ট ও মধুর লাগে, আর পদ্যটীও মুখস্থ হয়। যাঁহার কাকাতুয়া পাখী আছে, তিনি অমনি তাহাকে আদর করিবেন। (৭মতঃ) শিশু স্বাস্থ্যরক্ষাতে যে যে বিষয়গুলি লেখা থাকে, তাহা একজন বিদ্বান লোকের লেখা, অতএব তোমরা সকলেই তাঁহার সে অমূল্য সদুপদেশ খুব মন দিয়া পড়িবে এবং খুব সাবধান হইয়া প্রতিপালন করিবে। একটুও অন্যথা না হয়, কেন না তাহা হইলেই শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা। যখনই কাহাকেও ঐ সকল সুনিয়মের বিপরীত কার্য্য করিতে দেখিবে, অমনি যেন সুবোধ পাঠক পাঠিকা "সখা" খানি খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে দেখান ও তাঁহাকে ঐ কুব্যবহার হইতে নিবারণের চেষ্টা পান। (৮মতঃ) ধাঁধাগুলি লেখা কেবল বালক বালিকাদিগের বুদ্ধির চালনার জন্য। ২দিন, ৪দিন, যত দিনে হয়, চেষ্টা করিয়া তাঁহারা যেন স্বয়ং এই গুলির উত্তর দিতে যত্নবান হন। কাহারও নিকট বলিয়া লইলে কোন ফলই হয় না। নিজেরা চেষ্টা করিতে করিতে শেষে এমন হইবে যে আর কষ্ট হইবে না স্বভাবতঃই সহজে উত্তর হইয়া যাইবে ও সে জন্য কত যে বুদ্ধির উপকার হইবে তাহা পরে তাঁহারা জানিতে পারিবেন। (৯মতঃ) অন্যান্য অনেক বিষয় যাহা থাকে তাহা পাঠকগণ নিজেদের বুদ্ধির অনুসারে সাবধান হইয়া যত্ন পূর্ব্বক পড়িবেন। কিছুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিবেন না।

শেষকালে একটী কথা বলি। আমরা যে "সখা" লিখি, ইহার উদ্দেশ্য কি? বড় মানুষ হওয়া? ছিঃ! কেহ যেন এরূপ মনে না করেন। বরং ইহাতে আমাদের বিস্তর ক্ষতিই হইতেছে; গ্রাহক সংখ্যা কম হওয়াতে, যতদিন না গ্রাহক বাড়িতেছে ততদিন "সখা" নিজের ভরণপোষণের ভার নিজে বহন করিতে পারিবে না। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় "সখা"র বেশ আয় হয়, তখন "সখা"র টাকা "সখা"রই প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের উন্নতি ও মঙ্গল কামনায় ব্যয় করিব।

আমাদের উদ্দেশ্য আমরা অতি মহৎ জানি। ছোট ছেলে মেয়েদের আমরা বড় ভাল বাসি; তাঁহাদের কল্যাণ করিব ইহাই আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছা। ছোট ছেলে মেয়েরাই এর পরে দেশের লোক হইবেন, ইহাঁদের উন্নতি করিতে পারিলেই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি করা হইল। এই জন্যই আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে সকল বালকের প্রকৃত সখা ও বন্ধু হইয়া রাতদিন তাঁহাদের সকলের সঙ্গে থাকিয়া সুশিক্ষা দিই ও বড় লোক করি। কিন্তু তাহা অসম্ভব। এজন্য আমাদের পরিবর্ত্তে এই "সখা"কে তাঁহাদের নিকট পাঠাইতেছি, ভরসা করি যে সকলে ইহাকে আদর ও যত্ন করিয়া ইহার কথাগুলি মন দিয়া পড়িবেন ও তাহার বাধ্য হইয়া চলিবেন। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা যে "সখা" সকলের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকে। যখনই স্কুলের পড়া হইয়া গেল কোন আলাপী লোকের কাছে গিয়া গল্প সল্প করিতে ইচ্ছা হইল, অমনি যেন সকলে "সখা" খুলিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া আমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করেন। "সখা" যেন সকলেরই খেলায় খেলানী, পড়ায় শিক্ষক, গল্পে বন্ধু, উপদেশে গুরু, হইয়া ইহার কাজ করিতে পারে। ভাই! ভগিনি! "সখার" এমহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার তোমরাই উপায়, ইহা সম্পূর্ণ তোমাদেরই হাতে। তোমরা সকলে যদি ভাল করিয়া "সখা" পড় তবেই সেই কাজ ভাল করিয়া করা হয়, আর না হইলে বৃথা কষ্ট, বৃথা ব্যয়;—শেষে "সখা" মৃত্যু মুখে পড়িবে! পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি তাহাই চাও?

ভাল লাগে না!

ভাল লাগে না, এ রোগের ঔষধ কি তোমরা কেউ জান? কি আশ্চর্য্য কথা! "ভাল লাগে না" বলে কি একটা ব্যারাম আছে নাকি? তবেতো তার পরিচয়টা ভাল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সকলেরই এমন এক একটা সময় আসে, যখন মানুষ মুখ ভার করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকে অথবা ঘুরিয়া বেড়ায়, কোন কাজ করিতে ভাল লাগে না। কি যে ভাবে, তার ঠিক নাই, কি যে চায়, তার খোঁজ নাই, অথচ কিছু চাই। এই সময়ে পড়িতে ভাল লাগে না, কাজ করিতে ভাল লাগে না। পাঠক পাঠিকাগণ! এ রকম "ভাল লাগে না" ব্যারাম কি কখনও কাহারও হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিয়া থাকিবেন, এ কেমন বিশ্রী ব্যারাম।

একটী বালক অথবা বালিকা দিব্যি পড়া শুনা করিতেছিল, দিব্যি কাজ কর্ম্ম করিতেছিল, হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে তাহাকে "ভাল লাগে না" ব্যারামে ধরিল। আর সে বালক বা বালিকা হাসে না, আর সে কাজ কর্ম্ম বা লেখা পড়ার দিকে মন দিতে চায় না, মুখ ফুলাইয়া কামারের হাপরের মত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে বসিয়া গেল। কে যেন হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। একি দায়? ডাক্তার, কবিরাজ, কেহই এ রোগের ঔষধ বলিতে পারিল না।

তবে কি এ রোগের কোন ঔষধ নাই? অবশ্যই আছে। যাক্, সে ঔষধের কথা বলিবার আগে ব্যারামের পরিচয়টা আর একটু পরিষ্কার

করিয়া দিতেছি। যেমন জ্বর কাহারও অল্প হয়, কাহারও বা ভয়ানক হয়, তেমনি এই ব্যারাম কাহারও অল্প হয়, কারো বা খুব বেশী হয়। "কোন একটা বিষয় ভাল লাগে না" এই হ'ল অল্প ব্যারাম, এবং "কিছুই ভাল লাগে না" এটা শক্ত ব্যারাম। এই দুই রকম ব্যারামই ছেলে মেয়েদের হইয়া থাকে। এখন ওষুধ কোথায় পাই?

ছোট ব্যারামটার ঔষধ "চেষ্টা ও যত্ন"। যদি মনে মনে ঠিক মনস্থ করিয়া থাকি, যাহা ভাল লাগে না, তাহাকে ভাল লাগাইতেই হইবে, যাহার দিকে মন যাইতে চায় না, সেই দিকেই মনকে চালাইতে হইবে, তাহা হইলে ঈশ্বরের দয়ায় এ ব্যারাম আরাম হইতে পারে। শক্ত ব্যারামটা আরাম করা সহজও বটে, শক্তও বটে; যে রকম ওষুধ দেওয়া হয়, তারি উপরে নির্ভর করে। যদি ঠিক ঔষধটী পড়িল দেখিতে দেখিতে আরাম হইয়া গেল; তাহা না হইলে কেবল কষ্টই সার। "কিছুই ভাল লাগে না" ব্যারামে বালক বা বালিকা এক পাশে মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় কর্ত্তা বা গৃহিণী আসিয়া তাড়া দিলেন, অথবা মিষ্ট কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন—ও রোগের এ ঔষধ নয়, ব্যারাম আরাম না হইয়া বরং বাড়িয়া চলিল। কিন্তু ঔষধ কোথায়? "প্রফুল্লতা এবং লোক সহবাস" এই রোগের চমৎকার ঔষধ। "লোক সহবাস" কাকে বলে জান কি? একলা থাকিলেই এ ব্যারামে ধরিয়া থাকে; সুতরাং ব্যারামে ধরিলে রোগীকে দশজনের মধ্যে লইয়া যাইবে—সেখানে দশজনের মুখে দশ রকম কথা শুনিয়া এবং দশ জনের সহিত কথা কহিয়া মন প্রফুল্ল হইবে, এবং কিছুকালের মধ্যেই ব্যারাম সারিয়া যাইবে। চুপি চুপি বসিয়া হিজি বিজি ছাই পাঁশ ভাবিলে, এ ব্যারাম খুব হইয়া থাকে; এই জন্য সাবধানে থাকিবে, মনকে কখন কাজের কথা ছাড়া অন্য বাজে কথা ভাবিতে দিও না, নিজের বশে রাখিয়া, তাহাকে এদিকে ওদিকে লাফাইয়া বেড়াইতে দিও না। এইরূপ করিলেই এ ব্যারামের ভয় কমিয়া যাইবে, মনে বল হইবে এবং সকল কাজেই উৎসাহ জন্মিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সহজে কি বড়লোক হওয় যায়?

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে সেই ছেলে দুটীর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। সেদিন রাত্রিতে এক বাজারে মুদীর দোকানে ছিলাম। তার পর ২ দিন ঐ ভাবে গেল। সারাদিন পথ চলিতাম; কেবল দুবেলা খাবার জন্য কোন মুদীর দোকানে উঠিতাম। রাত্রিতে কোন মুদীকে পয়সা দিয়া তাহার ঘরে থাকিবার যায়গা পাইতাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে থাকিবার জন্য আর মুদীর ঘর পাইলাম না। কাজেই একজন গৃহস্থের বাড়ী যাইতে হইল। গৃহস্থ যায়গা দিতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু খাওয়া শেষ হইলে "কড়া" "বগুণো" সব দেখাইয়া বলিলেন "কাল চলে যাবার আগে এই গুলো মেজে দিয়ে যেতে হবে। তুমি বাঙ্গালী তোমার এঁটো কে নেবে।" আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বলিলাম "ও গুলো আমি ছুঁই নাই। তবে আমি যা যা ছুঁয়েছি সে গুলো দাও, এখনি মেজে দিচ্ছি।" সুতরাং একখানা থালা, আর একটী বগুণো (বগুণোতে ডাল ছিল) আমার ঘাড়ে চাপিল। বাড়ীর কাছে একটা পুকুর দেখাইয়া দিল, আমি তথায় যাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া আনিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় লাগিল।

পরিশ্রমের পর সুনিদ্রা হইল। পরদিন গৃহস্থ ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইলেন। উঠিয়া দেখি সূর্য্য

উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি পুঁটলী হাতে করিয়া বাহির হইলাম। গৃহস্থের নিকট বিদায় লইবার সময় কা—যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন "একটা বড় মাঠ, তার পর একটা পাহাড়, তার পর কা—, একই পথ; ভুল হবার যো নাই।"

কিছুকাল হাঁটিয়াই মাঠে আসিলাম। সেখানে পথিকদিগের জন্য একটি ঘর আছে। তথায় একজনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সঙ্গে একটা ঘোড়া। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, "বেশ, চল। একজন সঙ্গীর জন্য বসিয়াছিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সঙ্গীর প্রয়োজন কি?" সে বলিল "তুমি আর কখনো এখানে চল নাই, একা গেলে খেয়ে ফেল্‌বে!" আমার ভয় হইল।

মাঠের এ পাশ থেকে ও পাশ দেখা যায় না। অতি কম চওড়া পথ; দশ বার হাত অন্তর ছোট ছোট বড় বড় খস্ খসের ঝোপ। জীব জন্তুর মধ্যে এক জাতীয় পাখী। পক্ষীটী একটী চড়াই অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, গায়ের রং সবুজ। ঠোঁট সরু এবং লম্বা; স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। ক্রমাগত একই রূপ শব্দ করিতেছে—"টিরিরিণ টিরিরিণ টিরিরিণ।" লেজে একটু নূতনত্ব আছে। লেজের মধ্যদেশ হইতে প্রায় দেড় ইঞ্চ লম্বা একটী সূচীর মত বাহির হইয়াছে। আমার সঙ্গী বলিল, "শ্বশুর বাড়ী যাইয়া ছুঁচ চুরি করেছিলেন। তাতেই ঐ শাস্তি।" অন্য কিছু না থাকাতে ঐ পাখীকেই বার বার ভাল করে দেখিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ চারিটার সময় ছোট একটী ঘর দেখিতে পাইলাম। সঙ্গী বলিলেন "আজ এখানেই থাকিতে হইবে।" আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম "চারটের সময়ই বসে থাকতে হবে কেন?" সঙ্গী বলিলেন "মাঠে রাত হলে বাঘে খাবে।" বাঘে খায় এরূপ আমার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং সে রাত্রির (!!) জন্য ঐ ঘরেই থাকিলাম। রাত্রিতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অনেক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে সব নাকি হাতীর শব্দ। সৌভাগ্য ক্রমে হস্তীগণ আমাদের কোন খবর লইতে আসিলেন না। কিন্তু পরদিন উঠিয়া দেখি ঘোড়াটী নাই। ঘোড়ার স্বামী অনেক আক্ষেপ করিলেন।

মাঠ পার হইতে প্রায় বারটা বাজিল। মাঠ যে যায়গায় শেষ হইয়াছে, সেখানেও দেখিলাম একটী ছোট ঘর। সেখানে আসিলে সঙ্গী বিদায় লইয়া অন্য পথে গেলেন। আমি আমার নির্দ্দিষ্ট পথে আস্তে আস্তে চলিলাম। কতদূর যাইয়া একটী মানুষকে পাইলাম,—সে হাতী লইয়া কা—চলিয়াছে। আমি চারি আনার পয়সা দিব বলাতে সে আমাকে তাহার হাতীর পিঠে একটুকু স্থান দিল। মহাসুখে কা— আসিলাম। কালিদাস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাইলামনা। রাত্রিতে একটী মুদীর দোকানে আসিয়া পরদিন ভোরে রওয়ানা হইলাম।

পথে যে সকল ছোট খাট ঘটনা হইয়াছিল তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তবে এক দিনের কথা বলা আবশ্যক। দুই প্রহরের পর আর মানুষের সাড়া শব্দ পাইলাম না। বেলা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল ততই ক্রমাগত নির্জ্জন স্থানে যাইয়া পড়িতে লাগিলাম, তারপর কেবল মাঠ; দুধারে ঊলুবন এবং অন্যান্য দু একটী ছোট ছোট গাছ। এরূপ যায়গায় সন্ধ্যা হইল। কি করি, কোথায় যাই! প্রাণ পণে দৌড়িতে লাগিলাম। পথ এত সংকীর্ণ যে দুপাশের গাছে গা লাগে। থাকিয়া থাকিয়া আমার বুক গুড় গুড় করিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় হটাৎ যেন পিঠে একটা কি লাগিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম একজন পাহাড়ে লোক। সে আমাকে কি এক রকম ভাষায় বলিল "তুই কোথা যাস্; তোর প্রাণের ভয় নাই।" এই বলিয়া সে আমাকে তাহার পিছু পিছু যাইতে সঙ্কেত করিল। আমি সহজেই তাহার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলাম। সে দু হাতে

উলুবন সরাইয়া শূয়ারের মত দৌড়িতে লাগিল আর মাঝে মাঝে আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল "আরে আয়, মরে যাবি।" আমি হত বুদ্ধি হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইরূপে চলিলাম বলিতে পারিনা। অবশেষে একটা বড় নদীর ধারে আসিলাম। সেখানে দেখিলাম আরো কয়েক জন লোক বসিয়া আছে। পাহাড়ী বলিল যতক্ষণ নৌকা আসিয়া ওপারে না যায়, ততক্ষণ এখানে বসে থাক্‌তে হবে। আমি তাহাদের সঙ্গে মাটিতে বসিলাম। অন্যান্য সকলে পুটলী হইতে খাবার খুলিয়া খাইতে লাগিল। পাহাড়ীর সঙ্গে কতকগুলি কমলালেবু ছিল; সে আমাকে তাহার খাবারটা খাইতে দিল। আমি তাহাই খাইয়া নাকে মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া সেই খানেই শুইয়া পড়িলাম। অন্যান্য লোকেরা আমাকে বলিতে লাগিল "ঘুমিও না, খেয়ে ফেল্‌বে।" তেমন অবস্থায় ঐ রূপ উপদেশ বাক্যের অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, কারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমায় গা অবশ হইয়া আসিতেছিল। এবং একটুকু পরেই অতি নিকটে "খ্যাঁওর, খ্যাঁওর" করিয়া বাঘ ডাকিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চারি পাশে দূরে নিকটে হিংস্র জন্তুর শব্দ হইতে লাগিল। সে রাত্রির কথা আমার জীবনে আর কখনও ভুলি নাই। নৌকাওয়ালা পারে বসিয়া সুখ ভোগ করিতেছে; সেখানে নৌকা বোঝাই না হইলে ফিরিয়া আসিবে না। সমস্ত রাত্রি আমাদের প্রাণ হাতে করিয়া সেই ভয়ানক স্থানে বসিয়া থাকিতে হইল। পর দিন নৌকা আসিলে আমরা ও পারে গেলাম।

ইহার ৩ দিন পরে বাড়ীর কাছের বাজারে আসিলাম। সেখানে দৈ চিড়ে সন্দেশ ইত্যাদি যাহা কিছু মনে হইল উদরস্থ করিয়া পথকষ্টের প্রতিহিংসা বিধান করিলাম। দু'টোর সময় বাড়ী আসিলাম। তখন বাহির বাটীতে কেহ ছিল না। গা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল; শীতে অস্থির হইয়া গেলাম। আসেপাশে যে কয়েকখানা লেপ কাঁথা ছিল উপর্য্যুপরি গায় দিয়া বিছানায় পড়িলাম। শক্ত জ্বর হইল। *

আমাদের দেশের বড়লোক।

রাজা রামমোহন রায়।

আজ কালি "ব্রাহ্ম" নামে যে একদল লোক ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা ও আন্দোলন করিতেছে, এ দেশে, বিলাতে, আমেরিকায়, সর্ব্বত্র যে দলের লোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—তাহাদের গোড়া কে জান? আগে যে আমাদের দেশের বিধবা স্ত্রীলোকেরা আপনাদের মৃত স্বামীর চিতাতে পুড়িয়া মরিতেন, সেই ভয়ানক "সহমরণ" প্রথাটী উঠাইয়া দিয়া আমাদের দেশের মহা উপকার করিয়া গিয়াছেন কে জান? আর এই যে আজ কাল হাজার হাজার ছেলে এণ্ট্রেন্স্, এলে, বিয়ে, এমে সব পাশ হইতেছে, আর ইংরাজী লেখা পড়া যে চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার গোড়া কে জান?—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। অনেক বৎসর গত হইল, অনেক শত বৎসরের মধ্যে তাঁহার মত বড়লোক আমাদের দেশে জন্মে না। অদ্য আমরা তাঁহার দুটী চারিটী কথা লিখিব, বালক বন্ধুগণ! মন দিয়া পড় এবং বুঝিয়া দেখ, তোমরাও মনে করিলে ঐরূপ বড়লোক হইতে পার। খালি একটা ভয়ানক "ইচ্ছা" দরকার, আর রীতিমত যত্ন।

এই মহাপুরুষ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা খুব বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা ছিলেন। অল্প বয়সে ইনি গ্রামের পাঠশালাতেই পড়িতেন। তখন বাঙ্গালা ভাষা এক রকম ছিল না বলিলেই হয়। দু চারখানা বাঙ্গালা পদ্য বই ভিন্ন আর বই ছিল না। রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করেন, বলিলেও ভুল হয় না। তার পরে পারশী ও আরবী শিখেন। তার পরে কাশীতে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। আরবী, পারশী ও সংস্কৃত তিনটী ভাষা—অতি কঠিন কঠিন তিনটী ভাষা—উৎকৃষ্টরূপ শিখিলেন;—কিন্তু শুনিয়া অবাক হও যে এখনও তাঁহার বয়স ১৬ বছর হয় নি!! তিনটী কঠিন ভাষায় যত প্রধান প্রধান বই তা সব পড়িলেন, ধর্ম্মবিষয়ে যা যা বই ছিল সব পড়িলেন, বই লিখিলেন পর্য্যন্ত, তবু এখনও ১৬ বছর! হবে না কেন? তিনি ত আর আমাদের মত পড়িতেন না? স্কুলে গিয়া ঝগড়া, বাড়ীতে খেলা ধূলা, বৈএর সঙ্গে সম্পর্ক নাই, তা ত আর তাঁর ছিল না? লেখা পড়া শিখিব, বড় বড় কাজ করিব, এই সব ইচ্ছা তাঁর মনের ভিতরে সদা সর্ব্বক্ষণ জ্বলিত। দিন রাত খালি পড়িতেন, কেবল পড়াতে যখন ক্লান্ত হইতেন তখনি বাহিরে যাইয়া খুব খেলিতেন, সে খেলাতে তাঁহার শরীরে এত তেজ হইয়াছিল যে একটা পাঁঠার যতটা মাংস হয় সমস্ত একা খাইতে পারিতেন, আর ৫০ বৎসর ক্রমাগত অসুরের মত খাটিয়াও একদিনের জন্য কাতর হন নাই। আমরা কেবল খাই আর গল্প করি বৈ ত নয়, আর দুষ্টমি! সমস্ত দিন আম গাছের তলায়। এমন করে সময়ের গলায় পা দিলে কি আর রামমোহন রায়ের মত বড় লোক হওয়া যায়, না লেখা পড়া শেখা যায়? ছি! ভাই বালকগণ! তোমরা যে যে বড়লোক হবে, যে যে খুব লেখা পড়া শিখিতে চাও, এখনি প্রতিজ্ঞা কর, সময় নষ্ট করিবে না; খুব পড়, দিন রাত পড়, আর খুব খেল; ২।১ ঘণ্টা খুব ছুটে বেড়াও, না হলে শরীর দুর্ব্বল হবে। খালি স্কুলের দুখানি বৈ পড়া হইলেই হবেনা, রাশি রাশি বৈ পড়িতে হবে। আশ্চর্য্য নহে, দেখ ১৬ বছরের মধ্যে বাঙ্গালা আরবী, পারশী ও সংস্কৃত ভাষার বড় বড় সব বৈ রামমোহন রায় পড়িয়াছিলেন, তোমরা পারিবেনা কেন?

তখন ইংরাজী শিক্ষা এত চলিত ছিলনা, কদাচ কোথাও কেহ ২।৪ টা ইংরাজী কথা কহিতে জানিত। সেই সবে মাত্র সাহেবেরা বাঙ্গালা দেশে রাজ্য আরম্ভ করিতেছেন বৈ ত নয়? তখন নবাবের আমল। কেবল পারশী আর আরবীই চলিত ছিল। এজন্য তখন তিনি ইংরাজী শিখেন নাই। অনেক বয়সে, চাকরী করিতে করিতে ইংরাজী শিখেন; তাও এমন শিখিলেন যে ভাল ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, বক্তৃতা ও দিতে পারিতেন। তার পরে শুনে অবাক্ হবে। কি ক্ষমতা? ইংরেজীতে বাইবেল পড়িলেন, কিন্তু সে কেবল তরজমা করা এজন্য তাঁহার ভাল লাগিলনা। তিনি তখনই উহার মূল বাইবেল পড়িবেন বলিয়া "গ্রীক্" ভাষা ও "হীব্রু" ভাষা শিখিলেন। এ দুটীও ভয়ানক শক্ত ভাষা। তবু তাঁহার ভয় নাই, খুব পরিশ্রম করিয়া অল্প দিনেই ঐ দুটী ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন ও তারপর আদি মূল বাইবেল পড়িয়া তবে ছাড়িলেন। ধন্য সাহস! ধন্য চেষ্টা! ধন্য পরিশ্রম! ধন্য মহত্ত্ব!

দেখ তোমরা একটা অঙ্ক কষিতে একবার না পারিলেই বুঝাইয়া লও, আর তিনি এতগুলি কঠিন ভাষা আপনি নিজের বলে শিখিয়া ফেলিলেন।

---

* এটি একটি সত্য গল্প। যে বাঙ্গালী বালকের কথা লেখা হইয়াছে, তাহার শেষে কি হইয়াছিল, সে কি কষ্টে মরিয়া গিয়াছিল সে কথা আমরা পরে বলিব। পাঠক পাঠিকা দেখিবেন, লেখা পড়া ছাড়িয়া কিম্বা কি করিতে হইবে, কোন্ কাজে যাইতে হইবে, কিছুই স্থির না করিয়া এলোমেলো ঘুরিয়া বেড়াইলেই মানুষ বড়লোক হইতে পারে না। আমরা এবার হইতেই আর একটি গল্প আরম্ভ করিলাম। গল্পটির নাম "চিরদিন কি দুঃখে যায়?"—এই সুন্দর গল্পটি একখানি ইংরাজী পুস্তক হইতে লওয়া হইয়াছে। গল্পটির প্রথম অধ্যায় এবারে দেওয়া গেল, ক্রমে ক্রমে সমস্তটা প্রকাশ করা যাইবে। সখা-সম্পাদক।

তোমরা হয়ত এর্তগুলি ভাষার নামও জাননা। দেখ দেখি, কেবল চেষ্টা ও ইচ্ছার জন্য মানুষে মানুষে কত প্রভেদ হয়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, চেষ্টা ও ছিল তিনি সকলের উপরে মস্ত লোক হইয়া গেলেন, আর তোমাদের ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা থাকিলেও চেষ্টা নাই, তাই—তোমরা বড়লোক হইতে পারিতেছনা, কেবল বৃথা পথে পথে বাগানে বাগানে যত নীচ প্রকৃতির ছেলেদের সঙ্গে বেড়াইয়া বেড়াইয়া তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করিতেছ। হায় হায়! ভাই, বুঝিয়া চল, এখনও মন দিয়া পড়, আপনার কাজে সময় দাও। যদি না জান, কিরূপে সময়ের সৎ ব্যবহার করা চাই, তবে এখনই তোমার গ্রামে যে উৎকৃষ্ট বালক বা যুবক, তাহার নিকট গিয়া বল কি করিবে জিজ্ঞাসা কর। পরে তাহার কথা মত চলিয়া দেখ, কি আছ আর কি হও।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের আরও অনেক অনেক চমৎকার বিষয় আছে, ক্রমে ক্রমে প্রিয় পাঠকদিগকে আমরা শুনাইব। কিন্তু এমনতর হাজার কথা শুনিলেও কিছু হবেনা, যদি তোমাদের মধ্যে ইচ্ছা না থাকে। যেমন কাঁচের পৃষ্ঠে পারা না থাকিলে তাহাতে চেহারা দেখা যায়না, তেমনি বালকের মধ্যে ইচ্ছা না থাকিলে তাহার বড় হওয়া অসম্ভব। বুঝিলে?

ঠাকুরদাদার গল্প।

আজ আবার নবীন বাবু সব বালকদিগকে লইয়া মাঠে গেলেন। এখন গ্রীষ্মকাল হিম পড়ে না, এ জন্য মন্মথ সেদিনকার প্রশ্নটী ভুলিয়া গেল। খেলা টেলা হইয়া গেলে সকলে এক সঙ্গে বসিলেন, গল্প আরম্ভ হইবে। ঠাকুরদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই মাঠের ও পারে কোন্ গ্রাম জান? কিশোরী বলিল "কৈথালি।" "তার পরে কোন্ গ্রাম?" আর কেহ বলিতে পারিল না। তখন মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল, "আরও কি গ্রাম আছে? গ্রাম কত গো?" নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন "বাস্তবিক, তোমরা কিছুই জান না, পৃথিবীতে যে কত গ্রাম আছে তাহা গোণা যায় না। ধর, এই সমস্ত ভারতবর্ষ একটী দেশ, ইহাতে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যদেশ, রাজপুতানা, নিজাম-রাজ্য, বিরার, প্রভৃতি কতগুলি প্রদেশ আছে। তাহার মধ্যে বাঙ্গালা দেশে আমাদের বাস। এই বাঙ্গালার মধ্যে আবার কতগুলি বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগে আবার কতগুলি করিয়া জেলা, ঐ জেলায় জেলায় আবার অনেকগুলি গ্রাম, নগর, সহর প্রভৃতি আছে। এক বাঙ্গালাতেই কত শত সহস্র গ্রাম আছে, তা হলে দেখ সমস্ত ভারতবর্ষে কত গ্রাম!"

নগেন:—"আচ্ছা, আমাদের একটা গ্রামইত এত বড়, তবে ত এই সমস্ত দেশটা কত মস্তো? তা ম্যাপে ত তা লেখেনি, ম্যাপে ছোট করিয়া যে লেখা আছে?" কিশোরী হাসিয়া বলিল তা তো হবেই, ম্যাপে কি অত বড় দেশ সমস্ত লিখিতে পারে? ছোট ছোট গ্রাম সহরগুলো মোটেই লেখে না, কেবল প্রদেশ ও বড় বড় সহরগুলির নাম দেওয়া থাকে।"

চন্দ্র বলিল:—"এ গ্রামটী এত বড়, তা এমন কত হাজার হাজার গ্রাম লইয়া ভারতবর্ষ, তাই যদি ম্যাপে, ততটুকু দেখায় তা হলে সমস্ত পৃথিবীর ম্যাপ যে কত ছোট দেখায়, তা পৃথিবী ত খুব প্রকাণ্ড? নবীন বাবু বলিলেন "তা হবে না? পৃথিবীকে কি তোমরা ছোট মনে কর বুঝি? যদি আজ এখান থেকে ট্রেনে পশ্চিম দিকে যাও, কি মিনিটে যদি এক ক্রোশ পথও চল, তা হলেও পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে প্রায় ৮ আট দিন লাগে। তোমরা ত জান পৃথিবী গোল। ইহার গোল দিক বেড়িয়া যদি একটা কাচি ধরা যায়, তা হলে প্রায়

১১ হাজার ক্রোশ লম্বা হয়। মনে কর দেখি পৃথিবীটা কত বড়। একটা বড় গাছ দেখেই তোমরা অবাক্ হও, একটা বড় বাড়ী দেখে হাঁ ক'রে চেয়ে থাক, পাহাড় কখন দেখনি, দেখিলে আশ্চর্য্য হয়ে থাকিতে, কি ভয়ানক বড়! কিন্তু সকলের চেয়ে বড় যে পর্ব্বত তাও পৃথিবীর কাছে যেন ছোট একটী ঢিবির মতন। তোমাদের গ্রামে বোধ হয় ৫০০ জন লোক থাকে, আর ভারতবর্ষে প্রায় এর ৫০০ হাজার গুণ লোক বাস করে, তা এখন মনে কর সমস্ত পৃথিবী ভারতবর্ষের চেয়ে কত গুণে বড়। ভয়ানক, ভয়ানক! তোমরা এর পর যখন দেশে দেশে বেড়াইবে, তখন বুঝিবে, যে পৃথিবী কত বড়।"

মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল—"কি পড়িলে এ সকল কথা জানা যায়, আমাকে বলিয়া দাও না?" কিশোরী বলিল "ভূগোল পড়িলে ও ম্যাপ দেখিলে জানা যায়।" নবীন বাবুও তাহাই বলিলেন। তখন সকলেই বলিল, আমরা সকলে ভাল করিয়া ভূগোল পড়িব ও ম্যাপ দেখিব।

তারপর নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন "এই ত গেল পৃথিবীর কথা, তা এখন আরও কতকগুলি কথা বলিব, মন দিয়া শুন দেখি। গতবারে বলিয়াছি পৃথিবী একটী গ্রহ, সূর্য্যের আকর্ষণে আকাশে ঝুলিয়া আছে এবং নলিন বাবুর সেই ঢিলের মত সূর্য্যের চারিদিকে এক বৎসরে ঘুরিতেছে। (সকলেঃ—'মনে আছে') যেমন পৃথিবী, তেমনি আরও অনেকগুলি গ্রহও ঐরূপে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সন্ধ্যা হলে তন্মধ্যে বৃহস্পতি প্রভৃতি কয়েকটা দেখাইয়া দিব। ইহারা অনেকেই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়, ও অনেক দূরে আছে। সূর্য্য এই সকলের মধ্যে থাকে। প্রত্যেক গ্রহের প্রায় একটী দুটী কি বেশী উপগ্রহ থাকে, তাহারা আবার ঐ গ্রহের চারিদিকে ঘোরে। যেমন চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। এই সকল গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতির রাজা যেন সূর্য্য। উহা অতি প্রকাণ্ড—একশ, দুশ, তিনশ;—এমন তর দশ শতে হাজার হয়। তার আবার এক হাজার, দু হাজার এ রকম দশ হাজার, কুড়ি হাজার এমন একশ হাজার হলে এক লক্ষ হয়; তার আবার এক লক্ষ, দুলক্ষ,—এমন চোদ্দ লক্ষটা পৃথিবী এক যায়গায় জমা করিলে যত বড় হয়—তত বড় সূর্য্যটা!!

উঃ! কি ভয়ানক!! একটা পৃথিবীই কত বড় তার ঠিক করিতে পারি না, আর তার মত ১৪ লক্ষটা!!! বাপরে,মনে মনে ধারণা কর্ত্তেও পারিনা। আচ্ছা, এখন এই গ্রহ উপগ্রহ, প্রভৃতি সব শুদ্ধ সূর্য্যটাকে মনে কর, কি ভয়ানক, কি বড়, কি প্রকাণ্ড!! মনেও যায়গা হয় না। মাথা ঘুরে যায়।—এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটীর নাম "সৌর-জগৎ"।

আরও একটী কথা আজ বলিব, স্থির হইয়া শুন। আকাশে ঐ যে সব নক্ষত্র একটী একটী করিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিবে, উহারা কি বল দেখি?" নলিন বলিল "ওরা সব মরা মানুষ। ঐ আমার কাকা, ঐ কায়েৎদের শামবুড়ো, ঐ ন্যায়-লঙ্কার মশাই!"সকলে হাসিয়া উঠিল। অমূল্য বলিল "না দাদা। ওরা সব শুনিছি এক একটা বড় বড় সূর্য্য, এই না?"—নবীন বাবু বলিলেন "হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। যেমন একটা সূর্য্য ও তাহার গ্রহ উপগ্রহগণ লইয়া একটী সৌরজগৎ হয়, তেমনি ঐ নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকে এক একটা সূর্য্য, উহা-দেরও আবার এমনি গ্রহ উপগ্রহ সব আছে। ওরা পৃথিবী থেকে যে কতদূরে থাকে তার কিছুই ঠিক হয়নি। তবে দুটো চারিটার দূরত্ব ঠিক করা গেছে;—তা তারা প্রায় এতো দূরে যে অসংখ্য ক্রোশ বলা যায়। কেন না সূর্য্য এখান থেকে প্রায় ৫ পাঁচ কোটী ক্রোশ তফাতে আছে। তা এইটীকে যদি এক হাত ধরা যায়, তা হলে নক্ষত্রগুলির মধ্যে এক

একটা প্রায় ১০,০০০ দশ হাজার ক্রোশ দূরে!!!! সূর্য্য এখান থেকে যতদূর তার প্রায় ৫ কোটী গুণ দূরে একটী নক্ষত্র থাকে, অর্থাৎ উহার দূরত্ব ২৫,০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ক্রোশ!!!! আরও শোন, এই নক্ষত্রটী আবার ঐ অগুন্তি নক্ষত্রগুলির মধ্যে খুব কাছে। আর আর সব নক্ষত্রগুলো যে কতদূর, তার কিছুই ঠিকানা হয়নি!! ওঃ! কি ভয়ানক! আর আমি বল্‌তে পারি না। আর বল্‌তে পারি না। আমার মাথা ঘুরছে। তা এখন দেখ নক্ষত্র কত? ঐ সব নক্ষত্রগুলির দূরতা জানা যায় নি, উহারা লক্ষ লক্ষ গুণে সূর্য্যের চেয়ে প্রকাণ্ড, উহাদেরও আবার গ্রহ উপগ্রহ সব আছে। ঐ সমস্ত একত্র করিলে যাহা হয় তাহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। এখন বল দেখি ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড!!"

সকলে নিজ্‌ঝুম্ হইয়া গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল। বলা শেষ হইলে "ফোঁস্ ফোঁস্" করিয়া এক একটা আশ্চর্য্যের চিহ্ন বড় বড় নিশ্বাস ছাড়িয়া, স্থির হইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। সকলেরই দৃষ্টি আকাশের গায়ে তারার দিকে।

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

প্রথম অধ্যায়।

অজা! অজা! কোথায় গেলি? হতভাগা ছেলেটা যে কোথায় যায়! অজা হতভাগা, এখনও এলি নে? তবে থাক্, আজ এলে পিঠের ছাল রাখ্‌ব না; ঘরে স্থান হয় না বুঝি?"—এই বলিয়া মুখ বিকৃতি করিয়া একজন বৃদ্ধা কোন হতভাগা বালককে গালাগালি দিতেছিল। সেই সময়, একটী বালক অন্ধকারে এই কথাগুলি বলিতেছিল: "ওই ঠাকুরমা বক্‌ছেন। আজ আমার কপালে মার আছে দেখ্‌ছি? কি ক'র্‌ব? উত্তর দিলে শুন্‌তেও পাবেন না, আর এতটা পথ হেঁটে যেতেওতো দেরী হবে দেখ্‌ছি। যাই! যা কপালে থাকে, মার তো খাবই! একটু শীঘ্র করে যাই; না হলে যত দেরী হবে, তত বেশী রাগ ক'র্‌বেন।"

এই সময়ে একটী বালিকা সেইখান দিয়া যাইতেছিল। সেই এই কথাগুলি শুনিতে পাইয়া বলিল—"কে তুমি, অজা? ভাই! তোমার ঠাকুরমা বকিতেছেন না?"

অজা।—হাঁ ভাই! এখনই যাব, আর মার খাব।

বালিকা।—কেন ভাই! তুমি মার খাবে? আহা!

অজা।—হাঁ, প্রায়ই তো খাই।

বালিকা।—তুমি পালাতে পার না, আমি হলে পালাতাম। তোমার জন্য আমার এমন দুঃখ করে!

অজা।—ভাই, মেনা! তুমি কি জান না, আমি খোঁড়া, শীঘ্র শীঘ্র যেতে পারি না? তবু যদি পা থাকিত!

বালিকা।—আহা! অজা! তোমার কথা শুন্‌লে কান্না পায়!

অজা।—আমি চিরকালই এই রকম কষ্ট পাচ্ছি। আমায় কেহ কখনও আদর করে নাই।

এই কথা শুনিয়া বালিকা তাহার অপরিষ্কার শুষ্ক মুখখানি স্নেহের সহিত চুম্বন করিল। বালক এমন মধুময় স্নেহমাখা চুম্বন কখনও পায় নাই। তাহার সমস্ত শরীর কি এক রকম ভাবে শিহরিয়া উঠিল। এমন ব্যথার ব্যথী পাইয়া সে আনন্দে ভেসে গেল। দুজনেই কিছুকালের জন্য চুপ করিয়া রহিল; কিছুক্ষণ পরে বালিকা বলিল—"তোমার মা নাই?"

বালক।—আমারতো মা কখনও ছিল না, তা এখন থাক্‌বে কি?

বালিকা—ওমা! সে কি কথা? এও কি হয়? মা বলেছেন সকলেরই মা থাকে; তবে বোধ হয়, যখন তুমি ছোট ছিলে, তখন তোমার মা মরে গেছেন।

বালক।—মেনা! কি ব'ল্‌লে? আমারও মা ছিলেন? আমার মা নাই।

বালিকা।—হাঁ, তিনি স্বর্গে আছেন।

বালক।—তবে কি কখনও আমার মা ছিল? আমার এমন সুখ বোধ হচ্ছে! আমার মা? আমার মা? মা আমার স্বর্গে আছেন? মেনা! মেনা! ভাই মেনা! মা স্বর্গে কার কাছে আছেন?

বালিকা।—মা বলেছেন, মরে গেলে লোকে ঈশ্বরের কাছে যায়।

বালক।—স্বর্গ কোথায়?

বালিকা বালকের গলা জড়াইয়া সুন্দর আকাশ দেখাইয়া বলিল "ওই সুন্দর আকাশে।"

বালক আগ্রহের সহিত আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"ওই? ওইখানে? ওই আকাশে? তোমায় কে বলিল মেনা?"

বালিকা।—কেন? আমি নিজে জানি। তুমি কি জান না মরে গেলে প্রাণটা আকাশে উড়ে যায়? তুমি, আমি, সকলেই মরে গেলে ওইখানে যাব।

বালক।—হোঃ হোঃ আমিও যাব? আমার তখন কি সুখ হবে, মেনা?

বালিকা।—মা বলেছেন, সকলেই এক দিন মরিবে; মরিলেই ঈশ্বরের কাছে যায়।

বালক।—আমার কি সুখ হচ্ছে? আমিও ওখানে যাব?

বালিকা।—তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর না?

বালক।—ভাই! আমি তো জানি না যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। কি ক'রে প্রার্থনা করে ভাই? তুমি কি ক'র?

বালিকা।—হাঁ, করি বই কি। মা আমাকে বলেছেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। ভাই! পরমেশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, খেতে দিচ্ছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন; আমি ঈশ্বরকে ভাল বাসি। আমরা মরে গেলে তাঁর কাছে যাব।

বালক।—আমিও তবে তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'র্‌ব।

এমন সময় একজন স্ত্রীলোক "মেনা! মেনা! উপরে এস" বলিয়া ডাকিলেন।

বালিকা।—যাই! ওই মা ডাক্‌ছেন। "মা! যাই —" এই বলিয়া ছুটিয়া মায়ের কাছে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মৃণালিনী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"অজা! তুমি এখনও দাঁড়াইয়া আছ?"

অজা।—হাঁ! আমি স্বর্গের বিষয় ভাবিতেছি।

মৃণা।—মা তোমাকে কিছু খেতে দিয়েছেন; এই নাও।

অজা—যদিও আমার ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু তোমার মা কোথায় পাবেন?

মৃণা।—না ভাই! তুমি কি জান না, বাবা ভাল হয়েছেন? মদ টদ খাবেন না, টাকা কড়ি উপার্জ্জন কর্‌বেন।

অজা।—বেশ হয়েছে! বড় ভাল হয়েছে! আর তোমার মাকে কষ্ট পেতে হবে না।

মৃণা।—অনেক রাত হয়েছে। যাই! মা শীগ্গির করে যেতে বলেছেন। বোধ হয় তোমার ঠাকু'মা আর তোমায় মার্‌বেন না।

অজা।—মার্‌লেই বা, তাতে আমার কি? স্বর্গে আমার মা আছেন, সেখানে তো একদিন যাবই। মার্‌লেই বা, তাতে আমার কি? একদিন তো সুখী হবই।

মৃণা।—তবে যাই, ভাই! তুমিও যাও।—

এই বলিয়া মৃণালিনী ছুটে চলে গেল।

অজা কি মার খাইল না? অজা! তুমি কি মার খাইলে না? তুমি বলিয়াছ তোমার মা'রে দুঃখ নাই। হা, চিরদুঃখী বালক! তুমি কতকাল এইরূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া বাঁচিবে? সত্যই কি এই রাক্ষসী বৃদ্ধা তোমার ঠাকুরমা? তবে কেন এমন ক'রে কষ্ট দেয়? তোমার কি এ পৃথিবীতে কেহ নাই? তোমাকে কি এ পৃথিবীতে কেহ ভাল বাসে না? কেন? মেনা তোমায় ভাল বাসে। সেই স্নেহময়ী বালিকা—আহা সেই স্নেহময়ী বালিকা! তোমায় তাহার মা ভাল বাসেন। তোমায় সেই বুড়ী ফলওয়ালী দয়া করে। তারা করে বটে, কিন্তু তোমার তো মা নাই। কে তোমায় মায়ের মত ভালবাসে? কে তোমার ক্ষুধা পাইলে খাওয়াইবে? কে তোমায় বিপদে রক্ষা করিবে। হা সরল বালক! তুমি এ বিষয়ে কিছুই জান না। সেই দুঃখীর বন্ধু, কাঙ্গালের রক্ষাকর্ত্তা, দয়াময় পরমেশ্বর তোমায় রক্ষা করিতেছেন, তিনিই চিরকাল তোমার মঙ্গল করিবেন।

ক্রমশঃ।

বিড়ালের বুদ্ধি।

বিড়ালের আর কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, বুদ্ধিটী খুব আছে। আবার অন্য কোন কাজের বেলায় এই বুদ্ধি যত দেখান না হয়, আহারের বেলা খুব প্রকাশ পায়। কেবল বিড়াল কেন, খাবার খুঁজিয়া খাইতে সকলেই বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে।—ইন্দুরেরা কেমন ফিকিরে জিনিশ পত্র নষ্ট করিয়া খাইয়া ফেলে, দাঁড়কাক কেমন করিয়া পাথরের নুড়ি ফেলিয়া কুজোর জল খাইয়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন। এক একটী ছেলে বাবাজি, এক একটী মেয়ে ঠাকরুণও এমন আছেন, যাঁরা পড়া শুনার বেলা, কি ঘরের কাজ কর্ম্ম করিবার বেলা পাথরের মত নিরেট বোকা, কিন্তু খাবার সময়—ওঃ—কেমন বুদ্ধি খুলে যায়!

কিন্তু বিড়ালের যে বুদ্ধি আছে, তাহা ও পাড়ার কুন্দ স্বীকার করিত না। সে বলিত—"হ্যাঁ, ওরা ভারী বোকা, ভারী মূর্খ। তা না হলে, থালার কাছে এসে, একবার ভয়ানক মার খেয়ে গেল,—খানিকক্ষণ বাদে আবার ফিরে আসে কেন?"—আমি ভাবিলাম কুন্দ ছোট মেয়ে, বুঝাইলে বুঝিবে না; এক দিন হাতে হাতে দেখাইয়া দিব। এক দিন বলিলাম, "কুন্দ! এক কাজ করতো, লক্ষ্মী দিদিটী! তোমাদের ঐ সরুমুখো জাগ্‌টাতে খানিকটা দুধ রাখিয়া দাওতো।"

কুন্দ বলিল "কেন, বলুন না?"

আমি বলিলাম—"রাখ না, তার পরে দেখ্‌বে এখন!" কুন্দ তাহাই করিল। তখন সেই জাগ্‌টাকে ঘরের মেজেতে রাখিয়া কুন্দেতে আমাতে একটা দরজার আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ চলিয়া গেল, তার পর দেখি কি, বাড়ীর যণ্ডা বিড়ালটা সেই দিকে আসিতেছে। আমি কুন্দের গা টিপিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে বলিলাম, এবং বিড়ালটা কি করে দুজনে মিলিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বিড়ালটা ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া চারিদিকে তাকাইল, একবার দরজার কাছে আসিল, আবার ফিরিয়া জাগ্‌টার কাছে গেল। অন্য দিন যণ্ডাটার ম্যাও ম্যাও শব্দে মানুষ ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া যায়;—আজ ভালমানুষের মত, মুখে শব্দটী নাই! বিড়াল জাগ্‌টার কাছে গিয়া মুখ ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, জাগের সরু মুখে তার তোলোহাঁড়ির মত মুখ খানি ঢুকিবে কেন?, আমি কুন্দের কানে কানে বলিলাম—"এইবার দেখ্‌বে বিড়ালের বুদ্ধি আছে কি না।" যখন বিড়াল দেখিল, মুখ ঢুকিতেছেনা, তখন সে কিছু গোলে পড়িল। খানিকক্ষণ জাগ্‌টার চারি পাশে ঘুরিয়া যেন বুদ্ধি স্থির করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইয়া বসিয়া জাগ্‌টার ভিতরে একটা পা চালাইয়া দিল। সেই পাটা দুধে ভিজিলে, উঠাইয়া তাহাই চাটিয়া খাইল, এবং আবার পাটা ঢুকাইয়া দিল। এইরূপে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খাইয়া বিড়ালটা গোঁপ মুছিয়া, ম্যাও, ম্যাও, করিতে করিতে চলিয়া গেল। কুন্দ আর আমি জাগের কাছে গিয়া দেখি, প্রায় সমস্ত দুধ খাইয়া গিয়াছে। তখন আমি কুন্দের দিকে চাহিয়া, জিতিয়াছি ভাবিয়া, বলিলাম "কেমন গো, কুন্দুনি! এখন কেমন হ'ল?" কুন্দ আর কি বলিবে?—বলিল "ওমা! এমন? তাইতো!"

অপূর্ব্ব বৃক্ষ।

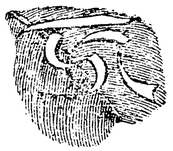

জগদীশ্বর আমাদের কত দয়া করিতেছেন, তাহা একবার আমাদের চারিদিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি। ওই সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে অন্ধকার চলিয়া যাইতেছে, সুমিষ্ট ফল সকল পাকিয়া উঠিতেছে, লোকে মনের আনন্দে কাজ-কর্ম্ম করিতেছে; ওই চন্দ্র আকাশে উঠিয়া, চারিদিকে আপনার শীতল কিরণ ছড়াইয়া দিতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মৃদুমন্দ বাতাস বহিয়া তপ্ত শরীরকে জুড়াইয়া ফেলিতেছে; ওই কত ফল ফুলের গাছে আমাদের বাগান পুরিয়া গিয়াছে, একবার তাহাতে বেড়াইলে প্রাণ আনন্দে ছাইয়া পড়ে; এ সকল কি ঈশ্বরের দয়া নয়? কিন্তু তাঁহার দয়া কেবল ইহাতেই শেষ হয় নাই। যাঁহারা অনেক দেশে গিয়াছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলেন "হে ঈশ্বর! তোমার আর শেষ নাই, মানুষের জন্য তুমি কত সুখের বন্দোবস্ত করিয়াছ, তাহা আর ফুরায় না।"

পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কেবল বালি ধূ ধূ করিতেছে; এমন কত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত কোথাও এক ফোটা জল পাবার যো নাই, একটী গাছের মুখ দেখিবার উপায় নাই, যে দিকে চাও, কেবলই বালি। আবার এমন স্থানও আছে যেখানে কেবলই বন, বড় বড় গাছ মাথা তুলিয়া, সার বাঁধিয়া, দেশ দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে। সে গুলোকে কেহই কখনও কাটিয়া পরিষ্কার করিতে

চেষ্টা করে নাই; কাজেই ভয়ানক জঙ্গল হইয়া বুনো জন্তুদের থাকিবার যায়গা হইয়াছে। কিন্তু মরুভূমিই বল, আর এইরূপ বন জঙ্গলই বল, মানুষকে সকল যায়গাতেই চলিতে হয়। পৃথিবীতে এমন যায়গা প্রায় কোথাও নাই, যেখানে মানুষকে যাইতে হয় না। কিন্তু দশ বার দিন ক্রমাগত বনের ভিতর দিয়া যাইতেছি বা এমন স্থান দিয়া যাইতেছি যেখানে জল নাই বা খাবার কিছুই নাই,—সেখানে মানুষ বাঁচে কিরূপে? আহা! জগদীশ্বরের কি দয়া! তিনি তাহার চমৎকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন।

তোমরা 'পান্থপাদপ' নামক গাছের নাম শুনিয়াছ? ৯৩ পৃষ্ঠায় দেখ সেই পান্থপাদপের ছবি রহিয়াছে। এই পান্থপাদপে ঘা দিলেই অতি চমৎকার পরিষ্কার জল বাহির হয়। পথ চলিয়া ক্লান্ত হইলে পথিক এই গাছের নিকটে জল পায়। আশ্চর্য্য দেখ! যেখানে বেশ জল পাওয়া যায়, সেখানে এ গাছ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যেখানে জল নাই, যেখানে জল না পাইলে পথিক তৃষ্ণায় মরিয়া যাইবে, আমাদের দয়াময় ঈশ্বর যেন মায়ের মত, ছেলের কষ্ট বুঝিয়া আগে থাকতেই সেই খানে জল লইয়া গিয়া রাখিয়াছেন। এই বৃক্ষ আফ্রিকার নিকটে মাডাগাস্কর দ্বীপে এবং অন্য কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

কেবল জল রাখিয়াই পরমেশ্বর ক্ষান্ত হন নাই, পথ কষ্টে বনের মধ্যে চলিয়া চলিয়া পথিকের যখন বড় ক্ষুধা পাইবে, তখন সে কি খাইবে, ঈশ্বর তাহারও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকার বড় বড় জঙ্গলে 'গো-পাদপ' নামে আর একরূপ বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে চমৎকার দুধ বাহির হয়। এ সব কথা শুনিলে হঠাৎ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু ঈশ্বরের দয়ার কি শেষ আছে? তিনি মানুষের সুবিধার জন্য কত যে আয়োজন করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়? আমরা নীচে গোপাদপের একটী ছবি দিলাম।

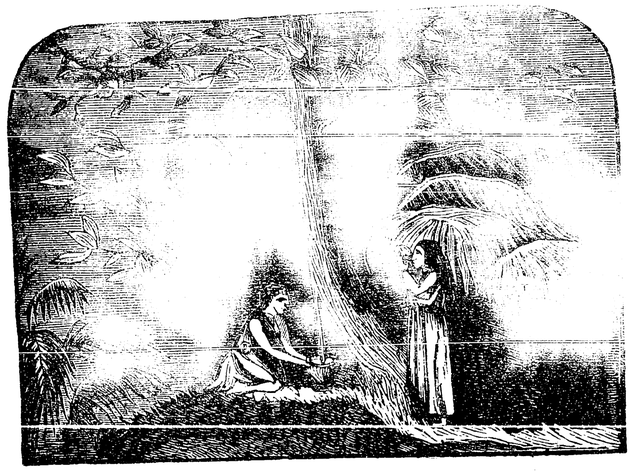

এই গোপাদপ হইতে যে দুধ বাহির হয়, তাহা গরুর দুধেরই মত সুমিষ্ট এবং উপকারী।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, ঈশ্বর কোন গাছকেই অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। রাস্তার দুপাশে যে জঙ্গল হয়, তাহার ভিতরের সামান্য লতাটারও কাজ আছে, আমরা জানিনা বলিয়াই আদর করি না। কে বলিতে পারে, যে আমেরিকা বা আফ্রিকা বা ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর-যোড়া বন জঙ্গলে, এমন গাছ নাই, যাহার ফল খাইলে, আর দুধ, ঘি, ভাত, ডা'ল, রুটী খাইবার প্রয়োজন হবে না, এক ফলেতেই শরীর রক্ষা হবে? কে বলিতে পারে? আমরা অতি মূর্খ, আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির কিছুই জানি না। আমরা কেবল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকি, আর বলি "হে ঈশ্বর! তোমার কত দয়া! তোমার কত দয়া!"

পশুর প্রতি দয়া।

সে দিন পটলডাঙ্গা গোলদীঘির পূবধারে দেখিলাম একখানা ভাড়াটে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। তখন ভয়ানক রদ্দুর—মাথা ফাটিয়া যাইতেছে। গাড়ীর গাড়োয়ান কোথায় গিয়াছে, তাহা জানি না; কিন্তু একটী ছোট ছেলে সেই খানে দাঁড়াইয়া ছিল, দেখিলাম। আমি দেখিলাম ছেলেটী ঘোড়াটীকে ঘাস দিয়াছে, এবং ঘোড়াটীর মাথায় ছাতা ধরিয়াছে! আমি প্রথমে ভাবিলাম বুঝি ছেলেটী নিজের মাথায় ছাতা ধরিয়াছে, তাই ঘোড়ার মুখেও ছায়া পড়িতেছে। একটু দাঁড়াইলাম; দেখিলাম ঘোড়াটা একটু সরিয়া যাওয়াতে আবার তাহার মুখে রদ্দুর পড়িল, এদিকে ছেলেটীও সরিয়া গিয়া তাহার মুখে ছাতা ধরিল। আমি দেখিয়া কত সুখী হইলাম তাহা বলিতে পারি না। যে বালক বা বালিকা পশুর প্রতি দয়া করে, সে বড় হইয়া মানুষের প্রতিও দয়া করে; আর যে ছেলে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা করে, সেতো বড় হইয়া আরও কত নিষ্ঠুরতা, কত কি করিতে পারে!

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হা!!

কে মজা কোরবে? এই বেলা এসো। কিন্তু সে সব ছেলে আমি চাই না, যারা পড়ে না, তারা সব মন্দ ছেলে, আমার সঙ্গে তাদের ভাব নাই, বরং আড়ি। যারা ভাল ছেলে, যারা পড়্তে ভাল বাসে, অনেকটা সময় পড়ার কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, তারাই খানিকটা আমার সঙ্গে বসে গল্প সল্প কর্‌বার যোগ্য ছেলে। যথার্থ, আমি ভাল ছেলেদের বড় ভাল বাসি, তাহাদের সঙ্গে নানান্ রকম গল্প করি, কত সব রাজা রুজির কথা, ভাজা ভুজির কথা বলি, কত আহ্লাদ-আমোদের কথা বলি, কত আশা ভরসার কথা বলি, কতো কি! আর মন্দ দুষ্ট ছেলে যারা, আমার দেখাই পায় না তারা। কেবল লজ্জায় মুখ নীচু কোরে গুম্ হোয়ে বোসে থাকে। না হয় ত আমার বৈমাত্রভাই—নীচআমোদ শর্ম্মা, তারই সঙ্গে বেড়ায়। আরে ছিঃ! তার কাছেও যায়! সে ছেলেদের মাথা খায়, আমি কি তাই করি?

আমার নাম জান্‌বার জন্যে তোমরা ব্যস্ত হোচ্চো? আমার ভারী মস্তো নামঃ—শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু পবিত্র-আমোদ-হৃদয়-বিনোদ-সুখালঙ্কার-গল্প-বাচস্পতি। আহা!! কেমন সুললিত নামটী!! না হবে কেন? কত ভট্টাচার্য্য, কত তার্কিক, ন্যায়বাগীশ সব একত্র হোয়ে তবে এই নামটী হোয়েছে! অমনি কি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ!

আমার কাছে চুরোট নেই, তামাক নেই, লালচোকো সিদ্ধি নেই, মারোদ্দম্ গাঁজা নাই, বোতলপোরা মাতলামো নেই, কোন রকমের বকামি নেই; সেই জন্যে অনেকেই আমায় পছন্দ করে না। আবার আমার নানা দোষ—আমি ছাই পাঁশ পরনিন্দা টিন্দা করি না, সে জন্যও অনেকে আমায় দুচোখে দেখ্‌তে পারেন না। তা হোলে কি হয়? আমি যার জন্যে সৃজন হোয়েছি তাই কোরবো। কেমন ভাল ছেলেরা! তোমরা কি বল? যখন তোমরা পোড়ে শুনে ব্যস্ত হবে, ক্লান্ত হবে, একটী বার আমার বাসায় গিয়ে ডেকো, আমি বাহিরে এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা দেবো। তার মধ্যে একটু কথা আছে, আমার গতি বিধি অনেক দূর। আহা! পৃথিবীর বালক বালিকারা অনেকেই আমার শিষ্য যজমান, এজন্যে প্রায়ই আমাকে বাহিরে থাকিতে হয়, তাই বাড়ীতে আমার অনেক ছেলে পুলেদের রেখে যাই। তাদের দেখা পেলেই আমার দেখা হবে, তারা আর আমি কিছু প্রভেদ নাই। তাদের মধ্যে জন কতকের নাম আমি তোমাদের বলিয়া দিই। সকলের মধ্যে প্রিয় ছেলে আমার একটী, তাহার নাম

"শ্রীমান পরোপকার পরদুঃখ-দূরীকরণাচার্য্য" তার চেয়ে আর কাকেও আমি এত ভাল বাসি না। তার পরে আমার ১০১ এক শ এক পুত্র, তাদের সকলেরই নাম "শ্রীখেলাপ্রসাদ-শরীরচালন-বিদ্যাভূষণ।" তাহলে তো বুঝতেই পাচ্চো যে, তাস, পাসা, দাবাবোড়ে, অষ্টাকোষ্টে, প্রভৃতি কুড়ের ইষ্টি সর্ব্বনাশের মূল খেলারা আমার বংশধর নয়। তার পর আমার আর কতকগুলি প্রিয় সন্তান আছে, তাদের মধ্যে প্রধানঃ—"শ্রীমতী চিত্রবিদ্যা-পরমানন্দসরস্বতী"। আর একটী মেয়ের নাম "শ্রীমতী জীবেদয়া পালিত" ইহাঁর কাজ হোচ্ছে—ভাল ভাল পায়রা, হাঁস, গাভী, ছাগ, ময়ূর, হরিণ, খরগোষ, বেজী, বিড়াল প্রভৃতি গৃহ পালিত জীব জন্তুদিগকে যত্নপূর্ব্বক আদর ও স্নেহ করা, আহার দেওয়া, ঘুমুর পরাইয়া নাচান, ইত্যাদি;—এসব জন্তুর মধ্যে আবার সর্ব্বোপরি ভাল কুকুর। আর একজন ছেলে "শ্রীমান্ উদ্যান-সংস্কার শ্রমানন্দ,"—ইহাঁর কার্য্য কেবল শুষ্ককে সরস করা, পতিতকে আবাদ করা, মাঠকে ফুলবাগান করা, মাটী ও জলকে স্বর্গের পদার্থ করা। ইনি দেবতাদেরও প্রিয়, কাজেই আমার বড় আদরের বস্তু।

ভাই ভাল ছেলেরা! তোমাদের কাছে আমি অনেকক্ষণ রহিলাম, এইবার পালাবো। কি জানি কে আবার বোক্‌বে! আর আমার ভাই অবকাশ বড় কম। তোমরা আজ অবধি দেখ দেখি, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া একবার দেখদেখি, কেমন পড়া ভাল তৈয়ের হবে, সুখে স্বচ্ছন্দে দিনটী কাটবে, শরীর মন ভাল থাক্‌বে, পৃথিবীতেই তোমাদের আমি স্বর্গ এনে দেবো। আর যারা কুড়ে, বা আমার সৎমার ছেলের সেবা করে, কু-আমোদে দিন কাটায়, তারা উচ্ছন্ন যায়। খবরদার! ভাই, তার কথা শুনোনা। আমার কথা বুঝে দেখো। আজ আসি। তোমাদের সঙ্গে এখন এই পর্য্যন্ত। আসি ভাই! হাঃ হাঃ হাঃ হা!!

পত্র প্রেরকের প্রতি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে এলাইচের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম যে এলাইচের পাতায় গন্ধ নাই; আমাদের একজন বালিকা পাঠিকা, এই কথা ভুল, ইহা দেখাইবার জন্য আমাদিগকে কতকগুলি এলাইচের পাতা ও ফুল পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিলাম এ পাতার বেশ গন্ধ আছে, ফুলগুলির গন্ধ আরও চমৎকার। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, "এলাইচ"-প্রবন্ধের লেখক মান্দ্রাজ অঞ্চলে যে পাতা দেখিয়াছিলেন, তাহাতে গন্ধ ছিল না; বাঙ্গালা দেশে এলাইচের গাছে ফল হয় না, এই জন্যই হয়ত পাতায় ফলের গন্ধ পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ অঞ্চলে এলাইচের গাছ লতার মত, কিন্তু এখানে ঝোপের মত। যেখানকার গাছ সেখানে যেরূপ হয়, অন্য দেশে উঠাইয়া আনিলে কিরূপে সেরূপ থাকিতে পারে?

ধাঁধা।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। যমুনা, কল্‌কেতা (কলিকাতা), এলাহাবাদ, হিমাচল।

২। ইন্দ্রপ্রস্থ। ৩। কো—কিল।

নূতন

১। আমার উপরের অঙ্গটা খেলে মানুষ মরে যায়; নীচের অঙ্গটা ভয়ানক শক্ত। কিন্তু এক সঙ্গে করলে সমস্ত আমি এক চমৎকার বিলাতী খাবার হই। বলতো আমি কে?

২। একটী ছেলে কি একটা মশলা হাতে করে যাচ্ছিল। পথে কি একটা পোকা তাতে ব'সে হুল ফুটিয়ে দিলে। ছেলে চেপে ধরাতে সেই প্রাণীটার শরীরের তিন ভাগের এক ভাগ মাটীতে পড়ে গেল, আর দুভাগ ছিঁড়ে মশলায় লেগে রহিল। ওমা, ছেলেটী চেয়ে দেখে একটা চমৎকার ফুল গাছ হয়েছে! কেমন করে বলতো!

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

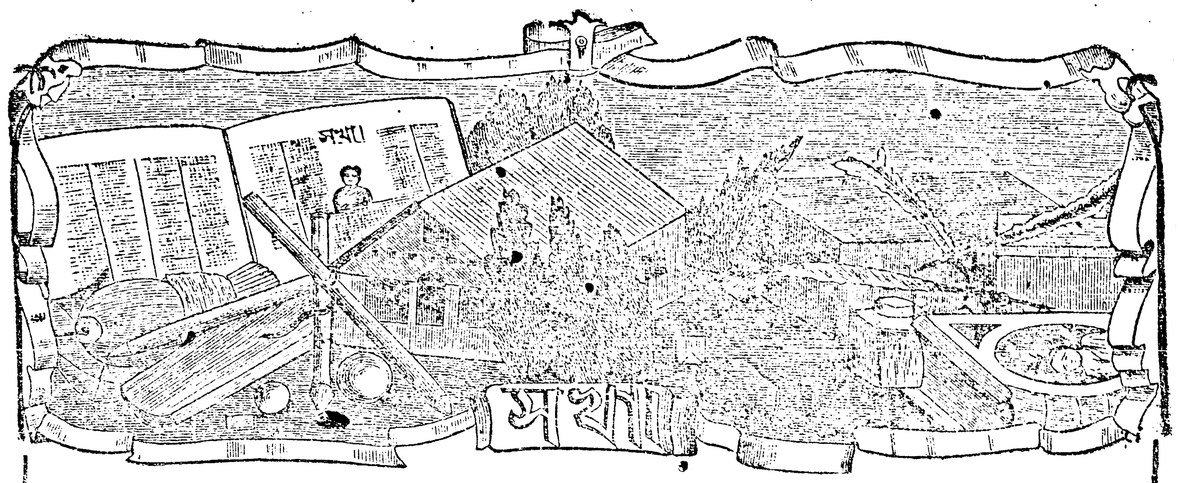

দ্বিতীয় ভাগ। জুলাই, ১৮৮৪। ৭ম সংখ্যা।

দাদাবাবুর খোস গল্প।

আজ এই মাত্র পক্ষীদিগের বুদ্ধির বিষয় পড়িয়া একটু ছাতে উঠিয়া বেড়াইতেছি, আর কোথা হইতে সন্ধান পাইয়া স্বর্ণ, কুমু, চারু, যতীন ও দেবেন আসিয়া উপস্থিত। আমি যেন ভয় পাইয়া একটু খেলা করিবার জন্য আলিশার আড়ালে লুকাইলাম, তা সে হবে কেন? তারা ঝাঁ করিয়া ধরিয়া টানিয়া বাহির করিল। সকলে ধরাধরি করিয়া ছাতের মাঝখানে আনিয়া ফেলিল। "গল্প বলনা দাদা বাবু! হ্যাঁ তোমার কেমন দুষ্টমি! পালিয়ে লুকিয়ে কোথা থাক্‌বে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কিসের গল্প?" আজ সকলে এক কথায় বলিয়া উঠিল "পাখীর"। আমি অবাক হইলাম। বলিতে লাগিলাম ঃ—

আজ আমি তোমাদের একটা গল্প বলিব, তাহাতে কিন্তু দু একটা ইংরাজী কথা থাক্‌বে বুঝে নিতে হবে। "প্যারট্" নামে এক প্রকার পাখী আছে, তাহারা ঠিক আমাদের যেমন তোতা পাখী তেমনি সমস্ত কথা মানুষের মত কয়। এক বিবির একটী প্যারট্ ছিল, তিনি তাহার কতকগুলি কথা বলিয়া-গিয়াছেন শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। (সকলে ঃ—"বলনা দাদা বল বল") সে পাখীটা আছে আছে, ঘরের লোক যদি একটু হাসির কথা বলিত অমনি হেসে গড়িয়ে যেত "হাঃ হাঃ হাঃ!!" সে হাসি আর থামে না, ঠিক মানুষের মত। আবার তার মধ্যে মধ্যে বলা হইত "অতো কোরে হাসিও না, মোরে যাব, মোরে যাব।" খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কাশিতে আরম্ভ করিল "ক্ষক্ ক্ষক্"; —সে কাশির ধুম কি? বাহিরে থেকে মনে হবে ঠিক যেন কে কাশ্‌ছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আঃ! বড় শর্দ্দি, বড় শর্দ্দি!" আবার একটু কাশিয়া "ফোঁশ" করিয়া একটা নিশ্বাস টানিয়া বলিত "আঃ! বাচ্‌লাম একটু ভাল হয়েছে"। এই বলেই হাসির ধুম।

বাড়ীর দাসীটিকে সে বড়ই ভাল বাসিত। সে যখন ঘর থেকে বাহিরে যেত ওটা ডাকিত "পেন্! পেন্! আমার বড় অসুখ কোচ্ছে, শীঘ্র আয়!" আর বাড়ীশুদ্ধ লোক হেসে খুন। যেই পেন্ ঘরে এল, অমনি নাচিতে লাগিল, আর হাসি। দাসী যদি বলিত "তোমায় মারিব," অমনি একটু নরম হইয়া বলিত "না, না, মারিবে না"! ঘরে বিড়ালটী ঢুকিলেই সে ডাকিত "পুশ্ পুশ্," আমি তার পরেই আবার আপনিই বলিত "মিউ"। ঘরে কেহ

যদি "পুশ্ পুশ্" বলিত, তবে সে বলিবে "মিউ"। আর ঘরে কেহ যদি "মিউ" বলিবে, সে করিবে "পুশ্ পুশ্।" কি চমৎকার!

কোন অপরিচিত স্ত্রীলোক ঘরে এলে খানিক তাঁহার দিকে চাহিয়া যেন চিনিয়াছে এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিত "তুমি কেমন আছ মা?" এক দিনকার কথা বড়ই আশ্চর্য্য। দাসী ঘরে নাই, তাই বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন "পাখী, পেন্ কোথা গেছে?" অম্নি পাখীটা বলিয়া উঠিল "নীচে।" বিবি অবাক্!!

এক দিন কোন ভদ্রলোক নদী পার হইবেন বলিয়া তীরে আসিয়া নৌকা খুঁজিতেছিলেন। এক জনও মাঝিকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু কোথা হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে:—"পারে, পারে, বাবু পারে যাবেন?" তিনি হতবুদ্ধি হইয়া চারিদিকে চাহিতেছেন, এদিক ওদিক কোথাও লোক দেখিতে পান না, অথচ ঐ "পারে, পারে, বাবু পারে যাবেন?" শব্দ তাঁহার কাণ ঝালা পালা করিতেছিল। তখন তিনি দেখেন যে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর জানালাতে এক প্যারট্ ঝুলিতেছে আর ঐরূপ চীৎকার করিতেছে।

ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেন্‌রীর একটা প্যারট্ ছিল, তাহাকে তিনি টেম্‌স্ নদীর উপর রাজবাড়ীর জানালায় টাঙ্গাইয়া রাখিতেন। সে এক দিন দাঁড়ে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ নদীর জলে পড়িয়া গেল। যেমন পড়িয়াছে, অমনি চীৎকার করিতে লাগিল "A boat! a boat! twenty pounds for a boat!"—"একখানা নৌকা নিয়ে আয়! একখানা নৌকা নিয়ে আয়! দুশো টাকা দেবো একখানা নৌকা!" একজন মাঝি তাহা শুনিয়া দাঁড় বাহিয়া তাহাকে তুলিল, আর তার পরে রাজার নিকটে লইয়া গিয়া সমস্ত ব্যাপার বলিয়া পুরস্কার স্বরূপ ২০০ টাকা চাহিল; পাখী নিজ মুখে যাহা দিতে চাহিয়াছে তাহাই দিতে প্রার্থনা করিল। রাজা বলিলেন "বেশ, পাখী যাহা বলিবে তাহাই দিব।" দুষ্ট প্যারট অমনি বলিয়া উঠিল "Give the knave a groat"—অর্থাৎ "দাও মিন্সেকে একটা দোয়ানী!" কি আশ্চর্য্য!!

বাস্তবিক এক একটা পাখীর কেমন ক্ষমতা, কি বুদ্ধি, কি মুখস্থ করিবার শক্তি, দেখিলে অবাক হইতে হয়।

স্বর্ণ:—দাদা বাবু এখন গল্প তো আমি আর কখন শুনি নাই! এটী সক্কোলকে গিয়ে আমি বলিব।—কুমু, চারু প্রভৃতি সকলে পরম আনন্দিত হইয়া আমার আঙ্গুল ধরিয়া চলিয়া গেল।

কুকুরে কুকুরে ভাব।

বড় বড় সহরের কোলে, নদী বা সমুদ্রের ধারে, যেখানে জাহাজ আসিয়া লাগে, সেখানে অনেকটা যায়গা, নদী বা সমুদ্রের মধ্যে খানিক দূর পর্য্যন্ত ইট বা কাঠ দিয়া বাঁধান থাকে। এইরূপ স্থানকে "জেটি" বলে। জাহাজগুলি নাকি কূলে খুব কাছে আসিতে পারে না, কাজেই এইরূপ "জেটির" দরকার।

কোন এক সহরে এইরূপ এক জেটির শেষ-ভাগে দুটী কুকুর রোজই শুইয়া থাকিত। নীচে তড়াক্ তড়াক্ করিয়া ঢেউ লাগিতেছে, বোধ হয় কুকুরগুলি তাহার শব্দে আমোদ পাইত বলিয়া সেখানে 'আড্ডা' করিয়াছিল! কিন্তু দুটী কুকুরের মধ্যে একটুও ভাব ছিল না। একই যায়গায় শুই-বার জন্য দুটোতে ঝগড়া করিত, এবং ষণ্ডাটা রোগাটাকে তাড়াইয়া দিয়া সেই যায়গাটা প্রায়ই দখল করিয়া লইত। বেচারা রোগা কুকুর কি করে, চুপ করিয়া আর এক পাশে পড়িয়া থাকিত।

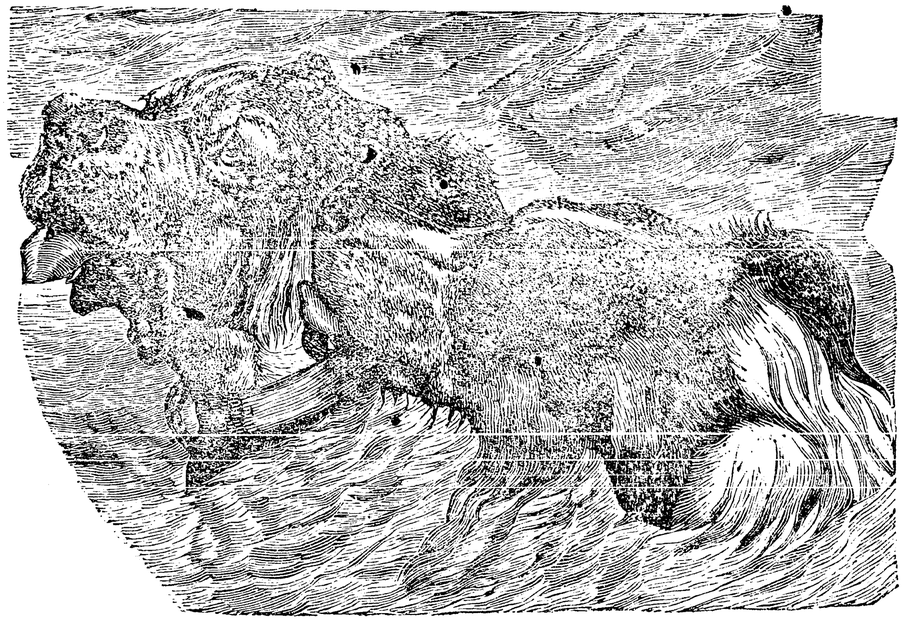

এইরূপে অনেক দিন যায়, এক দিন ঝগড়া করিতে করিতে দুটোই জলে পড়িয়া গেল। তখন খুব ঢেউ উঠিতেছিল; তাহার মধ্যে পড়িয়াও রোগাটা সাঁতরাইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাছাধন ষণ্ডার জল খাইয়া প্রাণ যাইতে লাগিল। সে ভাল সাঁতার জানিত না, ঢেউ কাটিয়া যে তীরে উঠিতে পারিবে, এরূপ আশা রহিল না। এদিকে রোগা কুকুরটী উপরে দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড দেখিতে-ছিল; সে দেখিল তার শত্রু ডুবিয়া মরিতেছে। কুকুরেরা মনে মনে ভাল মন্দ ভাবে কি না, জানি না; কিন্তু এই রোগা কুকুরটী শত্রুর এই দশা দেখিয়া ঝাঁপাইয়া জলে পড়িল এবং নিজে বিলক্ষণ সাঁতার জানিত বলিয়া সহজেই ষণ্ডাটার গলাতে ধরিয়া তাহাকে তীরে আনিয়া তুলিল। সেই দিন হইতে দুটী কুকুরের রাগারাগি চলিয়া গেল, তাহা-দের মধ্যে খুব ভাব হইল।

যাহা বলিলাম ইহার এক চুলও মিথ্যা নয়। একটা সামান্য কুকুর কেমন করিয়া আপনার শত্রুর সঙ্গে ভাব করিয়া লইল, আমরা বুদ্ধিমান হয়েও অনেকে তাহা বুঝি না। যে শত্রু, তাকে যদি খুব নাকাল, খুব জব্দ করিতে চাও, তাহা হইলে যতক্ষণ সে তোমার অপকার করিবে, ততক্ষণ তুমি তাহার উপকার কর দেখি, দেখিবে তাতে কি হয়! আমরা জানি, ইহা খুব শক্ত, কিন্তু চেষ্টায় সবই হয়, তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যেস্থানে অজা মেনা বাস করিত, তাহাকে লোকে 'চক্' বলিত। অজাদের বাড়ীটা দেখিতে এক রকম ধরণের, সে বাড়ীতে অনেক পরিবার বাস করিত। অজার ঠাকুরমা উপরে কোণের একটা ঘরে থাকিত। রাস্তার ওদিকেই মেনাদের বাড়ী। অজাদের বাড়ীর নীচে একটা ছোট ঘরে বুড়ো রামদাস ও তাঁহার স্ত্রী থাকিতেন। এই লোকটী বড় ভাল মানুষ, অতিশয় ধার্ম্মিক, কাজেই অতিশয় সুখী।

একদিন অজার ঠাকুরমা বড় রাগ করেছিলেন, অজাকে মেরে রাস্তায় দূর করে দিয়াছিলেন—তখন আবার বৃষ্টি হইতেছিল। দুঃখে কষ্টে অজার ছোট প্রাণটী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে কি করিবে?—সিঁড়িতে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই প্রাণ-গলানে কান্না আর কারো প্রাণে লাগুক, আর নাই লাগুক, বুড়ো রামদাসের প্রাণে সকলের আগে লাগিল। এই দুঃখের কান্না শুনিতে পাইয়াই রামদাস স্ত্রীকে বলিলেন—"ওগো, দরজাটা খুলে দেখ দেখি, কে কাঁদ্‌ছে!" তাঁহার স্ত্রী কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দেখিলেন, একটী ছোট ছেলে। রামদাস একথা জানিতে পারিয়া বলিলেন—

"তুমি ওখানে কেন? ভিতরে এসো। আমি বড় ছোট ছেলেদের ভালবাসি; এসো তোমার সঙ্গে কিছু কথা কই। আমিতো হাট্‌তে পারি না, যে তোমার কাছে যাব? তুমিই এসো না—তাহ'লে আমার বড় আরাম হয়।"

অজা দিব্যি ঘরটী দেখিয়া এবং রামদাসের মিষ্ট কথা শুনিয়া সেই ঘরে ঢুকিল। পরে রামদাসের দিকে তাকাইয়া বলিল—"কি তুমি হাঁটিতে পার না? তুমি কি কখনও হাঁটিবে না?"

রামদাস।—এখানে হাঁটিব না বটে, কিন্তু স্বর্গে আবার হাঁটিয়া বেড়াইব।

অজা। হ্যাঁ, সত্যি নাকি,—তুমি কি সেখানে যাবে?

রামদাস। তুমি কি স্বর্গের কথা জান?

অজা। হ্যাঁ, আমি জানি। আমার মা সেখানে আছেন, আমিও সেখানে—

এই কথা বলিতে বলিতে অজার চক্ষে জল আসিল।

রামদাস।—বাছা! ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন, এখানে কেহই এই সকল বিষয় ভাবে না। তোমায় একথা কে বলেছে।

অজা।—মেনা আমায় বলেছে।

রামদাস।—সে কাদের মেয়ে?

অজা। কেন সে রাস্তার ওধারের বাড়ীটাতে থাকে। (সে মনে করে পৃথিবীর সকলেই মেনাকে জানে; ও তাহাকে জানা উচিত)।

রামদাস। সেই মেয়েটীকে একদিন এনতো? মেয়েটীতো বড় ভাল, সে এমন কথা কোথা হতে শিখেছে? তার বয়স কত?

অজা। সে আমার চাইতে এক বছরের বড়। তার বয়স দশ বৎসর।

রামদাস। এসব কথা বোধ হয় তার বাবা বলেছেন। আজ কাল বাবারা শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক।

অজা। না—না—ওমা তার বাবা যে মাতাল! তিনি বড় খারাপ লোক। মৃণালিনীর মা বড় ভাল স্ত্রীলোক। তিনি বেশ লেখা পড়া জানেন। কিন্তু ভাগ্য দোষে মেনার বাবা বড় খারাপ।

রামদাস।—তোমার বাপ কোথায় আছেন; তিনি কি বেঁচে আছেন?

অজা।—বাবা! আমি তা জানিনা।

রামদাস।—তবে তুমি কার কাছে খাও দাও?

অজা।—এই বাড়ীর ওই দিককার ঘরে আমি আর ঠাকুরমা থাকি।

রামদাস।—তোমার ঠাকুরমাকে সকলে কি বলে ডাকে?

অজা।—'চারুর পিশী।'

রামদাস। তবে এখন এসো, আর একদিন সেই মেয়েটীকে সঙ্গে ক'রে এসো।

ইহার কিছুকাল পরে কি একটা পড়ার শব্দ হইল—আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক বুড়ীর গলা শোনা গেল—বোধ হইল সে মুখ বিকৃতি করিয়া গালাগালি দিতেছে। "ওমা হতভাগা—কি করলি? ঘোড়া হয়েছিস্ না কি? কপালের মাঝে দুটো চোক্ রয়েছে কি কর্‌তে, যদি দেখ্‌তেই না পাবি? হায়! হায়! আমার এমন

সুন্দর জিনিষটা ভেঙ্গে দিলেরে! দিই দুই কিল বসিয়ে! দূর হ! বেরো! মর্! মর্! যম কি তোমায় ভুলেছে। বাঁদর! হতভাগা কবে মর্‌বি! আমার হাড়ে বাতাস লাগবে কবে! তাহ'লে আর দুবেলা গিলিয়ে দিতে হবে না। মর! মর! মর! বেরো! বেরো! বেরো! দূর হ!" তার পরেই আবার প্রহারের শব্দ হইল। এ কি? কে কাকে মারে! তাকি বুঝিতে বাকী আছে? একজন গুণবতী ঠাকুর মা। আর ওই হতভাগা বালকটী অজা। এই গোলমাল শুনিয়া পাশের ঘর হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কিগো চারুর পিশী! কি হয়েছে? তোমার পাথর ভেঙ্গে দিয়েছে বুঝি!"

"হ্যাঁ! একেবারে টুকরা টুকরা করেছে। চোক্ নেই, অন্ধ হয়েছে, ঘোড়া যেন! আহা! আহা! এমন সুন্দর পাথর! আজ ওকে মেরেই ফেল্‌ব।" অজা খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাইয়া দরজার কাছে আসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই যায়গাটী তার বসিবার স্থান। এখানে বৃষ্টি তেমন পড়িত না। হায়! হায়! এমন ছেলে কোথায় পিতা মাতার আদরে, ভাই বোনের স্নেহে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবে, কত খেলা করিবে, না কোথায় অভাগা বালক সুখের শৈশব কাঁদিয়া কাটাইতেছে! মুখের দুটী মিষ্ট কথা শুনিতে পায় না। পিতামাতার স্নেহ কিরূপ, আদর কিরূপ, তাহা কখনও ভোগ করিল না। যেন কষ্ট সহ করিবার জন্যই ইহার জন্ম হইয়াছে। আহা! যার পিতা মাতা নাই তার কেহই নাই!—সে বসে বসে কাঁদ্‌ছে, এমন সময় মেনা তাহার কান্না দেখিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মেনা। কাঁদ্‌ছ কেন? কি হয়েছে ভাই অজা?

অজা। মেনা! আমার কপালে রোজই মার আছে। এমন একদিনও হয় নাই যে দিন ঠাকুমার কাছে গাল কি মার খাই নাই। আজ একখানা পাথর আমার হাত হতে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে ঠাকুরমা আমায় মেরে ঘর হ'তে বের করে দিয়েছেন। আজ আমায় ভাত পর্য্যন্ত দেবেন না। ভাই! আমি চিরকালই মার আর গাল খাব। আমার আর কেউ নাই। আমি বড় দুঃখী। তুমি, তোমার মা, আর সেই ফল-বেচুনী বুড়ী আমায় ভাল বাস। আর আজ একজন খোঁড়া বুড়োর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। সে আমায় অনেক ভাল কথা বলেছে? সে তোমায় দেখ্‌তে চেয়েছে।

মেনা। কেন, আমি গিয়ে কি করব? আমায় কেন ডেকেছে?

অজা। আমি তাকে তোমার কথা বলেছিলাম বলে সে তোমাকে দেখতে চেয়েছে।

মেনা। সে কোথায় থাকে?

অজা। ঐ কোণের ঘরে।

মেনা। তার পা নাই?

অজা। হাঁ তার পা আছে বইকি। কিন্তু সে বলেছে, তার পা দুটো কোন কর্ম্মের নয়। সে তা দিয়ে হাট্‌তে পারে না।

মেনা। আচ্ছা আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিব। তিনি যাইতে বলিলে যাইব। তুমিতো ভাই জান মা আমায় সব যায়গায় যাইতে দেন না। তবে আমি যাই। আর কেঁদনা ভাই।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। অজাও এক দিকে চলিয়া গেল। তখনও মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। একে শীতকাল, তাতে তার গায়ে কিছুই নাই। সে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রাস্তার এক ধারে বসিয়া ভিজিতে লাগিল। ফলওয়ালী তাহাকে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিল "ওকি বাছা শীতে বৃষ্টিতে ভিজিতেছ কেন? এস এস আমার কাছে এস। আহা! আহা! এমন ভয়ানক শীতে বৃষ্টিতে ভিজিলে অসুখ হবে যে। তোমার নামটী কিযাদু, ভুলে গিছি।" বালক দুঃখের সহিত বলিল "আমার নাম অজা।" বুড়ী বলিল, "বেশ ছোট নামটী। আয় বাছা আয়

আমার কম্বলের মধ্যে আয়। আর এই খাবারটুকু খা। এখন একটু গরম হতে পারবি।"—এই বুড়ীকে সকলে রামতারিণী বলে ডাকে। ছোট বেলায় ইহার স্বামী মরিয়া গিয়াছে। এ বড় গরিব। ফল বেচিয়া খায়, একলা মানুষ তাহাতেই চলিয়া যায়। ইহার বড় দয়ার শরীর। বিশেষতঃ ছোট ছেলে মেয়ের উপর ইহার বড় মায়া। ছোট ছেলে মেয়ের কষ্ট মোটে দেখিতে পারে না। অজাকে দেখিয়া তাহার মন একেবারে গলিয়া গেল। সে তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল "বাছা আমার বড় ভিজে গিয়েছ? চোকে জল কেন? কি হয়েছে যাদু, তাই কাঁদ্‌ছ?"

অজা। তুমি বড় ভাল মানুষ। তুমি স্বর্গে যাবে?

বুড়ী। না বাছা! আমি সগ্‌গে যাব এত বড় কি ভাগ্‌গি করেছি?—এই কথা না শেষ না হতে হতেই তার ঠাকুরমার গলা শুনে বেচারা অজা ভয়ে জড়সড় হয়ে বুড়ীর কম্বল মাথার উপর ঢাকা দিল।

অজার ঠাকুরমা বাড়ীর রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ গা, একটা খোঁড়া হনুমান ছেলে দেখেছ?" বুড়ী তাড়াতাড়ি উত্তর করিল "ওমা হনুমান হবে কেন গা? কখনই হনুমান নয়।"

অজার ঠাকুরমা অবজ্ঞার সহিত বলিল "তোমার চোকের চাউনিটা বড় ভাল দেখ্‌চি! সেটা বাঁদর নয়ত কি! আহা! হা! ছিরি দেখলে চোক জুড়োয়!

বুড়ী। ওমা তার মত ভাল বাঁদর এখানে পাওয়া যায় কি? অমন বাঁদর কার ঘরে আছে? যদি ছিরি দেখলে চোক না জুড়োয়, তবে দেখ কেন গা? না দেখলেইত পার।

"আমি দেখি আর নাই দেখি তোমার তায় কি গা" এই বলিয়া বুড়ো ঠাকরুন রাগে গজ্ গজ্ করে বক্‌তে লাগ্‌লেন। "হ্যাঁ গো হ্যাঁ! আর বলতে হবেনা, চুপ করে থাক। অমন ভাল বাঁদরের আজ-কাল আর ভাবনা নাই। দেখি সে বাঁদরটাকে পাই কি না। দেখব কেমন সে বড়্‌ডো ভাল বাঁদর হয়েছে, আসুক সে; আজ বাঁচ্‌তে হবে না।" যখন অজার ঠাকুরমা চলিয়া গেল, সে বলিল, "তুমি কেন বলিলে তুমি আমাকে দেখ নাই।"

বুড়ী।—ও যাদু আমি বুঝি তাই বলেছি? বাছাদের কি হনুমান ব'লতে আছে? ষাট্! ষাট্! ষষ্টির বাছা! হনুমান হবে কেন?—অজা এ কথার উত্তর না দিয়া তার বুকের ভিতর গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

বুড়ী বসিয়া বসিয়া খরিদারের অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় অজাকে জিজ্ঞাসা করিল "ও ধন! তোর ঠাকুরমা কি তোকে মারে?"—অজা কাঁদ কাদ হয়ে উত্তর করিল "হ্যাঁ মারে বই কি? এই দেখ!" এই বলিয়া হাতের যে মস্ত ঘা, তাহা দেখাইল।

বুড়ী। আহা! হা! মরে যাই। ষাট! ষাট! পরাণে কি একটু মায়া নেই! এমন ধারা করে কি মারে। ওমা! ছ্যা! এইবার যখন তোরে মারবে আমার কাছে আসিস। আমি তোকে রাখব। দেখব কে আমার মাণিকের গায়ে হাত তোলে!

বুড়ী অজাকে যে খাবার দিয়াছিল তাই সে খাইতে লাগিল। এখন তার খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ হয়েছে অজা এই বুড়ীর কাছে বসে আছে। এদিকে বুড়ী বাড়ী যাবার সময় হওয়াতে আপনার জিনিষ পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। তখন অজা তাহাকে বলিল—"দেখ আজ হতে তুমি আমার দিদীমা হ'লে; আমি তোমাকে দিদীমা বলে ডাকব।" এখন অজার মনে হইতেছে যে দিদীমাই তাহার সর্ব্ব প্রধান বন্ধু। মেনা যদিও সর্ব্বদাই তাহাকে দয়া করে, সাহায্য করে, কিন্তু দিদীমার মতন কি তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? তা কখনই পারে না? এখন

তাহার দিদীমা বাড়ী চলে গেল। সুতরাং সে মুখ খানি ভার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনেক দিন হইল অজা বুড়ো রামদাসের কাছে যায় নাই। কিন্তু মেনাকে না লইয়া তো সে যাইতে পারে না, কারণ রামদাস মেনাকে লইয়া যাইতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। এদিকে অনেক দিন হইল মেনা অজার কাছে আসে না। কাজেই রামদাসের বাড়ীতে যাওয়া হয় না।

একদিন অজা বসিয়া রোদ পোহাইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল মেনা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাহার নিকটে আসিতেছে; তাহার কপালে মস্ত একটা কাল দাগ—অজা বুঝিল তাহার বাপ মাতাল হইয়া মারিয়াছে। মেনার মুখখানি দেখিলে বোধ হয় তার যেন কোন দুঃখ হইয়াছে। মেনা নিকটে আসিয়া বলিল—"অজা! আজ কাল তোমাকে রোজই এইখানে দেখি!"

অজা। রোজই ঠাকুরমা বিকাল হলে বেড়াতে যান। যাবার সময় আমায় ঘর থেকে বের করে দিয়ে দুয়ারে চাবি দিয়ে যান। তাই এখানে বসে থাকি, আর কোথা যাব বল।

মেনা। সেই বুড়োটীর কাছে যাবে না? আমায় মা যেতে বলেছেন!

তখন তাহারা দুজনে মিলিয়া রামদাসের ঘরের দরজায় গেল। দরজা খুলিয়াই দুজনে ভয়ে ভয়ে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল—ঘরে ঢুকিতে সাহস পাইল না।

রামদাস দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"এসো, এসো, ভিতরে এস। আমি মনে করিতেছিলাম তুমি আমায় ভুলে গেছ। আজ, অনেক দিন পরে।

অজা।—না, না! ভুলি নাই। কিন্তু মেনা এতদিন আসিতে পারে নাই, তাই আমারও আসা হয় নাই।

রামদাস।—এই বুঝি মেনা! আমি তোমায় দেখে বড় খুসী হলাম। তোমার কপালে কিসের দাগ বাছা! পড়ে গিয়েছিলে বুঝি? "না—পড়ে যাইনি—" আস্তে আস্তে থেমে থেমে মেনা এই কথাগুলি বলিল।

রামদাস স্নেহভরে মেনার মাথা ধরিয়া বলিলেন "দেখি মা! দেখি। আহা বড় লেগেছে না? খুব ভুগেছ না?—আহা! ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।"

মেনা। মা আমায় রোজ রোজ ঈশ্বরের কথা বলে উপদেশ দেন; আমায় ভাল হতে বলেন।

রামদাস তাদের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন—"বেশ! আজ তোমার মা তোমায় কি বলেছেন?"

মেনা। মা আজ আমায় বলেছেন ভাল না হলে মানুষ ঈশ্বরকে পায় না। আর আমাকে বলেছেন, তুমি ভাল হবার জন্য খুব চেষ্টা ক'র আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'র।

রামদাস। আহা! বেশ কথা! দিব্যি কথা! তোমার বড় ভাগ্যি যে এমন মা পেয়েছ। আহা! ভাল মা পাওয়া কত সুখ! বাছা, যখন বড় হবে, তখন বুঝবে, যে এমন মা পেয়ে তুমি কতদূর সুখী হয়েছ।

মেনা মায়ের সুখ্যাতি শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এদিকে অজা মেনার কানে কানে বলিল "চল ভাই! আর দেরী ক'র না। চল! ঠাকুমা বক্‌বেন।"

মেনা রামদাসকে বলিয়া অজার হাত ধরিয়া বাহির হইল। আসিবার সময় রামদাস বলিয়া দিলেন—"আর একদিন এসো বাছা!"

ক্রমশঃ।

"এই সুখই বুঝি স্বর্গ"?

নলিনকে আজ বাড়ী শুদ্ধ সকলে খুঁজিতেছে, কোথাও পাইতেছে না, বালক আজ নিজের পড়িবার ঘরে চেয়ারে বসিয়া করযোড়ে

কি করিতেছে আর কাঁদিতেছে। মা টের পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন বাছা, কি হইয়াছে? কেহ কি মারিয়াছে, না গালি দিয়াছে?" নলিন মার কোলে উঠিয়া বলিল "না মা কেহ আমায় কিছু বলে নাই। আমি আজ খেলিতে খেলিতে ও পাড়ায় গিয়াছিলাম, গিয়া নারাণদের বাড়ীতে একটু বসেছি আর দেখি নারাণের মা, আহা! সে বোল্‌তে পারি না! বুড়ো রোগা, যেন মড়ার মতন ঠিক মা! একটা লাটী হাতে কোথা থেকে এলেন। দেখে আমার এমনি দুঃখ হ'ল তা আর বলা যায় না। তা আমি জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পার্‌লাম, যে তিনি ভিক্ষা করিয়া আনিলেন। হাতে একটী ছোট ধামী, তাহাতে দুটীখানি চাল আর কোঁচড়ে দুটো আঁব। সেগুলি ঘরে রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন। তার পর সেই চালগুলি সিদ্ধ করিয়া দুজনে সেই দুটী আঁব দিয়ে ভাত খেলেন, তখন বেলা ৫ পাঁচটা, মা। আমার তখন দুবার খাওয়া হইয়া গিয়াছে। মা, আমি শুনিলাম তাঁরা রোজ অমনি কোরে দিন কাটান। মা, তাঁদের এত কষ্ট, আর আমি কত সুখে, কত তরকারী, ডাল, ঝোল, দুধ, কতো কি দিয়ে দুবার ভাত খাই। আর কত খাবার খাই। আর আমি তা খাব না। এখন অবধি আমার খাবার থেকে অর্দ্ধেক আর তোমার খাবারের অর্দ্ধেক মা! নারাণকে আর তার মাকে দিতেই হবে, এ না হ'লে আর আমি শুন্‌বো না।" এই বলিয়া মার বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তার পরের দুঃখে দুঃখ দেখিয়া মাও থাকিতে পারিলেন না। তিনিও খুব কাঁদিতে লাগিলেন। তার পর সন্ধ্যার সময় চাকরকে দিয়া এক ধামা চা'ল এক হাঁড়ি ডা'ল ও অন্যান্য কত সামগ্রী এবং প্রায় ৫০টী আম্র এই সকল লইয়া নলিন ও তাঁহার মা নারাণদের কুঁড়ে ঘরে এসে বসিলেন। তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া কোথায় বসাবেন, কি কোর্‌বেন, কিছু ভেবে ঠিক কোর্ত্তে পারেন না। নলিনের মা নারাণকে কোলে করিয়া আদর করিতে লাগিলেন, তাহার দুঃখিনী জননী তাহা দেখিয়া আনন্দে ও উপকারে মোহিত হইয়া যেন কি হইয়া গেলেন। ঝর্ ঝর্ করিয়া তাঁহার চক্ষু দিয়া আনন্দের জল পড়িতে লাগিল। তিনি ভক্তিভরে নলিনের মার পায়ের তলায় আসিয়া পড়িলেন:—"মা তুমি কি দেবী না মানবী? কখনই মানুষ নও, নিশ্চিত তুমি দেবতা; মানুষের মনে তো এমন দয়া কখন দেখি নাই। ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন।" নলিন নারাণের গলা ধরিয়া তাহার বুকে আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছিল:—"ভাই নারাণ! তুমি আমার ভাই, আমার মায়ের পেটের ভাই! আর তোমার কষ্ট কোর্ত্তে হবে না। কাল থেকে তুমি আমাদের পাঠশালে যেও, আমি বাবাকে বোলে তোমার মাহিনা দিব।"

এইরূপে অনেক রাত্রি অবধি নারাণের মাকে শান্ত করিয়া সেই সব সামগ্রী তাহাদের ঘরে রাখিয়া নারাণকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া তাঁহারা বাড়ী গেলেন। আহা! সে রাত্রি গরিব নারাণ ও তাহার মার কি আনন্দ! সে দিন আবার নলিন ও তাহার মার আরও কত বেশী আনন্দ! বাস্তবিক বলিতে কি, যে উপকার করে, যে দুঃখীর দুঃখ দূর করে; যে অসহায়ের সহায় হয়, যে অনাহারীকে আহার দেয়, তাহার অপেক্ষা সুখী আর কে আছে? যে উপকার পায় তাহার যে সুখ, তাহার অপেক্ষা হাজার গুণে সুখী সে যে উপকার করে।

সে রাত্রে নিদ্রা যাইতে যাইতে নলিন স্বপ্ন দেখিল যেন তাহারা খুব গরিব হইয়া গিয়াছে, খেতে পায় না, পথে শুইয়া রাত্রি কাটায়। আর নারাণ খুব বড় মানুষ হইয়াছে, একদিন সে পথে নলিনকে কাঙ্গাল বেশে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাকে লইয়া বাড়ী গেল এবং তাহার সমস্ত টাকা, সিন্দুক পোরা পোরা মোহর, রাশি

রাশি সোণার গহনা, অগণ্য দাস দাসী, ঘোড়া গাড়ী সমস্ত নলিনকে দিয়া বলিল "ভাই! বাল্যকালে তুমি যে পরম উপকার করিয়াছ তাহার শেষ নাই। এক্ষণে তোমারই এ সব; আমি তোমার ছোট ভাই, আজ্ঞার অধীন। আমাকে যা বলিবে তাই শুনিব। তুমি ও তোমার মা এ বাটীর প্রভু, আমরা তোমাদের দাস দাসী।" আহ্লাদে নলিনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে মনে ভাবিল "ইহাই বুঝি সৎকর্ম্মের পুরস্কার, এই সুখই বুঝি স্বর্গ!"

আমাদের মহারাণী।

আমাদের দেশের রাজা ইংরাজেরা। তাই বলিয়া যে সকল ইংরাজই আমাদের রাজা তাহা নহে। আমাদের রাজা যিনি, তিনি ইংলণ্ডে থাকেন। অনেক যায়গাতেই তাঁহার রাজত্ব। তিনি ইংরাজদেরও রাজা, আমাদেরও রাজা। এখন যিনি আমাদের রাজা তিনি স্ত্রীলোক। ইহাঁর নাম মহারাণী ভিক্টোরিয়া। মহারাণী ইংরাজ স্ত্রীলোক বলিয়াই যে সকল ইংরাজ আমাদের রাজা বা আমাদের কর্ত্তা তাহা নয়। মহারাণীর চক্ষে আমরাও যেমন, সাদা ইংরাজেরাও তেমনি। তবে কেন যে সে ইংরাজ আসিয়া আমাদের ভয় দেখাইবে? আমাদের রাজা বলিয়া অত্যাচার করিবে? আমদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে? আমরা উহাদের ভ্রূকুটিতে ভয় পাইব না। যে সে ফিরিঙ্গী, যে সে চুনাগলির পচা সাহেব আসিয়াই যে আমাদের দেশের রাজা বলিয়া অহঙ্কার করিবে, অত্যাচার করিবে তাহা আমরা কখনও সহ্য করিব না। যার তার ভ্রূকুটিতে কেন ভয় পাইব? কেন উহাদের অত্যাচার সহ্য করিব? ওরা আমাদের রাজা বলিবার কে? উহারাও মহারাণীর প্রজা, আমরাও তাঁহার প্রজা; তাঁহার চক্ষে উহারাও যেমন আমরাও তেমন।

মহারাণী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ মে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এড্‌ওয়ার্ড ডিউক অফ্ কেন্টের একমাত্র সন্তান। ইহাঁর মাতার নামও ভিক্টোরিয়া। ইনি যখন এক বৎসরের বালিকা তখন ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তখন হইতেই সকলে মনে করিয়া আসিতেছিলেন যে ভবিষ্যতে ইনি আমাদের মহারাণী হইবেন। তখন হইতেই ইহাঁর মাতা ইহাঁকে রাণী হইবার মতন নানা গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন।

মহারাণী এমন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগের মহারাণী হইয়াও অহঙ্কার করেন না; মহারাণী বড় বিনয়ী। তিনি অতুল ধনের অধিকারিণী হইয়াও নানা বিদ্যায় বিভূষিতা। চিত্র বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ইহাঁর বেশ ভাল জানা আছে। আমাদের দেশের যে সকল লোক পিতার বিষয় কিম্বা একরাশ টাকা হাতে পান তাঁহারা প্রায়ই আজন্ম লেখা পড়া করেন না। গণ্ডমূর্খ থাকিয়া পিতার ধনে বাবুগিরি করেন, আর কত সব অসৎকার্য্যে ব্যবহার করেন; সৎব্যবহার ছাড়িয়া ধনের অপব্যয় করিয়া দুদিনে সমস্ত টাকা উড়াইয়া দেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি ইহাঁরা কি মহারাণীর চেয়েও বড়মানুষ; তাই তাঁদের লেখা পড়ায় কাজ নাই? লজ্জাও করে না! বিদ্যা কি কেবল ধনের জন্যই? না, বিদ্যার আরও সৎব্যবহার আছে? মূর্খের ধন বানরের হাতের মুক্তার হারের মত। বানর যেমন মুক্তার গুণ জানেনা, ব্যবহার জানেনা, মূর্খ ধনীও সেই রূপ। যে দেশের পুরুষের এই দশা, যে কিছু টাকা থাকিলে লেখা পড়া করে না, সে দেশের মেয়েদের কথাত ছেড়েই দাও। কিন্তু মহারাণী মেয়ে হয়েও, অতুল ধনের অধিকারিণী, প্রকাণ্ড দেশের মহারাণী হয়েও অতি যত্নে নানা বিদ্যা শিখিয়াছেন! আমাদের মহারাণী বড় গুণবতী;

তাঁর মন খানি দয়ায় মাখা। আমাদের রাণী বড়ই ভাল। লোকে অনেক ভাগ্য করিলে এমন রাণী পায়। যে দেশের রাজা কি রাণী এমন ভাল সে দেশের সৌভাগ্য অনেক।

পাঠক পাঠিকা! আমরা তোমাদিগকে মহারাণীর বিষয়ে কয়েকটী ঘটনা বলিব; তাহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে মহারাণীর মন কত বড়, এবং তিনি কেমন লোক।

(১) একদিন মহারাণী জানিলেন যে এক জন দুঃখিনী বৃদ্ধা মরিয়া যাইতেছে। নিকটে এমন কেহ নাই যে সেখানে গিয়া বৃদ্ধাকে মরিবার সময় দুটো ধর্ম্মের কথা শোনায়। শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কুটীরে গিয়া তাহার বিছানার পাশে বসিলেন এবং উপাসনা করিয়া তাহাকে বাইবেল পড়িয়া শুনাইলেন।

(২) এক নৈতিক বিদ্যালয়ে মহারাণীর ছেলে মেয়েরা ছেলেবেলায় পড়িতেন। একদিন এক জন লোক মহারাণীর ছেলে মেয়েদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা সব গুলিরই খুব ভাল উত্তর দিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"তোমাদের শিক্ষক খুব ভাল শিখাইয়াছেন।" তাহাতে তাহারা বলিল "আমাদের মা শিখাইয়াছেন, শিক্ষক শিখান নাই।"

(৩) রাণী যখন পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতেন, তখন তিনি প্রায়ই সামান্য লোকের মত পোষাক করিয়া গরিবের ঘরে গিয়া তাদের উপকার করিতেন, তাদের দুঃখের কথা শুনিতেন, আরও কত সময় ছদ্মবেশে যে কত লোকের উপকার করিয়াছেন তাহার ঠিক কি?

(৪) একদিন মহারাণী ছদ্মবেশে এক জহরীর দোকানে গিয়াছিলেন। সেখানে দেখিলেন এক জন স্ত্রীলোক একছড়া মুক্তামালার দর করিতেছেন। সে সময়কার বিবিরা স্বামীর অবস্থা না বুঝিয়া অনেক দামী জিনিষ পত্র কিনিতেন এবং স্বামীর নামে খাতায় বাকী লিখাইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিতেন। এ দিকে মাসের শেষে স্বামীর নামে হিসাব গেলে বেচারা স্বামীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত। এইতো ব্যাপার। মহারাণী আসিয়া দেখিতে লাগিলেন এই স্ত্রীলোকটী সেই রকম কি না। কিন্তু তিনি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন যে স্ত্রীলোকটী হারের দর শুনিয়া "অত টাকা দর দিবার মত আমার অবস্থা নয়," এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। স্ত্রীলোকের এইরূপ সুবিবেচনার পুরস্কার হওয়া উচিত, ইহা ভাবিয়া মহারাণী সেই মালাছড়া পরে কিনিয়া লইলেন, এবং সেই বিবিটীর নিকট নিজের নামে পাঠাইয়া দিলেন।

(৫) একদিন এক যায়গায় সাহেব বিবিদের নাচ হয়, নাচের উদ্যোগীরা অনেক করে মহারাণীকে নিমন্ত্রণ করে সেখানে লইয়া যান। কিন্তু মহারাণী ঘরের মধ্যে কিছুকাল থাকিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ফিরিয়া যান কেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "এখানে মেয়েরা এমন বেহায়া পোষাক পরিয়া আসিবে তাহা জানিলে আমি আসিতামই না?" মহারাণীর এই এক কথায় সেই দিন হতে পোষাকের শ্রী বদলিয়া গেল।

(৬) একবার একজন লোক মহারাণীকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মহারাণী বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। একটী মেয়ে তার বাবার কাছে এই কথা শুনিয়া মহারাণীকে এই মর্ম্মে পত্র লেখে যে "আমি বাবার কাছে শুনিয়াছি আপনাকে একজন লোক গুলি করিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আপনি এত ভাল তবে কেন আপনাকে লোকে মারিতে আসে। আমি আপনাকে বড় ভাল বাসি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই—যে আপনি বেঁচেছেন।" রাণী এত বড় লোক, তবুও এই সামান্য পত্র পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। আর মেয়েটীকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি পত্র লিখিলেন।

(৭) একদিন রাণী গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, দেখিলেন, রাস্তায় একজন মুটে কাঠ লইয়া যাইতেছিল, সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া কাঠ নামাইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছে। তাহা

দেখিয়া রাণীর অত্যন্ত দয়া হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া কাঠগুলি গাড়ীর উপর উঠাইয়া তাহাকে গাড়ীতে বসাইয়া তাহার যাইবার যায়গায় পৌঁছিয়া দিলেন। দেখ! মহারাণী কত মহৎ।

আমাদের এমন মহারাণীর বয়স এখন ৬৫ বৎসর। আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি অনেক কাল বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদের দেশের উপকার করুন, ইহাই আমাদের সকলের প্রার্থনা।

জ্ঞানই সূর্য্য।

তোমরা কি কখন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছ? কখন কি ভোরে ঘোর ঘোর থাকিতে বাহির হইয়াছ? তাহাহইলে অবশ্য দেখিয়া থাকিবে যে যতক্ষণ অন্ধকার থাকে ততক্ষণ যেন আকাশের ও পৃথিবীর কেমন কেমন ভাব। ঝোপে ঝোপে, গাছতলায় অন্ধকার, যাইতে ভয় করে, কি জানি যদি তথায় সাপ টাপ থাকে ত কামড়াবে? পাছে কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে সে সময় কোথাও যাওয়া যায় না, কোন কায করা যায় না, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে হয়। যেন আমরা চলিতে জানি না, যেন পৃথিবী আমাদের বেড়াবার স্থান নহে, যেন ঘরে থাকিবার জন্যই আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। আর যেমন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদিক ফরসা হয়, যেমন ক্রমে ক্রমে সূর্য্য উঠিতে থাকে, অমনি অন্ধকার পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়। আকাশের নক্ষত্রগুলি আর দেখা যায় না, সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকের অভাবে যাহারা, যে অগুন্তি নক্ষত্রগুলো মিট্ মিট্ কোরে জ্বল্‌ছিলো, তাহারা আর এখন সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, আর তখন তাহাদিগকে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। এদিকে সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আলোক পৃথিবী ছাইয়া ফেলে। কাজেই যে সকল গাছতলায় এতক্ষণ যাইতে পারিতেছিলাম না সেখানে যাইতে আর ভয় হয় না। যে সব স্থানে এতক্ষণ অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ করিতেছিল, সে সকল স্থানে এখন দিব্বি আলো ফুট্ ফুট্ করিতে লাগিল। কেমন সুন্দর! এই ত গেল, একদিকে অন্ধকার দূর হইল; আবার আর একদিকে যেখানে কিছু নাই বোধ হইতেছিল, সেখানেও কত সামগ্রী দেখা দিল। কেমন সুন্দর শ্যামল বৃক্ষের পাতাগুলি—তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া চিক চিক করিতেছে, কেমন সবুজ মখমলের বিছানার মত দূর্ব্বাঘাস গুলি ভূমিতল ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কেমন ছোট ছোট রাঙ্গা, সাদা, হলুদ, নীল নানা প্রকার বর্ণের ফুল সকল ফুটিয়াছে তাহাতে আবার গুণগুণ করিয়া মৌমাছি উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে বসিয়া ছোট শুঁড়টী দিয়া মধু চুষিয়া লইতেছে। কত শত পাখী, তারা সব এতক্ষণ বাসায় নিদ্রিত ছিল, এখন মহা আনন্দে বাহির হইয়া গান করিতে করিতে কচি কচি ছানাদের জন্য খাবার দ্রব্য আনিয়া ঠোঁটে করিয়া তাহাদের ছোট ছোট ঠোঁটের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। এক শ, এক হাজার, কত জিনিষ সব দেখা যায়—যখন সূর্য্যটী আকাশে উঠে। আর যতক্ষণ তা হয়নি ততক্ষণ রাত্রি, অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না।

মানুষের মনে জ্ঞানও ঠিক এইরূপ সূর্য্যের মত। যতদিন তাহার মনরূপ আকাশে জ্ঞান সূর্য্যের উদয় না হয়, যতদিন মনে জ্ঞান না জন্মে, ততদিন মন অন্ধকার থাকে, কিছু দেখা যায় না, কোন বস্তুর গুণাগুণ জানা যায় না। কাজেই মনে নানা প্রকার ভয় হয়। যে জানেনা, যাহার কোন জ্ঞান নাই, সে ত মানুষই নয়। আবার যতদিন না জ্ঞান-সূর্য্য উঠে ততদিন মানুষের মনে নানা প্রকার কুচিন্তা, কুভাবনা, অনেক রকম কু-আশা,

কত প্রকার লোভ, অসংখ্য নক্ষত্রের মত মনের আকাশকে ছাইয়া রাখে। যেই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় অমনি ঐ সকল নক্ষত্র আর জ্ঞানের জ্যোতি সহিতে না পারিয়া পলায়ন করে। তাই দেখা যায় অজ্ঞানাবস্থায় যাহারা দুষ্ট থাকে বড় হইয়া জ্ঞান লাভ করিয়া তাহারা ভাল হয়। অজ্ঞানে যাহারা অসচ্চরিত্র থাকে জ্ঞান পাইলে তাহারা পণ্ডিত, বিবেচক ও সাহসী হয়। যত দিন মানুষের জ্ঞান থাকেনা ততদিন কত জিনিষ মানুষ দেখিতে পায়না! মেঘ হয় কেন? পৃথিবী কি? গ্রহ উপগ্রহ কি? সূর্য্য কি? এ সকল বিষয় কিছুই না জানিয়া মূর্খ স্ত্রীলোকদের মতন কত কি ভুল ভ্রম লইয়া থাকে; তাহারা জ্ঞান লাভ করিয়া এ সকল বিষয় ঠিক বুঝিতে পারিয়া কত সুখ, কত আমোদ, কত আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

তাই বলি "জ্ঞানই মনাকাশের সূর্য্য।" জ্ঞান না হইলে মানুষই হওয়া যায়না, জ্ঞান না হইলে মানুষ পশু দুইই সমান। জ্ঞান না পাইলে চরিত্র ভাল করা যায় না, কখনও সৎ হওয়া যায়না। জ্ঞান না পাইলে কোন কার্য্যই করা যায়না, কোন পথ চেনা যায় না। অতএব তোমরা সকল সুখ, সকল আহ্লাদ আমোদ, সকল আশা আকাঙ্ক্ষা, সকল বিষয় অপেক্ষা এই সর্ব্ব সুখের মূল, সকল কার্য্যের আদি, জ্ঞানকে লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হও। আলোক না থাকিলে, সূর্য্য না থাকিলে পৃথিবী যেমন, জ্ঞান অভাবে মনুষ্যও ঠিক তেমনি হয়। শিশুগণ! প্রাণ পণে জ্ঞান লাভের জন্য মন দাও। "জ্ঞানই মনাকাশের সূর্য্য"।

আমাদিগের পুরস্কারের বিজ্ঞাপনের ফল।

আমরা বালক বালিকাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য স্বীকার করিয়াছিলাম যে (১) বার বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকা যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে (২) ১৬ বৎসরের কম বয়সের বালক বালিকা, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে, এবং (৩) যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকেও একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। এই রচনার মধ্যে তিনটী শ্রেণী ছিল—(ক) ৮ থেকে ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, (খ) ১১ থেকে ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, (গ) ১৪ থেকে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত।

পাঠক পাঠিকাগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে ৭ই জুন চিত্র এবং রচনা পাঠাইবার শেষ দিন ছিল। সুতরাং বোধ হয় বালক বালিকাদিগের জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে পুরস্কার কে পাইল। ধাঁধার পুরস্কার বৎসরের শেষে দেওয়া যাইবে, সুতরাং কেবল চিত্র ও রচনার পুরস্কারের কথা বলা যাইতেছে।

১। চিত্র।—৯জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঢাকা নিবাসী শ্রীমান বিনয়চন্দ্র গুপ্ত (বয়স ১৪ বৎসর) প্রথম হইয়াছেন। শ্রীমান সেখ সমসুদ্দীনের চিত্র মন্দ হয় নাই, তবে প্রথমটীর মত নয়, সুতরাং আমরা প্রথমটীকেই পুরস্কার দিব।

২। রচনা।

(ক) এই বিভাগে কেহই পরীক্ষা দেয় নাই।

(খ) রচনার বিষয়—"একটী ছোট মেয়ে মরে গেছে; তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন।" এই বিষয়ে পদ্য।

সর্ব্বশুদ্ধ ৮ জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে মোটের উপর শ্রীমতী সরলা দেবী (বয়স ১১ বৎসর ৯ মাস) প্রথম হইয়াছেন। তাঁহার রচনাটী প্রকাশ করা গেল। এই বিভাগের আরও দুজনের রচনার ভাল অংশগুলি তাঁহাদের উৎসাহের জন্য প্রকাশ করা গেল।—

"প্রাণের বাছারে মোর, হৃদয়েরি ধন!
মা বলে আয়রে কোলে জুড়াক্ জীবন।

তেমনি সুধার স্বরে একবার কথা ক'রে।
কেন মুখে নাই তোর একটী বচন?
কোথা সেই হাসিরাশি খেলাধূলা সব?
উঠ যাদু, প্রাণ যায় দেখিয়ে নীরব!
আকুল প্রাণের মাঝে আয় প্রাণধন!
আয় আয় প্রাণভোরে বুকেতে চাপিয়া ধ'রে
ও চাঁদ মুখেতে তোর করিরে চুম্বন।
তবু কথা কহিলিনে? তবু কেন জাগিলিনে
এখন রহিলি যেরে মুদিয়ে নয়ান!
কি দশা হয়েছে মার দেখ চেয়ে একবার
কি দোষ হয়েছে—কেন হেন অভিমান?
মায়ের প্রাণের বাছা কোথা ছেড়ে যাবি?
দিব না যাইতে তোরে বুকেতে রাখিব ধ'রে
হৃদয়ের দেবী হৃদি উজলি রাখিবি।
সাধের প্রতিমা! তোরে দিয়ে বিসর্জ্জন
কেমনে, কি লয়ে, আর ধরিব জীবন?
প্রাণের আলোক তুই, জীবন আমার,
ও আলো নিভিলে সব আঁধার আঁধার।
ত্যজিয়া এজন্মভূমি ভুলি এ মায়েরে তুমি
কোন্ জননীর কোলে লভিবে বিরামে?
জনম লইতে যাস্ কোন্ পুণ্যধামে?
অগণন দেব দেবীগণ আলোকের—
যেথায় খেলিছে বসি চরণে মায়ের,
চেয়ে সে মায়ের পানে কচি মুখে কচি প্রাণে
হাসিতে যাস কি ধন তুই (ও) সেই লোকে?
আমিও যাইব ওরে নিয়ে যারে সাথে করে
একেলা যাইতে ছেড়ে দিবনারে তোকে!"

শ্রীসরলা দেবী।
কলিকাতা।

"কেন একাকিনী পড়ে নীরবে শয্যায়!
সুখের খেলার কাল বৃথা বয়ে যায়।
উঠ বাছা, একবার চাও আঁখি মেলি,
কোলে বসি একবার ডাক 'মা' 'মা' বলি।
আর কি ও চাঁদ মুখে কথা না শুনিব?
আর কি সোনার চাঁদে কোলে না করিব?
উঠ উঠ প্রাণ-ধন! উঠ একবার
তোমার বিহনে দুঃখ নাহি সহে আর।
হের দেখ তব মা তোমায় হয়ে হারা,
দুঃখে তাপে হইয়াছে পাগলিনী পারা।"

শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
শালডাঙ্গা।

"কি খেয়ে এখন আমি বাঁচিয়া থাকিব?
কেমনে এ পোড়া প্রাণে অন্নজল দিব?
আয় আয় কোলে আয় ওরে যাদুমণি!
কাঁদে তোর মুখ চাহি অভাগা জননী।
খাওয়া পরা কাজ কর্ম্ম যে কিছু আমার—
যে কিছু আছিল সব লাগিয়া তোমার—
এবে যে হইল বাছা সকলি নিঃশেষ,
মায়ের কপালে এই ছিল অবশেষ!
মানুষের হাত নাই বিধাতার বিধি।
আমিও যাইব চল তুই গেলি যদি।"

শ্রীরামচরণ চৌধুরী।
নলডাঙ্গা।

(গ) "কাক ডাকিতেছে, জলেরর মধ্যে তাল গাছ, ঘোড়া ছুটিয়া গেল, ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিল, বাঘের ভয়, শিয়ালের বাচ্ছা, কি সর্ব্বনাশ! জামাযোড়া, বড় লোক, সাহসী পুরুষ, হৈ হৈ শব্দ, শিকারী"—এই কথাগুলি বজায় রাখিয়া একটী রচনা। এই বিভাগে ৯ জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী এবংসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ইহাঁদের রচনা প্রায় সমান হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে কে প্রথম ইহা স্থির করিতে আমাদের অনেক সময় গিয়াছে। আমরা অনেক ভাবিয়া অবশেষে সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে প্রথম স্থান এবং হিরণ্ময়ী দেবীকে দ্বিতীয় স্থান দিলাম। উভয়ের রচনাই প্রকাশ করা গেল। কিন্তু পুরস্কার প্রথম বালক পাইবেন।

১। "আর রাত্রি নাই। ভোর হইয়াছে, "কাক ডাকিতেছে।" অরুণের লাল ছবি জানালা দিয়া ঘরে আসিয়াছে। আমি তখনও শুইয়া আছি। এমন সময় বোধ হইল আমাদের বাটীর পার্শ্ব দিয়া "ঘোড়া ছুটিয়া গেল।" তাহার সঙ্গে আবার "হৈ হৈ" শব্দ।" সেই শব্দে ভীত হইয়া "ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিল।" সেই সময়ে আমাদের গ্রামে বাঘের ভয় হইয়াছিল, মনে করিলাম হয়তো কোনও "শিকারী" বাঘ শিকার করিতে আসিয়াছে। আমি তাহাদিগকে দেখিব বলিয়া তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া বাড়ীর সম্মুখের পুকুর-ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুকুর ধারের তালগাছগুলি জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন "জলের মধ্যে তালগাছ" হইয়াছে। দেখিলাম অনেক লোকজন সঙ্গে একজন ঘোড়সওয়ার যাইতেছেন—তাঁহার "জামাযোড়া" দেখিলেই "সাহসী পুরুষ" ও "বড় লোক" বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার এক অনুচর চীৎকার করিয়া বলিল, ঐ বাঘ দেখা যাইতেছে। শুনিয়া অশ্বারোহী সেই দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম "কি সর্ব্বনাশ!" যদি বাঘ ইহাঁকে বিনাশ করে, এমন সময়ে অশ্বারোহী নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, কৈহে বাঘতো দেখিতে পাইতেছি না। এযে একটা "শিয়ালের বাচ্ছা।" অন্যান্য সকলে, যে বাঘ দেখিয়াছিল, তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। এমন সময়, শিক্ষক মহাশয় উপস্থিত হইলেন, আমি বাটীতে আসিয়া পড়িতে বসিলাম। তাহার পর কি হইল জানি না।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৪বৎসর)
কলিকাতা।

২ "বনগ্রামে বড় বাঘের ভয় হইয়াছে। জমীদার যদুবাবু তাই আজ শিকারে যাইবেন। ভোর না হইতে হইতে শিকারীরা বন্দুক ছুড়িল। ভয়ে "ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিল," গৃহিণী তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া "জামাজোড়া" আঁটিয়া শিকারে গেলেন।

ভোর হইয়াছে "কাক ডাকিতেছে।" শিকারীদের যাইবার রাস্তার ধারে ধারে সরসী। তাহার "জলের মধ্যে তাল গাছ," তমালগাছ প্রভৃতির ছায়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, শিকারীরা গ্রামের সেই শোভাময় রাস্তা ছাড়াইয়া জঙ্গলের প্রায় কাছাকাছি আসিয়াছে, এমন সময় একজন "শিকারী" একটী "শিয়ালের বাচ্ছা" দেখিয়া ওই বাঘ ওই বাঘ বলিয়া ছুটিল, অন্যান্য শিকারীও "হৈ হৈ শব্দ" করিয়া সেই দিকে ছুটিল। বাঘের নামে বাবুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, হাতের রাশ শিথিল হইয়া পড়িল, অবসর বুঝিয়া "ঘোড়া ছুটিয়া গেল।" "কি সর্ব্বনাশ!" বাবু পড়িয়া গেলেন। ইনিই গ্রামে "সাহসী পুরুষ" বলিয়া খ্যাত, কেন না ইনি "বড় লোক"।"

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী (১৫ বৎসর ৫ মাস)
কলিকাতা।

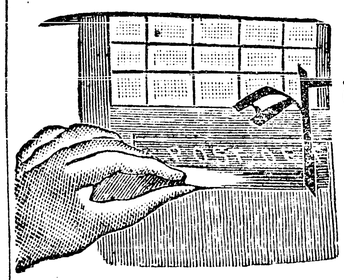

সখার প্রেরকদের প্রতি।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত শম্ভুগঞ্জ হইতে সখার একজন গ্রাহক "বালক বালিকার প্রতি উপদেশ" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলামনা। তিনি এই প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তুলিয়া দিলাম—"সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক "বালক বালিকার প্রতি উপদেশ" আপনার সখায় মুদ্রিত করিয়া চিরবাধিত করিবেন। আজ প্রায় ১৪। ১৫ মাস যাবত সখা লইতেছি, এলাগাত ১৪ ১৫টী প্রবন্ধ পাঠাইলাম দুঃখের বিষয় তাহার একটীও

মুদ্রিত হইলনা। হা বিধি! * *. এই প্রবন্ধ জুলাই মাসে মুদ্রিত হইয়া আসিলে সখার মূল্য পাঠাইব। * * * *। আমার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে এতদিন বহু গ্রাহক যুঠাইয়া দিতাম, তাহাও হ'লনা, আমিও দিলামনা। এইক্ষণ প্রার্থনা যে আমি একজন এজেন্ট হইব—সখায় আমার নাম ধাম স্পষ্টভাবে মুদ্রিত করিয়া দিবেন।"—আমাদের পত্রপ্রেরক সখার কেমন হিতৈষী! তিনি এতদিন সখা লইয়া মূল্য দিতেছেন না, আর ছাপাইবার উপযুক্ত নয় এমন প্রবন্ধ সকল পাঠাইয়া, না ছাপাইলে বেচারা সম্পাদককে গালাগালি দিতেছেন! আমরা ভাবিয়াছিলাম ইহাঁর নাম প্রকাশ করিবনা কিন্তু এমন হিতৈষীর নাম সকলেরই জানা উচিত; ইহাঁর নাম মহম্মদ জামালুদ্দিন।

শ্রীজয়কিশোর সেন, কাছাড়।—আপনার প্রেরিত "পাখীর প্রতি অত্যাচার করিওনা" নামক প্রবন্ধটীর ভাষা তত ভাল না হইলেও, ভাবটী বড় সুন্দর হইয়াছে। এই ভাবের একটী প্রবন্ধ এবারকার সখায় প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং আপনার প্রবন্ধটী দেওয়া গেলনা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু, ময়মনসিংহ।—লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের স্কুলের ছাত্রেরা একটী সভা করিয়াছেন; সেখানে একদিন "মাদক দ্রব্য সেবন" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সকলেই 'মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সভার সভাপতি মহাশয় ছেলেদের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য অনেক দিনের তামাক খাওয়া অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শ্রীরামচরণ চৌধুরী, নলডাঙ্গা।—ধূমপানের কি কি দোষ, তাহা গত বৎসর মার্চ্চ মাসের সখাতে লেখা হইয়াছে, তাহাই দেখিবেন।

শ্রীহরিহর মিত্র, কলিকাতা—এ কি রকম পদ্য! না আছে ছন্দ না আছে ভাব? চাঁদ উঠিলে কি 'পদ্মিনী" হাসে? এত বানান ভুল? লিখিলেই যে ছাপাতে হবে, তার কোন মানে নাই বোধ হ। তবে চেষ্টা করিলে দু একটী কবিতা ভাল হতে পারে, কিন্তু এরূপ চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট কর ভাল নয়। লাইন মিলাইলেই পদ্য হয়না—চেষ্ট করিলেই কবি হয় না।

ধাঁধা।

গতবারের প্রশ্ন গুলির উত্তর।

১। বিষ্‌কূট। ২। লবঙ্গ+(বো)লতা=লবঙ্গলতা

নূতন।

১। নিম্নলিখিত বাক্য গুলিতে যে যে পাখীর নাম লুকাইয়া আছে তাহা বাহির কর—

(ক) অভিমন্যু রণসাজে মাগিছে বিদায়—
দেখিয়া উত্তরা বালা করে হায় হায়!
কেঁদে বলে "রণে যদি যাবে বীরবর!
মোর গতি কি হইবে, কত অতঃপর।"

(খ) গতি নাই, দীন হীন, পড়িলাম পায়।
রাখ যদি, বাঁচি তবে; নহে প্রাণ যায়।

২। এক জন গোপালক খাল ছেড়ে বনের পাশে গেল, অমনি সে একটা রাক্ষস হয়ে গেল; বলতো কেমন ক'রে?

৩। আমার নাম শুনিলে ভয় হয়, অথচ আমি ধার্ম্মিক বলিয়া অমর হইয়াছি; আমি রাক্ষস, অথচ কাহারও হিংসা করি নাই, অনেক দিন হ'ল আমি এক জন ধার্ম্মিক লোককে সাহায্য ক'রে আমার ভাইয়ের সিংহাসন পেয়েছিলাম;—বলতো কে আমি?

বিজ্ঞাপন।

সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিটে সখার মূল্য পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে টাকায় অর্দ্ধ আনা কমিশন লাগিবে। যাঁহারা পোষ্টাল নোট বা মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সঙ্গে এক একখানি পোষ্টকার্ড লিখিবেন, নতুবা আমাদের কাজের ভয়ানক অসুবিধা হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

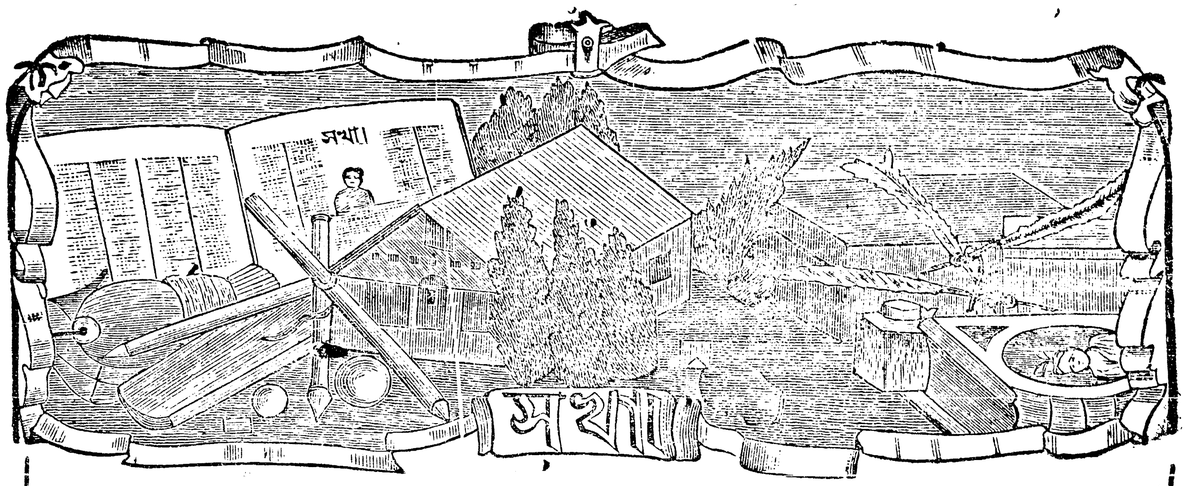

দ্বিতীয় ভাগ। আগষ্ট, ১৮৮৪। ৮ম সংখ্যা।

আর একটী দুঃখের খবর।

আমাদের দেশের কপাল বড়ই মন্দ। এই সেদিন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় দেশকে আঁধার করিয়া চলিয়া গেলেন। তার পরই এবার আমরা মৃত মহাত্মা শ্যামাচরণ বিশ্বাসের জীবনী দিলাম। আবার এরই মধ্যে দেশের মুখ-উজ্জ্বল আর একজন মহাপুরুষ প্রাণত্যাগ করিলেন। দেশের অধিকাংশ বড়লোক এইরূপে মরিয়া যাইতেছেন। বালকগণ! তোমরা এইবেলা ঐ সকল বড়লোকের স্থান অধিকার করিতে যত্ন কর। দৃঢ় ইচ্ছা থাকিলে ও যত্ন করিলে ঈশ্বর সহায় হইবেন। মৃত মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের জীবনের কথা আমরা আগামী বারের সখায় লিখিব।

ঐতিহাসিক গল্প।

তৃতীয় গল্প।

কিছুদিন যোগীন বাবু নানা কারণে তাঁহার গল্প বলিতে পারেন নাই। কিছুদিন পরে পুনরায় ভ্রাতা ভগিনী সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলে যোগীন বাবু বলিতে লাগিলেনঃ—

"আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভাল ইতিহাস রাখিয়া যান নাই বলিয়া আমরা এদেশের অতি পুরাতন কথা বেশী জানি না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অপরাপর দেশের লোক, কেহ বা হিন্দু রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে, আর কেহ বা কেবল বেড়াইবার জন্য এদেশে আসিতেন। তাঁহাদের দেশের ইতিহাসে ও তাঁহাদের লিখিত বইয়ে, ভারতের পুরাতন কথা কতকটা জানিতে পারা যায়। তার পর, আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস না থাকিলেও আর আর যে সকল সংস্কৃত কবিতা পুস্তক ও অপরাপর পুস্তক আছে তাহা হইতেও কতকটা এদেশের পুরাতন অবস্থা জানিতে পারা যায়। অনেক পরিশ্রম করিয়া এই সকল পুস্তক হইতে ও ভিন্ন জাতির ইতিহাসে ও ভিন্ন দেশবাসী ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষের যে সকল কথা লিখিত আছে তাহা হইতে পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন, যে দুই তিন হাজার বৎসর আগে এই দেশ পৃথিবীর মধ্যে অতি সভ্য ছিল। এদেশের অনেক ধন ছিল। এদেশের লোকেরা খুব ধার্ম্মিক ছিলেন। ইহাঁরা দেশবিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যাইতেন, এবং বিদেশ হইতে অনেক লোক এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আসিত। তখন চাষ করা হিন্দুদিগের প্রধান কাজ ছিল। তাঁহাদের আপন জাতীয় রাজকর্ম্মচারী

তখন দেশ শাসন করিতেন। তখন হিন্দু রাজার রাজত্বে হিন্দুগণ বাস করিতেন। তখন তাঁহারা বহুমূল্য পোষাক ও অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের গরু, গাড়ী, ঘোড়া, উট, সকলই ছিল। যে সহরে রাজার বাড়ী থাকিত, তাহার চারিদিক প্রাচীর দিয়া ঘেরা থাকিত। এই সকল বিবরণ পড়িয়া জানা যায় যে অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ নিতান্ত অসভ্য ছিল, তখনও আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা জগতে অতি সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

এই দেশে চিরদিনই বড় বেশী ফসল হইত। নানাপ্রকার বহুমূল্য ধাতু এদেশে জন্মাইত; এবং এই দেশের লোকেরা আগে বড় ধনী ছিল। ইহাঁদের ধনের লোভে নিকটবর্ত্তী রাজাগণ প্রায়ই সুযোগ পাইলে ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগেয় উপর অশেষ উৎপাৎ করিতেন। তখন ভারতবর্ষ নাকি আবার একটা অতি বড় নামজাদা দেশ ছিল, তাই যখন যে দেশে কোনও বড় সাহসী রাজা জন্মিতেন, তিনিই ভারতবর্ষ জয় করিয়া আপনার ক্ষমতা জাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কারণে মধ্যে মধ্যে অনেক বিদেশী রাজা আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছেন। ভারতের নাকি সম্পূর্ণ ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাই এই সমুদায় আক্রমণের বিবরণও সবটা জানা নাই। কেবল মাত্র অতি প্রসিদ্ধ যে দুই তিনটা আক্রমণের বিবরণ অপর দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় তাই আমরা জানি।"

"আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর গত হইল পারস্য দেশের রাজা দারায়াস্ একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। হিন্দুদিগের সঙ্গে তাঁহার ঘোর যুদ্ধ হয়। ঘটনাক্রমে হিন্দুরা হারিয়া যান। দারায়াস্ তখন সিন্ধুনদের তীরে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য স্থাপন করিয়া তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর হাতে ইহার শাসনের ভার দিয়া দেশে চলিয়া যান। কিন্তু দারায়াস্ ভারতবর্ষ জয় করিবার উদ্দেশে আসিয়াও সমুদায় দেশ জয় করিতে পারেন নাই, যাহা সামান্য একটু জয় করিয়াছিলেন, তাহাও ক্রমে তাঁহার হাত ছাড়া হইয়া যায়।

ইহার পর আজ প্রায় দুই হাজার তিন শত বৎসর হইল, আর একজন খুব বড় বিদেশী রাজা ভারতবর্ষ জয় করিতে আসেন। ইউরোপে মাসদেন নামে একটা দেশ ছিল,—ইনি সেই দেশের রাজা। ইহাঁর নাম সেকেন্দর। সেকেন্দর খুব বড় রাজা ছিলেন। তাঁহার মত যোদ্ধা সেই সময়ে এই পৃথিবীতে আর কেহ ছিলেন না, এইকথা তাঁহার দেশের ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকও তিনি অতি বীরপুরুষ ছিলেন। সমুদায় পৃথিবী জয় করিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হয়। তিনি বহু সংখ্যক সৈন্যসামন্ত লইয়া দেশবিদেশ জয় করিতে বাহির হন; এবং তখনকার অনেক দেশ জয়ও করেন। সেকেন্দর ক্রমে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়া ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন পঞ্জাব দেশে পুরু নামে রাজা ছিলেন। পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী যে সকল দেশ ছিল, তাহার হিন্দু রাজাগণ পুরু রাজাকে সাহায্য করিতে যান। সেকেন্দরের সঙ্গে হিন্দু রাজাগণের ঘোর যুদ্ধ হয়। অবশেষে অতি কষ্টে সেকেন্দর হিন্দুদিগকে পরাজয় করেন। কিন্তু পুরু রাজার সাহস, বিক্রম, ও যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া সেকেন্দর বড়ই আশ্চর্য্য হন। পুরুরাজকে জয় করিয়া সেকেন্দর ভারতবর্ষের অপরাপর রাজাগণকে জয় করিবার জন্য দেশের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। কিন্তু এক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই তাঁহার সৈন্য-সামন্ত বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সাধ তাঁহাদিগের মিটিয়াছিল। আর তাহারা অগ্রসর হইতে চাহিল না। সেকেন্দরসাহা অগত্যা দেশে ফিরিয়া চলিলেন।"

এই বলিয়া যোগীন বাবু সেদিনকার মত ভাই ভগিনীদিগকে বিদায় দিলেন।

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস)।

ইনি যাঁহার ছবি দেখিতেছ, উনি আমাদের দেশের একজন ভাল লোক, সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। নিতান্ত গরিব অবস্থাতে জন্মিয়া নিজ বুদ্ধি, পরিশ্রম ও চরিত্রের গুণে এ জগতে যত লোক বড় হইয়া গিয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইহাঁর অনেক সদ্‌গুণ ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

অনুমান ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ১১ বৎসর বয়সের সময় ইহাঁর পিতার কাল হয়; তখন ইহাঁদের অবস্থা অতি মন্দ ছিল, এসংসারে গরিব বিধবার সন্তানকে কত কষ্টে মানুষ হইতে হয় তাহা সকলেই জানেন। শ্যামাচরণকেও সেই কষ্টে মানুষ হইতে হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর ইহাঁর জননী ইহাঁকে ও ইহাঁর ছোট ভাইকে লইয়া কলিকাতার পটলডাঙ্গায় একখানি অতি সামান্য বাটীতে অতিকষ্টে বাস করিতেন। মায়ের মনে এমন আশা ছিল না যে পুত্র দুইটীকে লেখা পড়া শিখাইতে পারিবেন। বিধবার সন্তানের প্রতি কে দয়া করিবে, কে দুঃখী বলিয়া চাহিয়া দেখিবে? এ সময়ে তাঁহাদিগের দিন চলা ভার ছিল, এমন কি এই সময়ের উল্লেখ করিয়া মৃত শ্যামবাবু তাঁহার সন্তানদিগকে সর্ব্বদা বলিতেন, "বাপু তোরা ত রাজার হালে মানুষ হইতেছিস, আমার বালককালে খ্যাংরাকাটি দিয়া ছেঁড়া কাপড় শেলাই করিয়া পরিয়াছি।" এই কষ্টে তাঁহার মা তাঁহাদের দুই ভাইকে লইয়া দিন কাটাইতেছিলেন, এমন সময়ে বিধাতা প্রসন্ন হইয়া একটী সদুপায় করিয়া দিলেন। বঙ্গদেশের পরম বন্ধু চিরস্মরণীয় হেয়ার সাহেব সেই সময়ে তাঁহার স্কুল খুলিলেন, এবং কলিকাতায় পথে পথে যে সব বালক ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং আলস্যে দিন কাটাইত তাহাদিগকে ধরিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। শ্যামাচরণের মাতা তাঁহাকে এই স্কুলে পাঠাইলেন। শ্যামাচরণ অতিশয় বুদ্ধিমান ও মনোযোগী ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ভাল ছেলে বলিয়া সুখ্যাতি পাইলেন। তাঁহার উপর হেয়ার সাহেবের দৃষ্টি পড়িল। এরূপ শুনা যায় যে হেয়ার সাহেব তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে কেবল শিক্ষা দিতেন না কিন্তু তাঁহাকে আরও অনেক রকমে সাহায্য করিতেন, অতি নিকট সম্পর্কীয় লোকের মত সর্ব্বদা তাঁহাদের পরিবারের বিষয় খবর লইতেন এবং তাঁহার জ্বর কি অন্য কোন অসুখ হইলে, সেই সামান্য কুটীরে গিয়া দেখিতেন ও চিকিৎসা করাইতেন।

এইরূপে শ্যামাচরণ লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন।

সচরাচর বিধবার সন্তানদিগকে দেখিবার কেহ থাকে না, সুতরাং তাহারা কুসঙ্গীদের সঙ্গে পড়িয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শ্যামাচরণ অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, যেই তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল অমনি তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহার উপর হতভাগিনী মায়ের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে, তিনি বিপথে গেলে আর রক্ষা নাই। এই সময় হইতে তিনি সর্ব্বদা সুপথে চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা বড় ভয়ানক ছিল। বিশেষ কলিকাতায় আরো। তখন একটী বালকের ভাল পথে চলা কঠিন ছিল। এখন যত প্রকার সুশিক্ষা ও সদুপদেশের উপায় হইয়াছে, তাহার কিছুই ছিল না। কলিকাতার বালকেরা মাথায় চাদর বাঁধিয়া কেবল যাত্রা, কবি, হাপ্-আক্ড়াই শুনিয়া বেড়াইত। মদ প্রভৃতি কোন একটা নেশা করিত না এমন বালক অল্প ছিল। কুসঙ্গ কুদৃষ্টান্তের অপ্রতুল ছিল না। শ্যামাচরণ আপনার প্রতিজ্ঞায় এই সকল কুদৃষ্টান্তের মধ্যেও ভাল থাকিলেন। তাঁহাকে কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারিল না। অনেক লোক এককালে খারাপ থাকিয়া পরে ভাল হইয়াছেন, কিন্তু শ্যামাচরণের নামে কখনও কোন প্রকার কলঙ্ক শোনা যায় নাই।

এইরূপে পরিশ্রম ও সচ্চরিত্রতার গুণে শ্যামাচরণ সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেছেন এমন সময়ে একটী আপীষের কর্ত্তা কেরাণীগিরি কাজ করিবার জন্য হেয়ার সাহেবের নিকট একটী বুদ্ধিমান বালক চাহিলেন। হেয়ার সাহেব শাম্যাচরণকে পাঠাইলেন। শ্যামাচরণ প্রথম ৪০৲ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্ম পাইলেন। এই সময় হইতে তাঁহাদের সাংসারিক খরচের উন্নতি আরম্ভ হইল। তাঁহাকে যখন যে কার্য্যের ভার দেওয়া হইত তখন তাহা এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন যে তাঁহার প্রতি আপীষের কর্ত্তাদের শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দিন দিন তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি ৪০৲ চল্লিশ টাকাতে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া ১০০০৲ এক হাজার টাকা মাসিক বেতন পর্য্যন্ত উঠিয়া ছিলেন। তাঁহার এত দূর দক্ষতা ছিল যে তিনি বড় বড় ইংরাজ কর্ত্তাদের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়াছিল। এমন কি, ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় একবার ভারতবর্ষের রাজস্বের আয় ব্যয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিটী বসে, তাহাতে এই প্রকাশ পাইল যে শ্যামাচরণকে লইয়া যাইতে না পারিলে অনেক বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে না; তদনুসারে উক্ত কমিটী শ্যামাচরণকে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি নানা কারণে যাইতে পারিলেন না।

ক্রমে অনেক বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া অবশেষে তিনি পেন্সন লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি ভাল করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে আবার ১০০০৲ এক হাজার টাকার বেতনের একটী কর্ম্ম লইতে হইল। এই সময়ে তিনি সর্ব্বসমেত ১৫০০৲ পনর শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন। কেন তিনি বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন লইয়াও সুখে বিশ্রাম করিতে পারিলেন না তাহা পাঠকদিগকে বলা আবশ্যক হইতেছে। এইটী দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয় কত বড় দরের লোক ছিলেন, তাঁহার হৃদয় কত উদার ও মহৎ ছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ঐ ভ্রাতা একটী সওদাগরের আপীষে বড় কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায়

বাণিজ্যে অনেক টাকা লাগাইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ হঠাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহার অনেক হাজার টাকা ঋণ হয়। তাঁহার ভ্রাতা আপনাকে ধার শোধ দিতে অক্ষম জানাইয়া আদালত হইতে ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতি পান। ইহার পর লোকের আর ঋণ আদায় করিবার উপায় ছিল না, কিন্তু শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয় অতিশয় ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি ভ্রাতার সমস্ত ঋণ নিজ মস্তকে লইয়া ক্রমে ক্রমে শোধ করিবার ভার লইলেন। তিনি ২৫।৩০ বৎসর ধরিয়া এই ঋণ শোধ করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি এত উপার্জ্জন করিয়াও নিজের বাড়ীটীতে বালি ধরাইতে পারিলেন না; এই কারণেই বৃদ্ধবয়সে পেন্সন পাইয়াও তাঁহাকে আবার কর্ম্ম করিতে হইল। ইহা ভিন্ন তিনি গোপনে অনেক পরোপকার করিতেন। তাঁহার স্বভাবই এমনি ছিল যে তাঁহার কোন বিষয়ের প্রকাশ ছিল না। ইংরাজীতে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ছিল, অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল, দুই হস্তে পরোপকার করা ছিল, কিন্তু জগতের লোক তাহা জানিতে পারিত না। যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতেন এবং বিশেষ ভাবে পরিচিত হইতেন, তাঁহারাই জানিতে পারিতেন। এ সংসারে পরের জন্য যাঁহারা কষ্ট পান তাঁহারাই সাধু। শ্যামাচরণ বাবু সেই দরের লোক ছিলেন।

তিনি যে চল্লিশ টাকা বেতন হইতে পনর শত টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন, ইহার জন্য তিনি বড় নন; এজন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছি না, কিন্তু যে পরিশ্রম, যে প্রতিজ্ঞা, ও যে ধর্ম্মভীরুতার গুণে তিনি এত দরিদ্রাবস্থায় জন্মিয়াও এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং এতপ্রকার কুদৃষ্টান্তের মধ্যেও আপনাকে সৎপথে রাখিতে পারিয়াছিলেন, আমরা তাহারই প্রশংসা করিতেছি। তিনি যতকাল বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে সর্ব্বদাই কলিকাতা সহরের বিখ্যাত পণ্ডিত লোকদিগের সমাগম হইত। ইনি সকল প্রকার সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। সকল দলের লোক ইহাঁর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইনি যাহাকে অর্থের দ্বারা সাহায্য করিতে না পারিতেন সৎপরামর্শ দ্বারা উপকার করিতেন। এইরূপে ইহাঁর জীবন পরোপকারেই কাটিয়া গিয়াছে। আজ সমুদায় বাঙ্গালার লোক ইহাঁর জন্য শোক করিতেছে।

কোন জীবকে ক্লেশ দিওনা!

গাছতলায় অত লোকের ভীড় কেন? এত গোলমালই বা কিসের জন্য?—ঐ যে দেবন ছুটে আসছে? "কি হোয়েছে দেবন?" দেবন:—"আর কি হবে? গুণধর ছেলে পাখীর ছানা ধর্ত্তে গিয়ে নিজে ধরা পড়েছেন? আমাদের নগেন গাছ থেকে পড়িয়া হাত পা ভেঙ্গে বসেছেন, আর কি।" ছুটিয়া গিয়া দেখি যে নগেন চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, চক্ষু বুজান, বুক ধুক্ ধুক্ কচ্ছে, মুখে জল দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ৫০ জন লোক চারিধারে ঘিরিয়া "হায় হায়" করিতেছে। ডাক্তার আসিলেন, আসিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন;—আশা বড় কম।

ও আবার কি? চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আলুথালু কেশে, কে ও স্ত্রীলোকটী ছুটিয়া আসিতেছে? আহা! এই হতভাগিনী নগেনের জননী। মা আসিয়া যেই মৃতপ্রায় পুত্রের শরীর দেখিলেন অমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার প্রতি আবার সকলের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকে চেতন করিবার জন্য সকলে ধাবমান হইল। এসব কি ব্যাপার? কিসের জন্য এত কাণ্ড? নগেন কি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে? সে কি তাহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে গিয়া আঘাত পাই-

য়াছে? সে কি গরিবের দুঃখ দূর করিবার জন্য নিজের প্রাণকে হারাইতে বসিয়াছে? তাহা হইলেত বুঝিতাম যে মরণ সার্থক, তাহা হইলে এত দুঃখ হইত না। তা ত নয়, সে যে নিরীহ পক্ষীর ছানা-দিগকে ধরিয়া বৃথা কষ্ট দিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য গাছে উঠিয়াছিল। সে যে দুঃখিনী পক্ষিনীর স্নেহের ধন ছানাগুলিকে ডাকাতী করিয়া আনিবার জন্য গাছে উঠিয়াছিল। সে যে জননীর কোল শূন্য করিয়া জননীর নয়ন-তারা বাচ্ছা ধন চুরী করিতে গিয়াছিল। তাই আজ তাহার জননী নিজ হৃদয়ের ধন নগেনকে হারাইতে বসিয়াছেন। তাই আজ তাঁহার স্নেহের ধন পুত্র-টীকে চিরদিনের তরে বিসর্জ্জন দিতেছেন। অন্যায় করিয়া কাহারও সর্ব্বনাশ করিতে গেলে প্রায় আপ-নারই সেই দশা উপস্থিত হয়। আহা! একটা কি? কত শতটা পক্ষীর বাসাই যে নগেন ভাঙ্গিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। এত গুলি পক্ষীর হাহাকার রবে, এতগুলি নিরীহ জীবের যাতনায়, এতগুলি জননীর অভিশাপে, এতগুলি দীন হীন, অসহায় পক্ষী শাবকের মৃত্যু সময়ের রোদনধ্বনি ঈশ্বরের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাই, সেই মহাপাপের শাস্তি এতদিনের পর হইতেছে। ছি! ছি!! নগেনের আর দিবসে অন্য কর্ম্ম ছিলনা, কেবল টো টো করিয়া ঘুরিয়া পক্ষীর বাসা খুঁজিত। হৃদয়ে এক তিলও দয়া হইত না।

অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় নগেনের এ যাত্রা প্রাণ গেলনা কিন্তু একটী হাত ও একখানি পা চিরকাল ভাঙ্গিয়া রহিল। বেশ শিক্ষা পাইয়া বাছাধন এখন এমনি শান্ত হইয়াছেন যে যেন আর সে নগেন নাই। এখন যেখানে দেখে কোন বালক বা বালিকা কোন জীবকে ক্লেশ দিতেছে, যেখানে দেখে কোন লোক পুষিবার জন্য পাখী লইয়া যাইতেছে, যেখানে দেখে কেহ পক্ষী পুষি-তেছে, সেইখানে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া উপস্থিত হইয়া আপনার হাত ও পায়ের গল্প করে ও সকলকে ঐ নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে থামাইতে চেষ্টা পায়। সর্ব্বদাই বলে:—"আমাদের যেমন প্রাণ আছে, পশু পক্ষীদেরও ঠিক তেমনি আছে; আমরা যেমন কষ্ট হইলে কাঁদি ও যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহারাও তেমনি করে; আমাদিগকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সমস্ত জীবকেই তিনি সৃজন করি-য়াছেন ও নিয়ত আহারাদি প্রদান করিয়া তাহাদিগকেও প্রতিপালন করিতেছেন। স্বয়ং ঈশ্বর যাহাদিগকে মা হইয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, আমি কে—যে সেই বেচারা পক্ষী বা পশু শাবক-দিগকে কষ্ট দিই?" নিজের গত জীবনের নিষ্ঠুরতা উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদাই আক্ষেপ করে ও বলে "হায়! হায়! কত যে বৃথা নিষ্ঠুরতা করিয়া জীব সকলকে ক্লেশ দিয়াছি। অনর্থক কত যে পাখীর প্রাণে যাতনা দিয়া বিনাশ করিয়াছি, তাহা বলা যায় না! এখন সমস্ত জীবন পশু পক্ষীদের কষ্ট দূর করিবার জন্য উৎসর্গ করিলেও এ পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবেনা। যাহা হউক আমি যত দিন বাঁচিব, অসহায় পশু পক্ষী ও সমস্ত জীবের যাহাতে দুঃখের নাশ হয় তাহা করিব।" এইরূপে অতিশয় কাতর হইয়া দুঃখ করে ও রোদন করিতে থাকে। প্রতিদিন আহা-রের পর নিজ অন্নের প্রায় সমান ভাগ পশু পক্ষীদের জন্য রাখিয়া তাহাদিগকে স্বহস্তে আহার করায়। আহা! প্রাতঃকালে যখন তাহার খাবারের টুকরাগুলি পাইবার জন্য ৫০। ৬০ টী কাক ও শালিক প্রভৃতি পাখী জমা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে;—যেই নগেন বাহির হয়, অমনি সকলে মহা আনন্দে কলরব করিয়া যখন উড়িয়া তাহার নিকটে আসে, ও তাহার নিকট হইতে টুকরাগুলি তুলিয়া লইয়া আহ্লাদে আহার করে, তখন তাহা দেখিলে কতই না সুখ হয়! যখন বাড়ীর ছাগ ও বাছুর গুলির গলা ধরিয়া "যাদু, ধন, বাছা" প্রভৃতি কথা

বলিয়া আদর করে, যখন সে পথে ঘাটে সর্ব্ব স্থানে পশুপক্ষীদিগের দিকে চাহিয়া যত্ন করে, যেন সে তাহাদের কথা বুঝিতে পারে,—তখন যাহারা দেখে তাহাদের মনে বড় আশ্চর্য্য ভাব হয়।

মহা দুরন্ত দস্যু রত্নাকর কিরূপে পরম যোগী ঋষি বাল্মীকি হইয়াছিল তাহা তোমরা "সখাতে"ই পড়িয়াছ। এই আর একটী অদ্ভুত কাণ্ডও দেখিলে, সেই নিষ্ঠুর নগেন এখন প্রাণপণে পক্ষী ও পশু-দিগের কষ্ট দূর করিতে ব্যস্ত। বাস্তবিক সে যে সকল কথা বলে তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; যথার্থই অবলা জীবদিগকে ক্লেশ দেওয়া মহা-পাপ। আমরা ভরসা করি আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে কেহ এরূপ নিষ্ঠুর নাই, যদি কেহও থাকেন তবে যেন নগেনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া শিক্ষা পান। আমরা শুনিলে পরম আনন্দিত হইব যে একটী পা-ঠকও তাঁহার নিষ্ঠুর অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন।

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

তৃতীয় অধ্যায়।

স্তার উপরে একটী বাড়ীতে এক-জন স্ত্রীলোক, তাঁহার স্বামীর হাতে একটী কাগজে কিসের ছবি আছে, তাই দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ যায়গাটার নাম কি?"

স্বামী।—ইটের ঢক্।

স্ত্রী।—এ যায়গাটার অবস্থা কেমন?

স্বামী।—বড় খারাপ। আমার ভগিনীপতি বল্‌লেন, এ যায়গাটাতে বাস্তবিকই কিছু কাজ করা যায়। কিন্তু এখানকার লোকেরা এমন খারাপ, যে আমাদের উপদেশের কথা শুনিলে হয়। তিনি আরও বল্‌ছিলেন, ভগবানের দয়ায় একটা ভাল কাজ করবার যায়গা পেলাম।

উপরে যে স্বামী স্ত্রীর কথা বলিলাম, তাঁহারা পরোপকার করিবার জন্যই এই গরিবদের মধ্যে আসিয়াছেন। কাহারও কাহারও প্রকৃতিই এমন থাকে যে, তাঁহারা পরের উপকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। ললিতমোহন বাবু এবং তাঁহার গুণবতী স্ত্রী কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই; তবে পরোপকার নামে যদি কোন ধর্ম্ম থাকে, ললিত বাবু স্ত্রীর সহিত সেই ধর্ম্মকে প্রাণে ধরিয়াছিলেন।

এই গ্রামে আসিয়া ললিত বাবু প্রায়ই রামদাসের কাছে যান। তাঁর কাছে অজা মেনার কথা প্রায়ই শোনেন। তাঁর যত্নে, তাঁরই চেষ্টায়, মেনার পিতা মদ ত্যাগ করিয়াছেন; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আর কখনও মদ স্পর্শ করিবেন না, তাই আজ মৃণালিণীর বড় আহ্লাদ। ক্ষুদ্র বালিকার আহ্লাদ দেখে কে! আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, ছোট মুখখানি রাঙ্গা করিয়া প্রিয়সখা অজাকে সুখের সংবাদ দিতে আসিতেছে। পথে অজাকে দেখিতে পাইয়াই মেনা বলিয়া উঠিল—"ও ভাই! শুনেছ কি, কি হয়েছে? বাবা মদ ছেড়েছেন, আর মদ ছোঁবেন না। আমাদের এত আহ্লাদ হয়েছে, যে মা আর আমি সমস্ত রাত কেঁদেছি"—এই বলিতে বলিতে তার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

অজা।—তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? আহ্লাদ হলে কি মানুষ কাঁদে?

মেনা।—ওকি? তুমিও বোধ হয় বেশী আহ্লাদ হ'লে না কেঁদে থাক্‌তে পার না। কি করব, কান্না যে আপনি এসে পড়ে! চল, ভাই! রাম-দাসকে বলিগে, সে শুন্‌লে হয়তো কত সুখী হবে।

ইহার পর তাহারা দুজনে আস্তে আস্তে রাম দাসের ঘরের দরজায় উপস্থিত হইল। তাদের দেখিয়াই রামদাস বলিয়া উঠিল—"কি মা মিনু! ভাল খবর দিতে এসেছ বুঝি—এই বুড়োকে?

আমি আগেই শুনেছি তোমার বাপ মদ ছেড়েছেন। আমার শুনে যে আহ্লাদ হয়েছে, তা আমি আর বলতে পারি না।

এই সময়ে ললিত বাবু রামদাসের ঘরে বসেছিলেন, তাঁকে দেখে অজা ও মেনা লুকাবার চেষ্টা করিল। তিনি তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এসো মা! এসো; এসো বাবা! এসো;—ভয় কিসের? এসো আমার কাছে এসো।"—এই বলিয়া তাদের নিকটে আসিয়া দুজনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের নাম কি?"

তাহারা আপন আপন নাম বলিল।

ললিতবাবু।—তোমাদের দুজনে বুঝি বড় ভাব?

রামদাস।—একেবারে গলায় গলায়। যেখানে অজা সেইস্থানেই মেনা।

ললিতবাবু।—তোমাদের দুজনের মধ্যে কে বড়?

মেনা।—আমি এক বছরের বড়।

ললিতবাবু।—তুমি মা প'ড়তে পার?

মেনা।—হ্যাঁ, মা আমাকে রোজ পড়ান। আমি চারুপাঠ পড়ি।

ললিতবাবু।—তুমি বাবা কি বই পড়?

অজা।—আমি ক, খ, পড়ি। মেনা আমায় পড়ায়।

ললিতবাবু।—বেশ! খুব ভাল ক'রে প'ড়বে। ভাল হবার জন্য খুব চেষ্টা ক'রবে, তাহ'লে তোমাদের সকলেই ভালবা'সবে।—মেনা! তোমার বাবার নাম কি?

মেনা বলিল—"আমার বাবার নাম বিনোদবিহারী বসু।"

ললিতবাবু।—ওঃ! বটে? তুমি বিনোদবাবুর মেয়ে? তোমার বাপকে বলতে হ'চ্ছে তোমরা দুজনে রবিবার এক যায়গায় যাবে। তোমার বাপকে বল্লেই তিনি তোমাকে পাঠাবেন; অজার কথা তার ঠাকুরমাকে বল্লেই হবে।

ইহার পর ললিতবাবু অজার ঠাকুরমা ও মেনার বাবাকে বলিয়া অজা মেনার যাবার অনুমতি লইলেন। আজ রবিবার; অজা মেনা ললিতবাবুদের বাড়ীতে বালক বালিকাদিগের সম্মিলনে গিয়াছে। এই সম্মিলনে ললিতবাবুর স্ত্রী সুরমা দেবী বালক বালিকাদের উপদেশ দেন, গল্প বলেন, ছবি দেখান, তাদের নিয়ে খেলা করেন; এই জন্য ছেলেরা সকলে তাঁকে ভালবাসে। সুরমা দেবী অজা মেনাকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। অজার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" অজা চমকিয়া উঠিয়া বলিল "এ্যাঁ, আমার নাম অজা।"

সুরমাদেবী।—এতো ডাক্ নাম। তোমার আসল নাম কি?

অজা।—তা জানি না। আমার আর নাম নাই।

সুরমা।—নাম আছে বই কি? দেখি কে এর নাম ব'লতে পারে?

কেহই অজার যথার্থ নাম বলিতে পারিল না। তখন সুরমাদেবী কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া বলিলেন "যাঃ—আজ আমি তোমাকে কার্ড্ (নাম লেখা রং করা মোটা কাগজ) দিতে পার্‌ছি না দেখ্‌ছি। তোমার নামটী আগে জান্‌তে হবে!"

এই কথা শুনিয়া অজা কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্না দেখিয়া সুরমা দেবী তাহার চোখের জল মুছাইয়া বলিলেন "কেঁদ না, ধন! আস্‌ছে রবিবারে তোমায় একখানা দিব। তাতে দুঃখ কি? কেঁদনা, চুপ কর।"

বাড়ী যাবার সময় অজা কাঁদিতে কাঁদিতে মেনাকে বলিল "মেনা! সকলেই কার্ড্ পেলে, আমি পেলাম না, আমার মা নাই, আর এখন আবার নামও নাই।" মেনা পণ্ডিতের মত বুঝাইয়া বলিল—"তাতে আর দুঃখ কি? তোমার মা তো স্বর্গে আছেন? তোমার নামও অবিশ্যি কোথাও না কোথাও আছে"—পরে হঠাৎ কি মনে হওয়াতে

বলিয়া উঠিল—"লোকে বলে ঈশ্বরের কাছে নাম লেখা থাকে। তা হলেই তো তোমার নাম ঈশ্বর জানেন। এই তো মিট্ মাট্। আর কাঁদ কেন? তোমার মা স্বর্গে, তোমার নামও স্বর্গে লেখা আছে।"

মেনার মুখে এই কথা শুনিয়া অজা প্রফুল্ল হইল। মনে মনে বলিল—"তবে আর কি? আমার মাও আছেন, আমার নামও আছে! এইবারে তাঁকে ব'লব, আমার নাম স্বর্গে আছে, তা হ'লে একখানা কার্ড্ পাব।"

কিন্তু আজ অনেকদিন তারা কেউ ললিতবাবুর বাড়ীতে যায় নাই, কাজেই নামের কথাও বলা হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

ললিত বাবু আহার করিতেছেন, এমন সময় চাকর একখানা চিঠি আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি পত্রখানি পড়িয়া সুরমা দেবীর হাতে দিয়া বলিলেন,—"পড়িয়া দেখ; দেখে একটা কিছু ঠিক কর।"—সুরমা দেবী পড়িতে লাগিলেন—

"শ্রীচরণেষু,——দাদা! আমরা এখানে আসিয়া বেশ ভাল আছি। আমরা বেশ কাজ করিতেছি। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের কিছুরই অভাব নাই। বড় বাড়ী, ঘর দোর, পড়ে আছে; একটী ছোট ছেলে বেশ থাকিতে পারে, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াইতে পারে, কিন্তু ভগবান আমাদের সন্তান দেন নাই। বাড়ী, ঘর দোর আছে, কিন্তু ছোট ছেলের অভাব। তাই দাদা! আমার বড় ইচ্ছা যে তোমাদের ওগ্রামের মধ্যে যে ছেলেটী বা মেয়েটীর অবস্থা বড় খারাপ এমন একটী ছেলে কি মেয়েকে পালন করি। দাদা! একটী ছেলে কি মেয়ে যাহা পাও, খুঁজিয়া আমাদের এখানে নিয়ে এসো। আর অধিক কি লিখিব। বৌদিদীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিও। তোমরা কেমন আছ?

তোমার স্নেহের ইন্দু।"

সুরমা দেবী পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন—"তুমি কি বল? অজাকে দিলে হয় না? আমার তো ইচ্ছা তাকেই দাও।"

ললিত বাবু—সে যে খোঁড়া। তার শরীর বড় খারাপ।

সুরমা—ইন্দুতো তাই চায়। আহা! সে বড় কষ্ট পায়! এমন ছেলেকে যদি দয়া না কর তবে দয়ার পাত্র কে?

ললিত বাবু—হ্যাঁ, ছেলেটী বড় ভাল। রামদাস তার বড় সুখ্যাতি করে। অজার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিব, সে যদি দিতে চায়।

এইরূপ কথাবার্ত্তার কিছু দিন পরে ললিত বাবু অজার ঠাকুরমার কাছে অজাকে দিবার কথা বলিলেন। তাহাতে সে উত্তর করিল—"ছেলেটাকে বিদায় কর্‌তে পার্‌লেই বাঁচি। কিছু টাকা দিলেই দি?"

ললিত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "অজার আসল নাম কি?" অজার ঠাকুরমা এই কথা শুনিয়া একেবারে চটিয়া উঠিয়া বলিল "তোমার ওর নামে দরকার কি? নাম অজা! যদি এ নাম পছন্দ না হয়, তোমাদের যা ইচ্ছা সেই নাম দিও।" এই সকল কথা শুনিয়া সুরমা দেবী বলিলেন,—"তবে আর কি হবে? না হয় কিছু টাকা দিও। এতদিন খেতে প'রতে দিলে, তা টাকা নিতে পারে। গরিব মানুষ, কোথায় পাবে?" ললিত বাবু টাকা দিতে সম্মত হইলেন, অজার ঠাকুর মা চল্লিশ টাকা পাইয়া তাহাকে বিদায় দিল।

আজ ললিত বাবু অজাকে আনিতে গিয়াছেন। অজা আজ কাঁদিতে কাঁদিতে মেনার নিকট বিদায় লইতে যাইতেছে। মেনা তাহার চক্ষে জল দেখিয়াই ছুটিয়া তাহার কাছে আসিল ও গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! কাঁদ্‌ছ কেন?"—এই বলিয়া আঁচল দিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিল। অজা আর থাকিতে পারিল না; সে খুব জোরে

কাঁদিয়া উঠিল—"ভাই! আর তোমাকে এ জন্মে দেখিব না। আজ বিদায় নিতে এসেছি; আজ আমি যাব। আর তোমায় কখনও দেখিব না।"

মেনা—"সে কি? তুমি কোথায় যাচ্ছ? আর এখানে আ'সবেনা?" এই বলিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল। কিছু পরে বলিল—"যাই। রামদাসের কাছে যাই। এখনই যেতে হবে। এসো মেনা।"

মেনা মুখ খানি ভার করিয়া অজার সঙ্গে চলিল। রামদাসের ঘরের কাছে গিয়া দেখে দরজা খোলা। তাদের দেখিয়া রামদাস বলিয়া উঠিল—"বাবা! তুমি আজ না যাবে? ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন। আর বোধ হয় তোমাকে কখনও দেখিতে পাবনা। বাবা! চিরকাল সুখে থাক, এই আশীর্ব্বাদ করি। ভগবানের উপরে যেন তোমার মতি হয়। এই বুড়োকে মনে রেখো।"

রামদাসের নিকট বিদায় হইয়া অজা দিদিমার নিকট বিদায় লইতে চলিল। যাইবার সময় মেনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ভাই আর তুমি এখানে আ'সবেনা? আর তোমায় দে'খতে পাবনা? তুমি সেখানে গেলে আমায় ভুলে যাবে? আমায় ভুলো না; আমি তোমায় কখনও ভু'লব না। তুমি গেলে কার সঙ্গে খেলা ক'রব? কার সঙ্গে গল্প ক'রব? আমার আর কেউ রইল না।"

অজা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিল, পরে মেনার গলা জড়াইয়া চোখের জল মুছাইয়া বলিল—"ভাই! কেঁদনা। আমি তোমায় ভু'লব না। যদি তুমি আমার বোন হতে, তা'হলে তোমায় কখনই ছেড়ে যেতাম না! তোমার সঙ্গে খেলা ক'রতাম। লোকের ভাই বোনে ঝগড়া হয়—তোমার সঙ্গে আমার কখনও ঝগড়া হ'ত না।"

"অজা!—ভাই! যাই, দেরী হ'লে বাবা ব'কবেন। আর কখনও দেখা হবে না"—এই বলিয়াই মেনা কাঁদিয়া ফেলিল। ফের "যাই" বলিয়া অজাকে বারম্বার চুম্বন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া গেল। তখন অজা দিদিমার কাছে গিয়া বিদায় চাহিল। তাহা শুনিয়া ফলওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল "যাবে? কোথা যাবে? আর আ'সবেনা?"

অজা—বোধ হয় না।

ফলওয়ালী—ওমা সত্য নাকি? আহা! চল্লে? বেঁচে থাক বাবা! সুখে থাক! তুমি বড় ভাল ছেলে। এই নাও, পথে এই আম দুটো খেও। দিদিমারে ভুলো না।

সকলের নিকট বিদায় লওয়া হইলে, ললিত বাবু অজাকে সঙ্গে করিয়া আপনার ভগ্নী ইন্দুরেখার বাড়ীতে যাত্রা করিলেন এবং পথে অনেকক্ষণ গাড়ীতে কষ্ট পাইয়া অনেক বিলম্বে সেখানে গিয়া পৌছিলেন।

ঠাকুরদাদার গল্প।

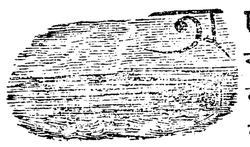

দিন অপরাহ্নে বাগানের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে নবীন বাবু সব ছেলেদের লইয়া তাঁহার বাঁধা ঘাটে বসিলেন। নলিনচন্দ্র মহারাজার এবার বড় আনন্দ, এবার তাঁহার একটী সম বয়স্ক বন্ধু আসিয়াছেন; নলিন ও মাখনে বড়ই ভাব। তাহারা গলা ধরাধরি করিয়া ফুল তুলিয়া পরস্পরকে সাজাইতেছে। নলিন ফুল লইয়া মাখনের কাণে, মাথায় দিতেছে। মাখন একটু সুতা পাইয়া একছড়া মালা গাঁথিয়া নলিনের বুকে পরাইতেছে। বড় সুন্দর! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়!

গল্প আরম্ভ হবে শুনিয়া দুজনে ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া দাদার কোলের গোড়ায় বসিলেন। সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠিক হইল যে আজ বাতাসের কথা বলা হবে। তখন "হু হু" করিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু বহিতেছিল। তাই কিশোরী প্রথম প্রশ্ন তুলিল যে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক হইতে ও

শীতকালে উত্তর দিক হইতে বাতাস বয় কেন? সকলে ঐ কথায় সায় দেওয়াতে নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন।—"এ বিষয়টী বড় কঠিন, এটী বুঝিতে হইলে অনেক বিষয় বুঝিতে হইবে। স্থির মনে ধীর ভাবে সকলে শুন। সে দিন বলিয়াছি, মনে আছে, যে উত্তাপ পাইলে কঠিন তরল হয়, আর পাৎলা জিনিষ বাষ্প হয়, আবার বাষ্পীয় পদার্থ আরও হাল্‌কী হইয়া যায়? (সকলেঃ—"মনে আছে") তাহা হইলে বেশ কথা। এখন গ্রীষ্ম কাল, সূর্য্য দুফুর বেলা মাথা ছাড়িয়ে খানিকটে উত্তর দিকে যায়; আর শীতকালে সূর্য্য প্রায় দক্ষিণ ধার দিয়া যায়, মাথার উপরই উঠে না। কেমন? (সকলেঃ—"ঠিক কথা।" কিশোঃ—"হাঁ দাদা, আমি ও কথাটা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম।") ওটী একটু বেশী শক্ত, এখন বুঝিতে পারিবেনা; কিন্তু মনে রাখিও গ্রীষ্মকালে সূর্য্য মাথা ছাড়িয়া উত্তরে যায়, তাহাকে "উত্তরায়ন" অর্থাৎ উত্তরে যাওয়া বলে; আর শীতকালে মাথা ছাড়িয়া দক্ষিণে যায় তাহাকে "দক্ষিণায়ন" বলে। আর এই উত্তর ও দক্ষিণ সীমার ঠিক মাঝখানে যে রেখা পৃথিবীর উপর দিয়া যায় তাহার নাম "বিষুবরেখা।

আর একটী কথা বড় দরকারী, বুঝিতে হইবে। মনে কর একটা প্রদীপ, তাহার ঠিক সুমুকে যত তাপ পার্শ্বে তত নয়। এটা যদিও ঠিক উপমা হলনা, তবু মনে বুঝে দেখ, একটী নিয়ম আছে, কোন তপ্ত জিনিষের তাপ যখন ঠিক সোজা পড়ে তখন যত গরম লাগে, বাঁকা হইয়া পড়িলে তত গরম লাগে না। মনে কর রোজ যখন সূর্য্য মাথার উপরে উঠে, তার তেজটা পৃথিবীতে ঠিক সোজা ভাবে পড়ে, তখনই বা গরম এত লাগে কেন, আর যখন সকালে বিকালে সূর্য্যের তাপ বাঁকা হইয়া পড়ে তখন মোটেই গরম বোধ হয়না কেন? ঐ কারণ। বুঝ'লে ত? (সকলেঃ—"হাঁ") এর পর এ কথা আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। এই নিয়মটী থাকার জন্যই শীতকালের রৌদ্র গরম বোধ হয়না, বরং আরাম বোধ হয়। আর গ্রীষ্মকালের রৌদ্রে বেলা ৯টার সময়েই দাঁড়ান যায়না। এই জন্যই দুফুর বেলায় আবার সকাল বিকালের চেয়ে বেশী তাপ থাকে।

বেশ কথা। এখন অতি সহজেই বুঝা যাইবে যে উত্তরায়নের সীমা হইতে বিষুবরেখার উপর দিয়া দক্ষিণায়নের সীমা পর্য্যন্ত যে ভূভাগ তাহাই সব স্থান অপেক্ষা অধিক উষ্ণ;—না? কেননা ঐ স্থানটীতেই সূর্য্যের তেজ সোজা পড়ে। সমস্ত বছরের মধ্যে সূর্য্য একবার উত্তর হইতে বিষুবরেখা দিয়া দক্ষিণ, ও পরে দক্ষিণ হইতে বিষুবরেখা হইয়া আবার উত্তর, এই পথ টুকু চলে। কেন চলে, সে কথা এখন বুঝিতে পারিবেনা, কিন্তু চলে। পৃথিবীর মধ্যে এই সীমা দুটীর বাহিরে অন্য কোন স্থান সূর্য্যকে আর মাথার উপর পায় না। বুঝিলে? এসব বড় শক্ত কথা, একটা গোলক হলে বেশ বোঝা যায়। বাড়ী গিয়ে সকলে গোলক দেখিবে। যাহোক, এ টুকু বেশ বুঝিয়াছ যে বিষুবরেখাতে ও তাহার নিকটস্থ স্থান সকলে সূর্য্যের তেজ বড় অধিক। আরও বুঝিলে যে গ্রীষ্মকালে "উত্তরায়ন" হয় বলিয়া উত্তর সীমা দক্ষিণ সীমা অপেক্ষা অনেক অধিক উত্তপ্ত হয়। আর শীতকালে "দক্ষিণায়ন" বলিয়া বিষুবরেখার দক্ষিণ ভাগ উত্তর ভাগ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়। কেমন? (সকলেঃ—"এটুকু বেশই পরিষ্কার হইয়াছে।")

বেশ কথা। এখন ম্যাপে দেখিও বিষুবরেখা ভারতবর্ষের কিছু দক্ষিণে আছে। (কিশোঃ—"আমি জানি।") হাঁ বাড়ী গিয়া ম্যাপে দেখিলেই টের পাবে। যে সোজা একটা লাইনের গায়ে "০" শূন্য লেখা আছে সেইটারই নাম বিষুবরেখা। সেটা আমাদের দেশের কিছু নীচে দিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ দিয়া গিয়াছে। ওদিকে সূর্য্যের উত্তরায়নের সময়

হিন্দুস্থানের উত্তরভাগ এবং তার ওপারের তিব্বৎ, চীন, তাতার প্রভৃতি দেশ সকলের উচ্চ উচ্চ মরুভূমির মত স্থান সব খুব উত্তপ্ত হয়। আমরা ভারতবর্ষের উত্তরভাগের লোক, সুতরাং এ কথা আর বেশী বুঝাইতেই হইবে না। গ্রীষ্মকালে যে আমাদের দেশ কিরূপ ভয়ানক গরম হয় তাহা ত সকলেই জান। আবার দক্ষিণ দিকে সূর্য্য না থাকায় দক্ষিণ দিকের ভারত মহাসাগর ও তাহার চারিদিকের স্থান সকল আমাদের দেশ অপেক্ষা শীতল থাকে। দেখ এটী না বুঝিলে আর কিছুই হবে না। আমি আবার বলি—গ্রীষ্মকালে উত্তরায়ণ হয় অর্থাৎ সূর্য্য বিষুবরেখার উত্তর দিকে চলিয়া আসে। তাহাতে ভারতবর্ষের উত্তরভাগ ও তিব্বৎ তাতার প্রভৃতি দেশের শুষ্ক স্থান সকল ভয়ানক গরম হইয়া উঠে। কিন্তু সূর্য্যের সোজা কিরণ না পাওয়াতে দক্ষিণ দিকে ভারতমহাসাগর ও তাহার চারিদিকের জলরাশি ঐ সব যায়গার চেয়ে ঠাণ্ডা থাকে। বুঝিলে ত? অ্যাঁ? (সকলেঃ—"বেশ বুঝিয়াছি দাদা মহাশয়")।

নলিন—"আমিও বুঝিতেছি, দাদা।"

মাখন—"হ্যাঁ দাদা! আমিও।"

কিশোরী—"হ্যাঁ মাখন, বুঝিয়াছিস? আচ্ছা বল্ দেখি বিষুবরেখা কাকে বলে?"

মাখন—হ্যাঁ তা বুঝি আমি জানি? অতো আমি ত বল্‌তে পারি না। আমি যদি অতো বুঝ্‌তুম তা হলে তোমায় দাদা বোল্‌বো কেন? হ্যাঁ দাদা? আমি কি অতো বলিতে পারি?"

গোলযোগ মিট্‌মাট্ করিয়া দিয়া নবীন বাবু আবার আরম্ভ করিলেনঃ—"তোমরা সকলেই জান, যাহা প্রথমেই বলিয়াছি যে তাপ পাইলেই বস্তুসকল আরও পাৎলা হয়, আর কাজে কাজেই পাৎলা হইলেই হাল্‌কী হয়। এ নিয়ম কঠিন, তরল, বাষ্পীয়, সকল পদার্থেই খাটে। এখন যদি দুই স্থানে দুটী পাত্র বায়ুতে পূর্ণ করিয়া তাপ দেওয়া যায় তবে যেটাতে বেশী তাপ দিবে সেইটা বেশী ফুলিয়া উঠিবে। আর যেটা বেশী ফুলিবে, তাহার ভিতরের বায়ু অন্যটার চেয়ে হাল্‌কী হবে। তেমনি যে দেশের বায়ু যত গরম হবে সে দেশের বায়ু তত হাল্‌কী হবে। আর যেখানকার বায়ু যত শীতল হবে সেখানকার বায়ু তত ভারী হবে। এ অতি সহজ কথা। কেননা গরম হলেই ফোলে অর্থাৎ তাহার পরমাণু সকল ফাঁক্ ফাঁক্ হইয়া যায়, কাজেই হাল্‌কী হইয়া যায়। আচ্ছা! এখন দেখি কোথায় এসেছ? ভারতবর্ষের উত্তরভাগ ও তিব্বত তাতার প্রভৃতি দেশের বায়ু গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গরম হয়, কাজেই উহা হাল্‌কী হয়। তার পরে কি? হাল্‌কী হলেই চারিদিকের ভারী বাতাসের উপরে উঠিবে। যেমন একটা আগুনের কুণ্ড করিলে তাহার উপরের বাতাসটা গরম হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের ধূলা, পাতা নাতা পর্য্যন্তও উঠিতে থাকে, তেমনি এখানেও ঐ সকল গরম বাতাস উপরের দিকে চলিয়া যায়, নীচেটা খালি হইয়া যায়। কিন্তু পাৎলা জিনিষের দস্তুরই হোচ্ছে যে খানিকটা তুলে নিলে চারিধার থেকে আসিয়া সে স্থানটা পূরিয়া ফেলে। এক ঘটী জল পুকুর থেকে তুলিয়া লইলে তাহার যে গর্ত্ত মতন হয়, সেটা তখনই চারিদিকের জলে আবার পূরিয়া যায়। তেমনি যেই সেই গরম হাল্‌কী বাতাস উপরে উঠে, অমনি চারিদিকের যেখানে ঠাণ্ডা ভারী বাতাস থাকে তা এসে সেই খালি যায়গা পূরে ফেলে। বুঝলে? (সকলেঃ—"হাঁ, বেশ বুঝেছি") ভাল। এখন বল দেখি কোন্ দিক থেকে হাওয়া কোন্ দিকে যাবে? (সকলেঃ "কেন ভারী ঠাণ্ডা বাতাস দক্ষিণ দিকে ভারতমহাসাগরে আছে, তাই যাবে উত্তর দিকে; না?") ঠিক। দক্ষিণে যে শীতল ভারী বায়ু আছে তাহাই "হু হু" করিয়া বহিয়া গিয়া উত্তর দিকের সেই ফাঁক বুজাইয়া দিবে। এখন ভাবিয়া দেখ কতোখানি যায়গা

এই রকম ফাঁক হইয়াছিল—? এমন কি, অনেক হাজার বর্গমাইল ভূমি একেবারে বায়ুশূন্য হইত, যদি এই বায়ুর প্রবাহ দক্ষিণ দিকের সাগর হইতে না আসিত। এই জন্যই সমস্ত দিন এত জোরে দক্ষিণে হাওয়া হয়। রাত্রিতে যখন উত্তর দিকের ঐ সকল স্থানে সূর্য্য না থাকাতে উহাদের বায়ু শীতল হয়, তখন আর উহা উপরে উঠে না, এজন্য রাত্রে আর তত জোরে বায়ু দক্ষিণ দিক্ হইতে বহে না। কোন কোন রাত্রে মোটেই হাওয়া থাকে না তাহারও কারণ এই। যে দিন যত অধিক রৌদ্র হয়, সে দিন প্রায় তত অধিক তেজের সঙ্গে দক্ষিণে-হাওয়া হইতে দেখা যায়। আর সমুদ্রের উপর হইতে আসে বলিয়া ঐ হাওয়া বেশ শীতল হয়, সমস্ত দিনের অসহ্য গ্রীষ্ম, তার পরে সন্ধ্যার সময়ে দক্ষিণে-হাওয়া কি সুন্দর, কি স্নিগ্ধ, কি হৃদয় শীতল-কর! সকলে এখন দক্ষিণে-হাওয়ার কারণ বুঝিলে? এ বিষয়টা একটু গোলমেলে, তবু বার দুই তিন মন দিয়া "সখা" পড়িলেই মনে থাকিয়া যাইবে।"

কিশোরী বলিল "আচ্ছা দাদা মশাই! শুনুন দেখি এখন আমি বলিতে পারি কি না শীতকালে উত্তর দিক হইতে বায়ু বহে কেন?—শীতকালে দক্ষিণায়ন, এজন্য সূর্য্য দক্ষিণ দিকে থাকে, কাজেই দক্ষিণ দিকের সাগরের জলটল খুব নরম হয়, উত্তর দিক তখন শীতল থাকে। এখন দক্ষিণের গরম বায়ু উপরে উঠিয়া যায় ও তাহার বহানে উত্তর হইতে শীতল ও ভারী বাতাস আসিয়া উপস্থিত হয়।"

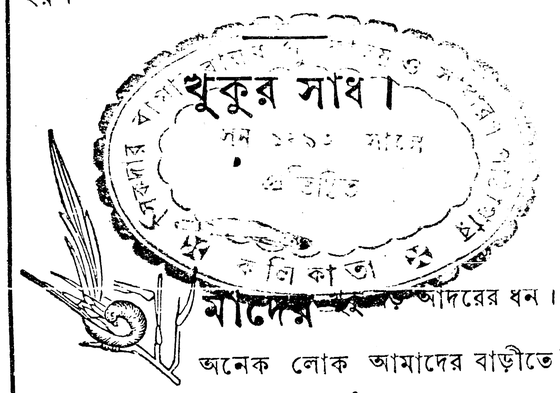

মাদের আদরের ধন।

অনেক লোক আমাদের বাড়ীতে আসেন, সকলেরই সঙ্গে তার খুব ভাব। খুকু সকলের সহিতই মহা আনন্দে মনের সুখে দিন কাটায়। তার ভাল নাম আছে, খুবই ভাল নাম, তবু কি জানি আমরা সকলে কেমন তাকে "খুকু খুকু" বলিয়া ডাকিতে ভাল বাসি। আহা! অমন মিষ্ট কথা বুঝি আর নাই! খুকুর বয়স এই সবে মাত্র তিন বছর। কিন্তু এরই মধ্যে সে এত কথা কয়, এত গল্প করে, এত আমোদ করে যে দেখিলে অবাক হইতে হয়। গায়ে একটুও গয়না নাই, পরে না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ত বলে "ও সব সোণার গয়না আমি প'রব না, বাবা আমাকে আকাশের তারা গুলোকে পেড়ে কণ্ঠমালা কোরে দেবে, আর মা বলেছে যে খুব বড় গোল পানা যে দিন চাঁদটী উঠিবে, সেই দিন সে খানাকে ছিঁড়ে এনে আমার জন্যে বাজু গড়িয়ে দেবে!"

খুকু এমনি ভাল লোক যে বাড়ীতে কোন লোক এলে অমনি তাঁহার সঙ্গে নানা রকম কথা বার্ত্তা কহিয়া তাঁহার মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। বাবা আসিতে যদি দেরী থাকে তবে সে লোকের কোন কষ্টই দেয় না। যদি তিনি বলেন "আমি যাই, তোমার বাবার দেরী হচ্ছে" তবে খুকু মহা দুঃখিত হইয়া বলে "না যেতে দেবোনা। আর একটু থাকুন না বাবু! থাকুন।" এই বলিয়া হয় একটা পান, নয় একখানা সাবান কি অন্য কিছু বাড়ীর ভিতর থেকে নিয়ে ছুটে আসে আর বলে "এইবার থাকুন আর একটু বাদেই বাবা আ'সবেন।" আরও বলে "দেখুন! ঐ যে নিচু গাছটী দেখ্‌ছেন ওটা আমি পুতেছি, আর ঐ গাছটীতে নিচু হোলে আপনাকে দেবো। আর আমি আপনাদের বাড়ী যাবো, গিয়ে আপনাদের, খুকীদের বেশ কোরে আমার কাপড়, গয়না, সব পরিয়ে দিয়ে আস্‌বো। কেমন?" এইরূপ কি চমৎকার যে তাহার কথা বার্ত্তা, কি সুন্দর কি মনোহর তা আর বল্‌তে পারি না। আহা! যদি দেখবার হোতো তাহ'লে, পাঠক পাঠিকা! তোমাদের সকলকে দেখাতুম কি মেয়ে! আবার এদিকে এমনি স্মরণ শক্তি যে "সখা"র পায়রামণি প্রভৃতি অনেক পদ্য মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। সে বলে আমি বড় হ'য়ে "এ রকম গান লিখ্‌বো।"

তোমরা আশীর্ব্বাদ কর ঈশ্বর কৃপায় খুকু আমাদের বেঁচে থাক্ ও বড়লোক হোয়ে দেশের বালক বালিকাদের উপকার করুক।

চালনি বলেন ছুঁচ ভাই তুমি কেন ছেঁদা ?

কেনারাম সম্মুখের লোকটীকে দেখাইতেছেন। তাঁর নিজের পীঠের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে হইত। নিজের দোষগুলিকে সকলেই পেছনে ফেলিয়া দিতে চায়। আমি চেঁচিয়া বলিলাম লোকনাথ বড় রাগী, আমি তাহাকে ভালবাসি না ; বল দেখি ভাই, আমার সম্বন্ধে তুমি কিরূপ মনে করিতেছ ? অন্যের ছেঁড়া মোজা দেখিয়া বিরক্ত হওয়ার আগে নিজের জুতার ভিতর চাহিয়া দেখা ভাল। আমি যতক্ষণ বসিয়া থাকিব, ততক্ষণ তুমি হাঁটিতেছ না বলিয়া আমার বিরক্ত হওয়ার অধিকার কি ? আর যদি এমন হয় যে আমি হাঁটিতেছি, তাহাতেই বা কি হইল ?

অন্যের তিলটীকে তাল করিবার পূর্ব্বে নিজের তালটী ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া ভাল। গম্ভীর ভাবে বক্তৃতা করিলে কি হয়, পরক্ষণেই যদি বক্তা নিজের অসারত্ব হাতে কলমে বুঝাইয়া দেন, তবে লাভ কি হইল ?—লাভ হইল যে, অন্য কেহ ঐ বিষয় নিয়া আমাকে কিছু বলিলে, আমি তাহাকে বলিব "আরও একজন একবার বলিয়াছিলেন।" আমার দোষ দেখিয়া তোমার কষ্ট বোধ হইয়াছে ?—ভাল। কিন্তু কষ্ট পাইয়া যদি তুমি আসিয়া মুরুব্বী লোকের মতন আমাকে বকিতে থাক, তবে হয়তো লাভের মধ্যে এই হবে যে তোমাতে আমাতে যে ভালবাসাটুকু ছিল তাহা আর থাকিবে না। ক্লাশে একটী নূতন ছেলে আসিল—বেচারাকে যেন খেলার সামগ্রী পাইলে ; অত বোকা বুঝি আর কেহ কখনও দেখে নাই ! কিন্তু মনে পড়ে কি ? তোমাকে যখন ধরিয়া বাঁধিয়া ইস্কুলে মাষ্টার মহাশয়ের কাছে দিয়া যাওয়া হইয়াছিল তখন তুমিও একটী জানোয়ারের মতন ছিলে কি না ? অন্যের ত্রুটী নিয়া হাসি তামাসা করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের অনেকেরই দেখা যায় মেজাজটী বড় উগ্র—কথা সয় না। ইহাঁরা যদি অন্যের উপর ঢিল ছুড়িবার সময় নিজের গায় মারিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। না হয় প্রতিপক্ষের পাটকেলটীর সময় যেন মুখ বিকৃত না করেন। বাস্তবিক ওরূপ লোকের ঐ ঔষধ—আমি বলিলাম "খক" তুমি বলিলে "থুঃ"। বেশ সমানে সমানে গেল। এরূপ বার কয়েক হইলেই দেখিবে আমার রোগ সারিয়াছে, আমি ভাল মানুষ হইয়াছি।

ভাল ঠাট্টা কয়জন করিতে পারে ? কথা শুনিয়া হাসিলাম ; উপকারও হইল ; এরূপ কথা কয়জন বলিতে পারে ? প্রায়ইতো দেখি, তুমি বলিলে, আমি হাসিলাম, আর যদু চটিল। আমাদের দেশের একজন প্রতিভাশালী লোক বলিয়াছেন—"কবির আমোদ, কিন্তু বিপিনের ক্লেশ, লোষ্ট্রক্ষেপী বালকের সুখে যথা ভেক।" তুমিতো এক কথা বলিয়া মজা করিলে ; আমি বেচারা যে তাহাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম। ঠাট্টা মাঝে মাঝে ভাল লাগে, কিন্তু বিদ্রূপকে বড় ভয় করি। যিনি স্বভাবতঃ কাহারও মনে ক্লেশ না দিয়া নির্দ্দোষ কথা বলিয়া [illegible]আমোদ দেন, তিনি বড় ভাল লোক। আর যাহাদের দোষ সংশোধন করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল বিদ্রূপ করিবার জন্য অন্যের সমালোচনা করিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে ছেলেবেলা পড়িয়াছি "খলেরা কেবল পরের দোষই অন্বেষণ করে"—।

রাগ।

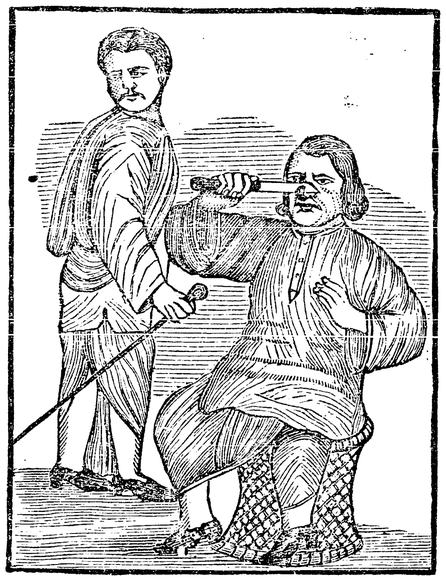

বাবা ! কি রাগ গো ! বাবুর মুখের উপর রাগ হইয়াছে। তাইতো, মুখ ব্যাটার জ্বালায় বাবু এখন আর আরশীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন না। অমন মু[illegible]ার বাবু লোকের থাকে ?—তাই বাবু রাগ করিয়া মুখকে জব্দ করিবার নিমিত্ত মুখের নাকটা কাটিয়া ফেলিতেছেন। এবারে মুখ একাকার হইয়া যাইবেন।

রাগ হইলে বিচার শক্তি একটু কমিয়া যায়। আমরা কোন ফকিরের কথা শুনিয়াছি। ফকিরের এক শত্রু ছিল, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য নিজের ছেলেকে বলিল "তুই আমাকে মারিয়া ওদের দরজায় ফেলিয়া রাখ"। ছেলে তাহাই করিল। বল দেখি জব্দ হইল কে ? ছেলে বাবুদের অনেককে দেখিয়াছি, মার উপর রাগ হইয়াছে, সুতরাং সে দিনের মত আহার পরিত্যাগ করিলেন। পাকা লোক হইলে পাছে মা বিরক্ত করিতে আসেন, তাই গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকেন ! এই হইল মার শাস্তি। ক্ষুধা কিন্তু রাগ বোঝেনা, তাহার সময় হইলে সে হাজির হইবেই। রাগের ফল হইল ক্লেশ ; ক্লেশের ফল অনুতাপ।

সকলেই মাঝে মাঝে অন্যায় করিয়া বলিয়া থাকেন, "রাগের মাথায় করিয়াছি।" বলি, রাগের মাথাটা কি ?—অর্থাৎ তখন বিচারশক্তি ছিলনা। ততক্ষণ আমি পাগল, সুতরাং আমার সাত খুন মাপ !! খুনটা নিজের উপর দিয়াই অনেক সময় হইয়া যায়। রাগের মাথায় যত কম কাজ করা যায় ততই ভাল। যদুর ছোট বোন তাহার ছবির বইএর একখানা পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, যদু "রাগের মাথায়" তৎক্ষণাৎ বইখানাকে উনুনের ভিতর রাখিয়া আসিল ! এ রোগ অনেকেরই আছে।

রাগ হইলেই অনেকে মনে করেন যে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে পারেন, অন্যের তাতে কিছু বলিবার অধিকার নাই। রাগ হইলে অনেকে নিজেকেই কষ্ট দেন—আহা বেচারা !!

শেষে একটা কথা বলি। ভাই, রাগকে বিশ্বাস করিওনা। রাগ যখন তোমার ভিতরে আসিবেন তখন খুঁজিলে দেখিবে যে বুদ্ধিটা পলায়ন করিয়াছে। রাগ আসিয়া তোমাকে তাঁহার করিয়া লইবেন। তখন আমি গাধা, গরু, ষাঁড়, মহিষ, যা কিছু হইনা কেন, তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ নাই।

তাই আজ বাবুর নাকের উপর চোট !!

ধাঁধা।

গত বারের প্রশ্ন গুলির উত্তর।

১। (ক) মোরগ; (খ) পায়রা। ২। রাখাল।
৩। বিভীষণ।

১। পক্ষী নয় তবু দুটী পক্ষ আছে তার।
শাদা, কাল, পক্ষ দুটী অতি চমৎকার।
ধরিয়া রাখিতে তারে নারে কোনজন।
কোথা দিয়া চলে যায় না হয় দর্শন।

২। কাণে ধরে না চালালে সোজা কভু যায় না।
এমন বেহায়া আর কোথা আমি দেখিনা।
হাত পা নাই ক তার বুক-ভরে চলে।
বল দেখি ভাই তুমি এটাকে কি বলে?

৩। মনুমেণ্টে বাস মম আমেরিকা ঘর।
খুঁজিয়া পাবেনা কিন্তু পৃথিবী ভিতর॥

২। "থাকা ভাল কিন্তু পাওয়া মন্দ"—বল দেখি কি?

৪। "রাজার ছেলে ও কুম্ভকারে তফাৎ নাই কেন?"

৫। দেখিলে তা পায় না,
পেলে কিন্তু দেখে না,
বল দেখি কি?

৬। একটী ছেলে একটা বাটীতে ম্যাজেণ্টা ভিজাইতেছিল; সেইখানে এক জন একটা মাছ আনিয়া রাখিল। হঠাৎ বাটী উণ্টাইয়া পড়িয়া ম্যাজেণ্টা মাছের গায় লেগে গেল, আর অমনি একটা পাখী হ'য়ে উড়ে গেল। বলত কেমন ক'রে হল!

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৫। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৬। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌছা আবশ্যক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গত বর্ষের (১৮৮৩ সালের) সখার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। উত্তম কাগজে, উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। সমুদয় বৎসরের সখা, ১৯২ পৃষ্ঠা, একত্রে উত্তমরূপে বাঁধান। মূল্য অতি সুলভ,—প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১/০ একটাকা দুই আনা মাত্র; মফঃস্বলের জন্য ডাকমাসুল ৵০ আনা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং সখা কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

"সখা" কার্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।
"সখা" কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

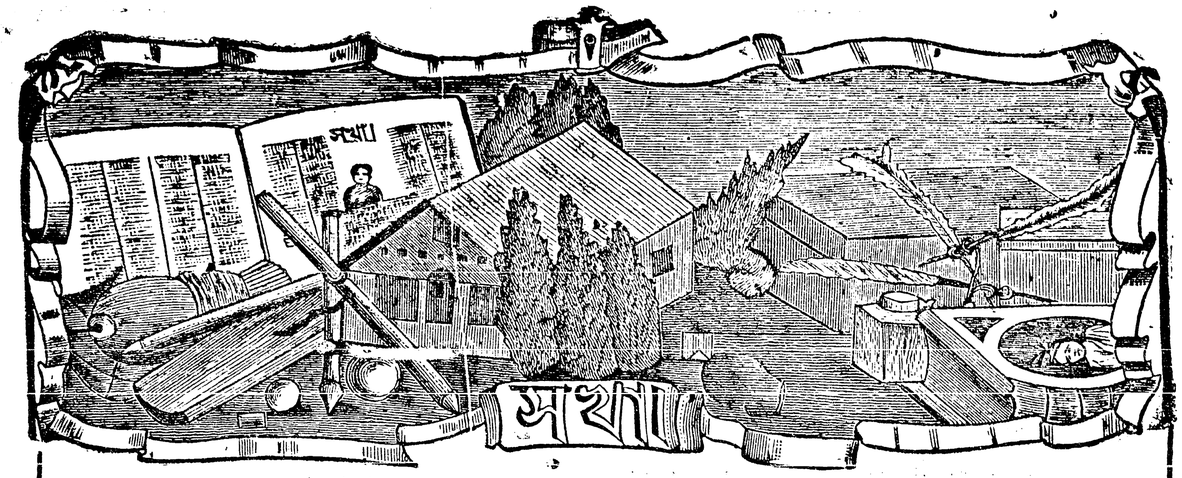

দ্বিতীয় ভাগ। সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। ৯ম সংখ্যা।

জীবন রক্ষক কুকুর।

পাঠক! ছবি দেখিয়া ও উপরের লেখা পড়ায় আমাদের মনের কথা বুঝিয়াছ কি? যদি না বুঝিয়া থাক, তবে বলি শুন। সুইজার্লাণ্ড্ দেশে কেবলই পর্ব্বত—যেমন আমাদের দার্জিলিং অমনি। তবে প্রভেদ এই যে সেখানকার অবস্থা বড় ভয়ানক। সেই প্রকাণ্ড আল্পস্ পর্ব্বতশ্রেণীর চূড়া, দিন রাতই ভয়ানক শীত, অধিবাসীরা সদাই কাতর। তাহাতে আবার সেখানকার ঋতুর কিছুই ঠিক নাই। হয় ত দিব্য পরিষ্কার আকাশ, সুন্দর নীল আকাশে একখানিও মেঘ নাই, মনোহর বনফুলগুলি শোভা পাইতেছে, যেন কখনই [illegible] নহে;—প্রফুল্ল মনে পথিক গান করিতে করিতে চলিয়াছে। ও হরি! কোথা থেকে হটাৎ বোঁ বোঁ গোঁ গোঁ শব্দে একেবারে ঝড়!! শুধু কি ঝড়? তার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতের চূড়ার মত কি শাল গাছের ঝাঁকের মত ভয়ানক বরফরাশি আকাশকে ছাইয়া ছুটিতেছে, তাহার সম্মুখে কি বড় বড় বৃক্ষ, কি পর্ব্বত-শৃঙ্গ কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। ভারি বন্যা এলে যেমন ঘর বাড়ী ভাসাইয়া লইয়া যায়, একেবারে কুড়ি হাজার গোলা কামান থেকে সারবন্দি ছুড়িলে সুমুখে যেমন কিছুই থাকে না সব ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়, তেমনি সেই ভয়ানক ঘূর্ণিবায়ুর সম্মুখে পড়িলে পাহাড়ের ধারও ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। ভয়ানক প্রতাপ! এমন ভয়ানক স্থান দিয়ে ঐ দেশের পথিকদিগকে প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে হয়।

সেইখানে বার্ণার্ড্ নামক একজন ধার্ম্মিক সাহেবের আশ্রম আছে, সেই আশ্রমের ধার্ম্মিক পুরুষেরা এইরূপে বিপদগ্রস্ত পথিকদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা ও আহারাদি দিয়া সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন। ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মনে করিলেন হয় ত কত লোক তাঁহাদের কথা না জানিতে পারিয়া বিপদে মারা যায়, এজন্য তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক কুকুর পুষিয়াছিলেন। উহারা বেস শিক্ষিত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত এবং যেখানে কোন বিপদাপন্ন লোক দেখিত তাহাকে উদ্ধার করিয়া আশ্রমে লইয়া আসিত। তাহাদের কাহারও কাহারও গলায় একটা করিয়া ঔষধের শিশি বাঁধা থাকিত, যদি কেহ চাহিত তবে উহা পান করিয়া বেস সবল হইয়া চলিয়া

যাইতে পারিত। এই কুকুরগুলি এমন চমৎকার শিক্ষা পাইয়াছিল যে শুনিলে আশ্চর্য্য ও অবাক হইতে হয়। যদি কোন লোক মৃত প্রায় হইয়া এমন কি ৮ হাত কি দশ হাত তুষারে (গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ) আবৃত হইয়া যাইত, ইহারা বুদ্ধি ও ঘ্রাণশক্তির বলে তাহাও বুঝিতে পারিত এবং দুইদিকের পা দিয়া ঘন ঘন বরফ আঁচড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দিত ও শেষে সেই মৃত প্রায় দেহ বাহির করিয়া মনিবদের নিকট পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাইত।

একদা একজন স্ত্রীলোক তাঁহার একটী পুত্রকে লইয়া এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। পথে রাত্রি হওয়ায় আর কোথায় স্থানআদি না জানায় তিনি ঐ স্থানের একটী কোণে পুত্রটীকে লইয়া শয়ন করেন। সুইজার্লাণ্ডের রাত্রি—একেবারে অসহ্য শীত, দুজনে ঘোর কষ্ট পাইতেছেন, মাঝে মাঝে পুত্রটী বলিতেছে—"মা! এখানে আমাদের সাহায্য করিতে কি কেউ নাই?" মা কি বলিবেন, আপনার যাতনায় ও মনে হতাশ হইয়া ভাবিতেছেন। মা হঠাৎ যেই একটু সরিয়া যাবেন অমনি সেই মহা উচ্চ পর্ব্বতের উপর থেকে ভয়ানক এক গহ্বরে পড়ে গেলেন!! কেহই জানিতে পারিল না। হা দুর্ভাগ্য শিশু! মাও হারাইলে? শিশু কিছুই জানে না; তখনও বলিতেছে—"মা! এখানে কি কেউ আমাদিগকে সাহায্য করিবে না?" আবার জিজ্ঞাসা করিল। কে উত্তর দিবে? শিশুটী তখন উঠিল, খুঁজিয়া দেখিল সে একা! উঃ! সেই পর্ব্বতে, সেই অন্ধকারে, সেই শীতে, সেই তুষাররাশির মধ্যে, সেই ভয়ানক স্থানে—সে একা!! দয়ালু পাঠক! স্নেহবতী পাঠিকা! তোমরা ভাবিয়া দেখ। সে বলিল "মা!—মা কোথা?" চীৎকার করিয়া ডাকিল "মা! মা গো!" পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বেড়াইয়া আঘাত লাগিয়া কথা তাহারই কাণে ফিরিয়া আসিল—"আ —ও"। সে আরও চেঁচাইয়া ডাকিল "ওগো মা!" দূরে, আরও দূরে তাহার ডাক বায়ুতে ভাসিয়া গেল, আর পর্ব্বতের গা হইতে শব্দ আসিল "ও—আ"। পার্ব্বতীয় বালক শেষে বুঝিল তাহার মা নাই, ও শব্দটা তালি মাত্র। তখন যে তাহার প্রাণ কি হ'ল সে কি লেখা যায়?

অসহায় বালক তখন আস্তে আস্তে সেই এক হাঁটু তুষারের মধ্য দিয়া বহু কষ্টে আবার রাস্তায় আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—যদি সেখানে কোন পথিক তাহাকে দেখিয়া সাহায্য করে। কিন্তু সে রজনীতে, সে অন্ধকারে, কে সে ভয়ানক পথে চলে? শীতে কাঁপিতে সে আর পারে না, সমস্ত দিনের পর ক্ষুধায় প্রাণ আকুল; মাকে হারাইয়া মন তাহার দুঃখে পোরা, তাহার উপর আবার সহায়হীন। হতাশ হইয়া সে সেই খানে হাঁটু পাতিয়া বসিল, হাত দুখানি জোড় করিয়া বুকে ধরিল, চক্ষু দুটী,—আহা! জলে ভেসে যাচ্ছে এমন চক্ষু দুটী,—উপর দিকে তুলিল; আর অতি কাতর স্বরে, সরল প্রাণে, ব্যাকুল হয়ে বলিল "পরমেশ্বর! তুমি দয়াময়! এই দীন হীন, অসহায় বালকের আর তোমা বৈ কে আছে? আমার চেষ্টায় যা আছে করিলাম, পিতাগো! ওগো বিপদভঞ্জন! এইবার আমার সব বল চলে গেছে, এখন তুমি আমায় হাত ধরে রক্ষা কর! আমি দেখিছি, মা যখনই বড় বিপদে পড়্‌তেন, তিনি ত তো[illegible] আর কাকেও ডাকেননি। আর তুমিও তাঁহার সব বিপদই দূর কর্ত্তে। এখন পিতাগো! আমাকে রক্ষা কর!"

এদিকে খুব তুষার পড়িতেছিল, ক্রমে তাহার প্রায় কোমর অবধি ডুবিয়া গেল। আমাদের দেশে যেমন কুয়াশা হয়, তুষারও তাই, তবে কুয়াশা সব জলকণা মাত্র। তুষার বরফকণা;

কাজেই ভয়ানক শীতল। শীতে তাহার অঙ্গ সকল ক্রমে অবশ হইয়া এল। এমন সময়ে হঠাৎ বোঁ বোঁ রবে সেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যা, সেই রকম ঝড় ভয়ানক বেগে এসে পড়্‌ল। বেচারা ভয়ে শীতে নির্জ্জীব হয়েছিল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে যেন বল পেলে, অমনি তাড়াতাড়ি একটা ছোট গুহায় গিয়া লুকাইল। ঝড় সমস্ত তুষারগুলকে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে, এই রকম নেড়ে নেড়ে নিয়ে বেড়াইতে লাগিল। আর মড় মড় ক'রে গাছ সব ভাঙ্গিতে লাগিল, পর্ব্বতের কোণগুলা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু শিশুটীর কিছুই করিতে পারিল না। তবে বড়ই শীত বৃদ্ধি হইল। শীতে প্রায় সে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে তাহার মুখে যেন কাহার গরম নিশ্বাস লাগিল।

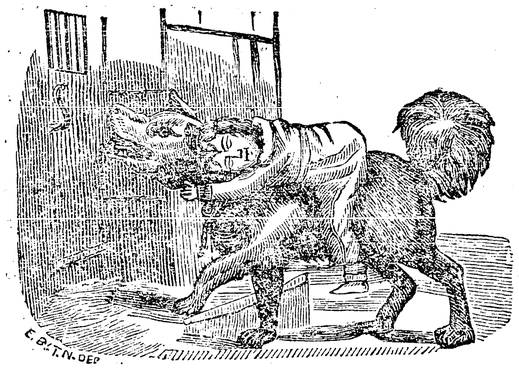

অমনি চক্ষু খুলিয়া দেখে যে ভয়ানক একটা কুকুর! কুকুরটী কিন্তু খুব স্নেহভাবে তাহার গা হাত সব চাটিয়া [illegible] করিতে লাগিল; দেখিয়া সে ভীত না হইয়া বরং সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিল ও পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিল। ক্রমে একটু সুস্থ হইলে কুকুরটা দাঁড়াইল। বালকও চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তখন সেই স্নেহপূর্ণ জীব উপুড় হইয়া শুইয়া এমন ভাব দেখাইল যেন সে বালককে আপন পৃষ্ঠে উঠিতে বলিতেছে। বালক তাহাই করিল, তখন হৃষ্টমনে পথ চিনিয়া কুকুর আপনাদের সেই আশ্রমের দিকে চলিল। ঝড়ও অনেকটা থামিয়াছিল। সে স্বচ্ছন্দে ঐ দেখ বালককে পিঠে করিয়া মন্দিরের দ্বারে আসিয়া চীৎকার করিয়া দ্বার খুলিতে বলিতেছে। ধন্য বুদ্ধি কুকুরের!! ধন্য দয়া ঈশ্বরের!!!

এই বালককে একজন ভদ্রলোক পরে ভরণ-পোষণ করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কখনও মাকে ভুলে নাই।

ঘড়ি।

তি প্রাচীনতম কাল হইতে ঘড়ি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তোমরা মনে করিও না যে ঘড়ি তোমাদের ইংরাজ বাহাদুরেরাই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যখন ইংরাজ নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না, এদেশেতে ত নয়ই, কোন স্থানেই যখন ইংরাজ হয় নাই, তখনও এই দেশে ঘড়ি ছিল, এ দেশ সকলের চেয়ে পুরাতন, এবং আগে যখন সব দেশ, এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা—সমস্ত অজ্ঞান ছিল, অসভ্য বনের পশুর মত ছিল, তখনও আমাদের দেশের লোকেরা সুসভ্য ও মহা বুদ্ধিমান ছিলেন। তখন তাঁহারা সময় নিরূপণ করিবার জন্য যে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহাকে যদি ঘড়ি বলা যায়, তবে তখনও নিশ্চয় ঘড়ি ছিল।

সে যাহা হউক, আসল কথা এই যে সময়টা দেখা নাকি চিরকালই দরকার, সময় দেখিবার জন্য তেমনি চিরকালই একটা না একটা উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। বিলাতের প্রাচীন রাজা 'আলফ্রেড্ দি গ্রেট' এক রকম বাতী ব্যবহার করিতেন সেই বাতী পুড়িতে যে সময় লাগিত

সেই অনুসারে তিনি ঘণ্টা নিরূপণ করিতেন। আমাদের দেশে তিন রকম উপায় দেখা যায়। (১ম) কোন পরিষ্কার স্থানে একটা কাটী সোজা করিয়া পুতিয়া রাখা হয়, এবং প্রতিদিন সূর্য্যের গতি বুঝিয়া ঐ কাটীর ছায়া যখন যেখানে যেখানে পড়ে সেইখানে সেইখানে দাগ দিয়া রাখা হয়। তা হলেই এক বছর বাদে কাটীর ছায়া আবার ঘুরিয়া ঠিক প্রথম দিনের দাগে আসে। তার পর থেকে আবার ঘুরিতে আরম্ভ করে। কাজেই বেশ এক রকম মোটা মুটী সময় ঠিক করিবার উপায় হয়। ইহাকে সূর্য্য-ঘড়ি বা Sun-dial বলে। কিন্তু এতে সুবিধা হয় না, কেন না, যেদিন সূর্য্য মেঘে ঢাকা থাকে সেদিন, ও রোজ রাত্রে সময় দেখার উপায় থাকে না। আর একটা উপায় আছে তাহার নাম 'বালির ঘড়ি'। একটা ফুটো ওয়ালা বাক্সে ঝুরো বালি রাখা হয়, ঐ বালি ঝুর ঝুর ক'রে পড়িতে থাকে, যতক্ষণে সমস্ত প'ড়ে যায় ততক্ষণে এক ঘণ্টা হয়। আবার সমস্ত বালি কুড়াইয়া লইয়া বাক্সে পূরিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এও সুবিধা নয়। আরও এক রকম আছে তাহাকে জলঘড়ি বলে। একটা পাত্রে খানিকটা জল রাখা হয়, তাহাতে একটা পাৎলা বাটী ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তাহার তলায় একটী ছোট ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্র দিয়া একটু একটু করিয়া জল উঠিতে থাকে। বাটীর ভিতর দিকে বা বাহির দিকে কয়টী দাগ করা থাকে। ক্রমে যত অধিক জল বাটীর ভিতর উঠে ততই বাটী ভারী হইয়া ডুবিয়া যাইতে থাকে। এবং ঐ এক একটী দাগ পল, দণ্ড, প্রহর প্রভৃতি বুঝায়। পলের দাগ অবধি ডুবিলে এক পল হইল বুঝা যায়, দণ্ডের দাগ অবধি ডুবিলে দণ্ড হইল বুঝা যায়। আবার ৭॥০ দণ্ডে একটা প্রহরের দাগ থাকে, ঐ দাগে জল উঠিলে এক প্রহর হয় বুঝা যায়। সাধারণতঃ এক প্রহর হইলে বাটীটি ডুবিয়া যায়। অমনি একজন লোক যে পাহারা থাকে, সে সে বাটীটি আবার ভাসাইয়া দেয়; আবার, জল উঠিতে থাকে। এইরূপে দিন রাত্রি পাহারা রাখিয়া এই জল-ঘড়ির দ্বারা বেস এক রকম সময় নিরূপণ হয়।

এই দুই তিন জাতীয় ঘড়ি এখনও অনেক প্রাচীন মন্দিরে ও দেবালয়ে আমরা দেখিতে পাই। কাশীতে এইরূপ একটী প্রকাণ্ড মান মন্দির আছে, সেখানে একটী বড় সুন্দর সূর্য্য-ঘড়ি আছে। অনেক বড় বড় জ্যোতির্ব্বেত্তা সাহেব ইহা দেখিতে যান। আরও অন্যান্য অনেক স্থলে বালির ও জলের ঘড়ি দেখা যায়। কিন্তু প্রায় সকল স্থলেই এখন বিলাতী ঘড়ি ব্যবহার হয়; ইহাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার জিনিষ। ইহাতে দিন রাত্রি পাহারা দিতে হয় না; কোন গোলই নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার দম দিলেই হইল। তাহাও আবার বড় বড় ঘড়িগুলার কেবল ৭ দিন অন্তর একদিন। মাসে একদিন, বৎসরে একদিন দম এমন ঘড়িও আছে শুনিয়াছি। দেখ দেখি কেমন সুবিধা! এই সব ঘড়ির ভিতর ত সাধারণেই কত কৌশল, এক একটাতে আবার এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে শুনিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। কোন কোনটার ১৫ মিনিট বাজে, কোনটার ঘণ্টা বাজিবার সময় একটা পরী আসিয়া নাচিয়া গাইয়া তার পর একটা [illegible] দ্বারা একটা ঘণ্টা বাজাইয়া আবার নাচিতে নাচিতে যায়। কোনটায় ফি সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে একজন কুলী দাঁড়াইয়া একটা মুগুরের দ্বারা একটা চাঁইএর উপর ঠক্ ঠক্ ক'রে মারে আর যারা দেখে তাদের মুখ-পানে চায়। কোনটার বা ঘণ্টা বাজার সময় একটা কোকিল পাখী বাহির হইয়া 'কু' 'কু' ক'রে শব্দ করে, তাই ঘণ্টা বাজান হয়। আর কত লিখিব?

এক রকম ঘড়ি আছে তাহাদিগকে 'এলার্মিং' ক্লক্ বলে; এগুলো বড় উপকারী। দম দিয়ে ঠিক ক'রে রাখিয়া শোও, ঠিক যটার সময় তুমি মনে করিবে তটার সময় রাত্রে এমনি 'ঘন্ ঘন্' শব্দ করিবে যে তুমি অমনি ধড়মড়িয়ে উঠে না পড়ে থাকতে পারবে না। বাঙ্গালায় এদের বলে ঘুম ভাঙ্গানে ঘড়ি। ছাত্রদের এটা ভারী উপকারী। দামও বেশী নয়। আজ কাল এ রকম একটা ভাল ঘড়ি ১০।১৫ টাকায় পাওয়া যায়; ৫ টাকাতেও ছোট রকম পাওয়া যায়। 'ওয়াচ্' অর্থাৎ ট্যাঁক ঘড়িও আজ কাল যে কত রকম তার ঠিক নাই। তাদের মধ্যে দুদল, কতক-গুলোর বেশ ঢাকনি আছে, তাদের বলে "হণ্টিং," আর যাদের ঢাকনি নেই তাদের বলে "ওপন্-ফেস্।" শেষের গুলিতে বেশ সুবিধা, পকেট থেকে বাহির করিলেই দেখা যায় কটা বেজেছে। খুব দাম দিয়ে কিনিলে এক রকম ওয়াচ্ আছে তারা বেস বাজে। যখন ইচ্ছা, রাত্রে অন্ধকারে ঘুম ভাঙ্গিলে একটা স্থান একটু টিপিয়া ধরিলেই কটা বেজেছে, কত মিনিট হয়েছে তা পর্য্যন্ত বলে দেয়। মানুষের বুদ্ধির যথার্থই সীমা নেই। তোমরা বড় হ'য়ে যদি এ বিষয়ে বুদ্ধি খরচ কর তা'হলে হয়ত আরও কত শত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কৌশল যে বাহির ক'রবে তার ঠিক কি? পারবে?

সে যাহা হউক, কিন্তু আজিকার এত কথার পর একটী কথা [illegible]দের বলিতে ইচ্ছা করে—যে, সময় বড় দরকারী, এত দরকারী যে সে বিষয় এখানে বলাই অনাবশ্যক। এমন যে দরকারী সময় তাহার দিকে সর্ব্বদাই খুব সাবধান হইয়া চলা আবশ্যক, যেন একটুও ফাঁকি দিয়ে চলে যায় না। যে টুকু যাবে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না এমন যে দরকারী জিনিষ, আমাদের মতে যার চেয়ে আর দামী জিনিষ নাই—তার জন্য যদি কিছু খরচ করা দরকার হয়, তাও সন্তুষ্ট মনে করা উচিত। আজ কাল যারা শ্রেষ্ঠ জাতি সেই ইংরেজদের দেশে প্রায় প্রত্যেক গাড়োয়ান, কি মুটেমজুর, এমন কি সামান্য জুতোসেলাইওয়ালারও প্রায় ঘড়ি থাকে। তারা জানে যে সময়ই তাদের জীবন, আবার সময়ই তাদের জীবন ধারণ অর্থের উপায়। ২৪ ঘণ্টায় যাদের এত খরচ, তার ফি ঘণ্টায় এত টাকা আয় হচ্ছে কি না দেখা চাই! এই জন্যেই তারা এত বড় জাত। তাই আমরা ইচ্ছা করি, আমাদের দেশের বালক বালিকারা সকলেই ঘড়ির এ মহৎ গুণ জানিয়া এক একটী ঘড়ি ব্যবহার করেন। অনেক ছেলে দেখি প্রায়ই দেরী করিয়া স্কুলে আসেন, আবার অনেকে ৯টার সময় অবধি এসে বসে থাকেন। কাজেই,—ঘড়ি নেই কি করেন, সময় ঠাওরাইতে পারেন না। রেলের গাড়ীতে যাইতে অনেকেই দেখিয়াছি ঠিক সময়ে ষ্টেশনে যান না; কাজেই তাঁহাদিগকে 'ট্রেণ মিস্' করিয়া ৩।৪ ঘণ্টা অনাহারে হয়ত ষ্টেসনে বসিয়া অনর্থক কষ্ট পাইতে হয়। ঘড়ি থাকিলে এ সব হয় না। আমাদের দেশের লোকেরা যখন সকলে ঘড়ি ব্যবহার করিতে শিখিয়া সময়ের মূল্য বুঝিবে, তখনই বাস্তবিক দেশের উন্নতি হইবে। ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে আবশ্যক। ৪ খানি বই পড়িতে হইবে, এত টুকু সময় আছে, তাহার মধ্যে ঠিক ভাগ করিয়া পড়িলে তবে পড়া ঠিক হইবে নহিলে হয় না। এই সব নানা কারণে ছাত্রদের ঘড়ি নিতান্ত আবশ্যক। আজ কাল দামও খুব কম। আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ এক একটী ঘড়ি ব্যবহার করিবেন। কিন্তু সাবধান! যেন নষ্ট না হয়। আরও সাবধান! যেন ঘড়ি আছে বলিয়া কারো অহঙ্কার না হয়।

খেতে পাই। তবে বড় মানুষী ক'রে অহঙ্কার দেখাবার দরকার কি? সে কি ভাল? না সে আরও পাপ! ওপাড়ার ছেলেরা ত বড়মানুষ; তাদের ব্যবহার দেখ্‌লে কি আর তাদের মত হ'তে ইচ্ছা যায় মা? আমাদের, তাদের মত চাকর চাকরাণী নেই, ঝাড় লণ্ঠন নেই, গাড়ী ঘোড়া নেই, তা নাই থাক্‌ল মা! চাকর, গাড়ী এ সব আমাদের কাজ কি? আর ঝাড় লণ্ঠনের বদলে দেখ দেখি কেমন চাঁদ রহিয়াছে। আহা কেমন! মা! ও চাঁদ ত আমাদের। তুমিই ত বলিয়াছ আমাদের পিতা পরমেশ্বর এ সব তৈয়ার করেছেন, সব মানুষ ত আমাদের ভাই বোন, বা! আমাদের এত ভাই এত বোন! তবে আমাদের কিসের দুঃখ মা?"

এত ছোট বালিকা ভূষণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, তাঁহার আহ্লাদে বুকের ভিতর কি হইতে লাগিল ও চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি ভূষণকে বুকের উপর চাপিয়া লইলেন ও পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তার পর ভূষণের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "ভূষণ মা! তুমি ঠিকই ভাবিয়াছ। আমরা কিসের দুঃখী? আমরা ত দুঃখী নই। টাকা থাকিলেই কেবল মানুষ সুখী হইতে পারে না। এক দলের লোক আছেন তাঁহারা খুব ধনী ও অনেক গাড়ী ঘোড়া, ফুল-বাগান, চাকর চাকরাণী, ঝাড় লণ্ঠন, গদি বিছানা, ইত্যাদি মহা ধূমধামের মধ্যে থাকেন। কিছুরই অভাব নাই, মহাসুখ। আর এদিকে দুঃখীদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ধন লইয়া আপনি সুখ-ভোগ করেন আর থাকেন, আর কোন কাজ নাই। আর এক শ্রেণীর লোক, তাঁহারাও খুব ধনী, ইচ্ছা করিলেই সকল প্রকার সুখভোগ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা এ সুখকে সুখ মনে করেন না। তাঁহারা মনে করেন "এ সুখ কত দিনের জন্য! যখন এ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব তখন সকলেই সমান হইব; অতএব বাস্তবিকই সকলে ভাই বোন।" কাজেই তাঁহারা সমস্ত ধন আপনারা ভোগ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে করিয়া তাঁহাদের বাড়ীর চারিদিকে যে সকল দরিদ্র লোক হাহাকার করিতেছে তাহাদিগকে আপনার ভাবিয়া নিজের সুখ ফেলেত তাহাদেরি দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হন।

ওদিকে যাঁহারা খুব গরিব, আমাদের মত, কি আমাদের চেয়েও, তাঁহাদের মধ্যেও একদল ধন নাই বলিয়া দুঃখিত নন। তাঁহারা তোমার মতের লোক। তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের পিতা ঈশ্বর এবং সকলেই তাঁহাদের ভাই বোন। তাঁহারা তাঁহাদের কিছুই অভাব দেখিতে পান না। তাঁহাদের ছোট কুটীর খানিকেই রাজার বাড়ী মনে করেন। চন্দ্র তাঁহাদের ঝাড় লণ্ঠন হয়। বনের মধ্যে সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে; তাঁহারা সেই গুলিকেই তাঁহাদের ফুল বাগান মনে করেন। তাঁহাদের নিজের পা দুটিই তাঁহাদের গাড়ী ঘোড়া হয়; তাঁহাদের হস্তই তাঁহাদের চাকরের কার্য্য করে। এইরূপে সেই কুঁড়েটীর মধ্যে যে সকল সুখভোগ করেন তাহাই রাজ-সুখ মনে করেন। আবার, যখন তাঁহারা ভাবেন যে জগতের রাজা পরমেশ্বর তাঁহাদের পিতা ও তাঁহারা রাজপুত্র ও রাজকন্যা তখন তাঁহাদের আর সুখের সীমা থাকে না।

আবার একদল লোকের কথা শুন; তাহারাও ইহাদের মত গরিব কিন্তু তাহারা আর এক রকম। তাহারা টাকা নাই বলিয়া বড় দুঃখিত। সর্ব্বদা টাকার অন্বেষণে বেড়ায় ও হয় ত তাহার নিমিত্ত কত পাপ কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। তাহারা জানে না যে সুখ তাহাদের কুঁড়ে ঘরের মধ্যেই রহিয়াছে।

তবে এখানে চারি দলের লোক দেখা যাইতেছে। ১ম দল খুব বড় মানুষ, গরিব দুঃখীকে দয়া করে না, আপনাদের সুখের জন্যই ব্যস্ত; আর মনে করে যে তাহাদের সকল ধনই তাহাদের নিজের সুখের নিমিত্ত। ২য় দলের লোকও খুব বড়, কিন্তু আপনাদের সুখের দিকে তত দৃষ্টি নাই। তাঁহারা ঈশ্বরকে পিতা জানিয়া ও সব মানুষকে ভাই বোন জানিয়া সকলের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। ৩য় দলের লোক আমাদের মত কিম্বা আমাদের চেয়ে গরিব, কিন্তু সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট। তাঁহারা আপনাদিগকে রাজপুত্র ও রাজকন্যা মনে করেন এবং তাঁহাদের কিছুই অভাব নাই। ৪র্থ দলের লোকও খুব গরিব, কিন্তু সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট; আর কোথায় সুখ, কোথায় ধন করিয়া বেড়ায়। এই চারিদলের মধ্যে তুমি কাহাকে সুখী ও কাহাকে দুঃখী মনে করিবে? নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের লোককে সুখী বলিবে। তবে বেস্ দেখা গেল যে, কেবল টাকা থাকিলে লোক সুখী হইতে পারে না—আরও কিছু চাই। আবার অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও দুঃখী হয় না, যদি তাহার সেই বস্তু থাকে।

তবে সেই বস্তু কি? এমন কি বস্তু আছে যাহার অভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও লোক বাস্তবিক সুখ পায় না; এবং অতি দরিদ্র হইলেও, যাহা থাকিলে মানুষ খুব সুখী হইতে পারে? সে বস্তুটী এই—ঈশ্বরকে পিতা জানিয়া ও সকল মানুষকে ভাই বোন জানিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করা, ও সকলকে ভালবাসা। ইহা যাহার আছে, অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও সে কেন দুঃখী হইবে? তখন ভূষণ, মার কোলে বাড়ী যাইতে যাইতে ভাবিল "যথার্থই ত, আমি দুঃখী কেন?" আমরা বলি "না ভূষণ! তুমিই যথার্থ ধনী।" পাঠক পাঠিকাগণ! কি বল?

৺ কৃষ্ণদাস পাল।

একটা কথা আমাদের বড় মনে হয়; সেটা আজ তোমাদিগকে বলিব। যখন শ্মশানে যাই, বা যে কোন স্থানে বসিয়া থাকি, বা যখন গঙ্গা-তীরের দিকে বেড়াইতে যাই, তখনই কত শত শত লোকের মৃত্যু দেখি, শুনি ও বলি। কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্য দেখি যে এই শত শত লোক রোজ মরিতেছে, এত লোক প্রতিদিন এ সুখময় পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু কাহারও খবর কেউ রাখে না, কাহারও কথা লইয়া কেহ নাড়াচাড়া করে না, কাহারও মৃত্যু বিষয়ে কেহ দুঃখ করে না, কেহ "হায় হায়" করে না। রামধন, হরিধন, গোপাল, মাধব—কত লোকই না রোজ মরিতেছে; কত লোকই না রোজ ইহলোক ছাড়িয়া যাইতেছে,—কে তার খোঁজ

লয়? কেহই না। হয়ত তাহার আপনার জন কেউ ছিল,—মা বাপ, ভাই বোন,—তারাই ২।৪ দিন কাঁদিল। হয়ত তাহার পাড়াপ্রতিবাসী জনকতক লোক তার মৃত্যুতে দুঃখিত হয়। আবার নয়ত পাড়ার লোক "আঃ! বাঁচলেম, হাড় জুড়াল" বলে তাহার মরণে খুসী হইয়া ঠাকুরদের তুলসী দেয়। আর এক দিকে যে দেখি একজন কেশব সেন মরিলেন, আর অমনি দেশ বিদেশ, সমস্ত ভারতবর্ষ, সমস্ত ইউরোপ, আমেরিকা পর্য্যন্তও হাহাকারধ্বনি পড়িয়া গেল; একজন শ্যাম বিশ্বাস প্রাণত্যাগ করিলেন, আর বাঙ্গালা দেশ-শুদ্ধ লোক তাঁহার অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহের গান গাইয়া মহা শোক করিতে লাগিল; একজন কৃষ্ণদাস পাল ৪৫ বছর বয়সে মরিলেন, আর অমনি বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম অঞ্চল, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ,—সর্ব্বত্র, "হায় কি হইল!" শব্দে পূরিয়া গেল!—এর মানে কি জান? এ রকমটা হয় কেন? এই যে শত লোক রোজ মরিতেছে, ইহারা কি মানুষ নয়? তবে এদের মরণের সংবাদ কেহ দেয় না কেন? আর ঐ সব লোক-গুলিরই বা মৃত্যুতে মানুষ কাঁদে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ।—এঁরা বুদ্ধি, চরিত্র বা ধর্ম্মের গুণে পৃথিবীর বিস্তর উপকার করিয়া-ছেন, তাই আজ এঁদের মরণে দেশশুদ্ধ লোক কাঁদিতেছে। "সখা"র পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি দেশের লোক নও? তোমরা কি এ দুঃখের দিনে চক্ষের জল ফেলিবে না? তোমা-দের জননী-স্বরূপ দেশের ভাল ভাল, বাছা বাছা, বড় বড় ছেলেরা সব মরে যাচ্ছেন দেখে কি তোমাদের প্রাণে দুঃখ হবে না? কেন হবে না? কে বলে হবেনা? তবে তোমরা শিশু, সকলে জাননা এঁরা কেন বড় লোক ছিলেন। তাই, এঁদের না জানাতেই তোমরা দুঃখও করিতেছ না। তবে এস, কেশব বাবু ও শ্যামাচরণ বাবুর জীবনের অনেক কথা তোমরা পড়িয়াছ; আজ মহামান্য অনরেব্‌ল্ রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর সি, আই, ঈ, মহাশয়ের জীবনের গুটিকতক কথা বলিয়া দিব।

এই মহাত্মা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র পাল। আহা! দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ পিতা মাতা উভয়েই এই নিদারুণ শোকের জ্বালা সহ্য করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। কৃষ্ণদাস বাবু বালক কালে পাঠশালে পড়িতেন, পরে ওরিএণ্টাল্ সেমিনারী বিদ্যালয়ে ইংরাজী ক্লাশে ভর্ত্তি হন। তখন তাঁহার বয়স ১০ বৎসর মাত্র, কিন্তু ঝাঁ ঝাঁ করিয়া 'ডবল্ প্রোমোশন্' পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র খুব শিখিতে লাগিলেন। তিনি অতি-শয় পরিশ্রম করিয়া পড়িতেন, এজন্য প্রায় সর্ব্ব-দাই ক্লাশে প্রথম থাকিতেন। এ স্কুলে ছয় বছর পড়িয়াই তথাকার ইংরাজী পড়া ভাল হয় না বোধ হওয়ায় স্কুল ছাড়িয়া একজন সাহেবের কাছে ইংরাজী পড়িতে লাগিলেন। ভাল ইংরাজী শিখিব, এ ইচ্ছাটা তাঁর বরাবর ছিল। এজন্য দিনকতক এইরূপে শিখিয়া শেষে "হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ" নামক তখনকার একটা বড় কলেজে তিন বছর খুব মন দিয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহার খুব উন্নতি হইয়াছিল। উনিশ বছর বয়সের সময় তাঁহার এ কলেজের পড়াও শেষ হইল, তখন তিনি বাড়ীতে, সাধারণ-পুস্তকা-গারে ও ঐ কালেজে বসিয়া বসিয়া দিন রাত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আহা! পড়াশুনা যে কি মধুময় জিনিষ, তা যারা বেশী পড়ে তারাই বুঝিতে পারে। পড়িয়া তিনি ক্লান্ত হইতেন না, এতও পড়িতে পারিতেন! কত বৈই যে পড়িয়া ফেলিয়াছেন তা বলা যায় না! কবে আমরা সকলে পড়াশুনার এই সুখকে প্রকৃত সুখ মনে করিয়া অন্য সব বৃথা আমোদকে

নীচ মনে করিতে শিখিব? হায়! কবে সমস্ত বালক বালিকাগণ প্রাণ মন, সুখ ঐশ্বর্য্য, সব পণ করিয়া, জ্ঞান ও বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া মানুষ হইবার জন্য যত্ন করিবে? উঃ! যখন এখনকার সব ছেলেদের পড়াতে আলস্য দেখি, তখন আপনার আঙ্গুল আপনি কামড়াইতে ইচ্ছা করে, যে হায় রে! ইহারা চেষ্টা ও যত্ন করিলেই বড়লোক হইতে পারিত, ইচ্ছা করিয়া নীচ কেরাণীগিরি করিবে, সাহেবের জুতা খাইবে, এজন্য পড়াশুনায় হেলা করিয়া বৃথা আমোদে সময় কাটাইতেছে!! এখন বাবা খেতে পরতে দিচ্ছেন, স্কুলের মাহিনাও দিচ্ছেন, এর পর যে কি দশা হবে একটীবারও ভাবে না! হায়! হায়! আর সহ্য হয় না। বালকগণ! তোমাদের প্রত্যেককেই বলি, হাতে ধরে বলি, বৃথা সময় নষ্ট আর কোরোনা। পড়, পড়, পড়;—বড়লোক হবার উদ্যোগ আয়োজন কর, চেষ্টা কর, যত্ন কর, প্রতিজ্ঞা কর;—দেখ দেখি হইতে পার কি না? সব বড়লোকই এই রকম ক'রে হন, তোমরাই বা কেন ইচ্ছা পূর্ব্বক মূর্খ, নীচ, সামান্য লোক হইয়া থাকিবে? তার পর, সে যাহা হউক, কি বলিতেছিলাম—কৃষ্ণদাস বাবুর পড়ার কথা। অনবরত পরিশ্রম করিয়া তিনি পড়িতেন আর চেষ্টা করিতেন যেন তাঁহার ইংরাজী রচনা ভাল হয়। সর্ব্বদাই সংবাদ পত্রে লিখিতেন, এবং তাঁহার সৎ ইচ্ছা ও চেষ্টার জন্য এমনি লিখিতেন যে, যে কাগজেই দিতেন সেই আদর করিয়া লইত। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একজন সুলেখক ও খুব ভাল লোক বলিয়া জানিত হইলেন। হাঁ, ভাল কথা।—এই সময় হইতেই বিচারশক্তি ও বক্তৃতা করিবার শক্তির উন্নতি করিবার জন্য তিনি একটী ছোট "ক্লবের" স্থাপনা করিয়া সেখানে নানাপ্রকার ভাল ভাল বিষয়ের আলো-চনা করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই ক্লবের প্রায় সব সভ্যই এখন বড়লোক। আমরা এই জন্য এই রকম "ক্লব", সভা প্রভৃতি বড় ভালবাসি। এগুলি যেন "বীজতলা" জমী, পরে যাঁহারা বড়লোক হন এখান হইতেই তাঁহারা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা পান।

এই অবিশ্রান্ত যত্ন পরিশ্রম ও চেষ্টায় কত বড় ফল হইল শুনিবে? শুনিলেই তোমরা অবাক হইবে। তাঁহার যখন বয়স কেবল মাত্র বাইশ বছর, যে বয়সে এখন অনেক ছেলে এণ্ট্রেন্স্ও পাশ করিতে পারে না, এত কম বয়সেই তিনি সুবিখ্যাত, দেশের মধ্যে মান্য "হিন্দুপেট্রিয়ট্" নামক প্রধান সংবাদপত্রের পূরো সম্পাদক হন!! কি আন-ন্দের কথা! বাইশ বছরের ছেলে এত বড় একটা প্রকাণ্ড কাজের ভার মাথায় লইলেন! তাঁহার হাতে কি এ ভার অন্যায় হইয়াছিল? তিনি কি এত বড় কাগজ ভাল চালাইতে পারেন নাই মনে কর? না, তা মনেও স্থান দিও না। বড় হইলে জানিতে পারিবে যে এই পেট্রিয়ট্ কাগ-জই—আজ কাল সমস্ত ভারতবর্ষে যত খবরের কাগজ আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া-ছিল—কেবল তাঁহারই দক্ষতায়!! তার পর আর এক ধাপ উঠিলেন এই যে—সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহারের যত জমীদার আছেন তাঁদের একটা প্রকাণ্ড সভা আছে। কৃষ্ণদাস বাবুর ক্ষমতা ও সৎচরিত্র দেখিয়া ইহাঁরা তাঁহাকেই আপনাদের সব কার্য্যের ভার দিলেন। এটা বড় সহজ কথা নয়। একজন গরিব দুঃখীর ছেলেকে সমস্ত রাজা ও জমীদারগণ যে এত বিশ্বাস করিলেন, এ কি বড় সামান্য কথা? আরও শুন। ইহাঁর পদ ও সম্মান বৃদ্ধি এখানেই শেষ হইল না। কলিকাতায় যে মিউনিসিপালিটী আছে, ইনি তাহার একজন অতি প্রধান মেম্বর হইলেন। কি আশ্চর্য্য! যেখানে যান, সেখানেই প্রধান,

সেইখানেই সর্ব্বেসর্ব্বা, সেইখানেই সকলের উপর। হাঁ! ইহাই ত চাই। একেই ত বলে বড়-লোক। আরও কথা আছে, কান পেতে শুন; এখান থেকে তাঁহার পদ আরও কত বাড়িল এক-বার দেখ। তোমরা বোধ হয় অনেকেই জাননা যে এদেশের গবর্ণর জেনারেল অর্থাৎ বড় লাট এবং লেপ্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণর বা ছোটলাট, দুজনেরই সহায়তার জন্য একটী করিয়া সভা আছে। প্রথম সভা থেকে বাঙ্গালা দেশের জন্য আইন তৈয়ার হয়। দ্বিতীয় সভা থেকে যে আইন হয় তা একে-বারে সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য; ইহাকেই ভারত-বর্ষের পার্লিয়ামেণ্ট সভা বলা যায়। ইহার মধ্যে প্রথমে কৃষ্ণদাস বাবু ছোটলাটের মন্ত্রীসভার মেম্বর হন; সেখানে খুব দক্ষতার সহিত কাজ করেন। তিনি যাহা ব'লতেন প্রায় তাহা আর কেউ কাট্‌তে পারত না। তার পরে গত বৎসর ইহাঁর সম্মানের চূড়ান্ত হইয়াছে,—বড়লাটের মন্ত্রীসভাতেও ইনি একজন সভ্য হন! দেখিলে শুনিলেও চক্ষু জুড়ায়! একজন গরিব দুঃখী সামান্য লোকের ছেলে হয়েও লেখাপড়া, বুদ্ধি ও চরিত্রের তেজে মানুষ যে কত বড় লোক হইতে পারে তাহা ইনি বেস্ দেখাইয়াছেন। চক্ষু যদি থাকে ত দেখ, আর ইচ্ছা যদি থাকে ত হও। যদি একতিল পদার্থ থাকে, যদি মানুষ হইবার বাসনা থাকে, তবে প্রাণপণে যত্ন কর।

বড়লোক দুই জাতীয় দেখা যায়, এক জাতীয় লোকেরা ঈশ্বরের দ্বারা বড় হইয়াই জন্মান। যেমন শ্রীচৈতন্য, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি। ইহাঁদের মত হওয়া কঠিন, তবে চেষ্টা করিলে অনেকটা যে না হওয়া যায় তাও নয়। কিন্তু আর এক জাতীয় বড় লোকেরা আপনিই হন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন, তাঁহারা নিজের চেষ্টায়, নিজের যত্নে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষায়, নিয়ত পরিশ্রম করিয়া কি উন্নতিই করিয়া যান। ইহাঁ-দের মত হওয়া তত কঠিন নহে, সেইরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিলেই সব বুদ্ধিমান বালক সেই-রূপ মহৎ হইতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় এই রকম নিজের চেষ্টায় বড় হইয়াছিলেন। চেষ্টা করিলে আমা-দের সখার প্রত্যেক পাঠক সেইরূপ বড়লোক হইয়া স্বদেশের ও জনক জননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া যাইতে পারেন। একদিন ছেলেবেলা "হিন্দুপেট্রিয়টের" লেখা দেখিয়া এই কৃষ্ণদাস বাবুই বলিয়াছিলেন "আহা! কবে আমি এইরূপ ইংরাজী লিখিতে শিখিব?" তার পর দেখ ২৩।২৪ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত সেই কাগজ খানিই তাঁহার হাতে পড়িয়া দেশের সর্ব্বপ্রধান কাগজ হইয়া দাঁড়াইল। যথার্থই, একদিন যাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় আর একদিন তাহা সত্যই আসে। বালকগণ! তবে আর কেন? লেগে যাও, উঠে পড়ে—দিনরাত কেবল কিসে বড় হব' সৎ হব, ধার্ম্মিক হব, সেই চেষ্টা কর। যে কৃষ্ণ-দাস একদিন দুঃখীর সন্তান ছিলেন, তিনি আজ মরিবার সময় তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা রাখিয়া গেলেন! তাহার মধ্যে পিতা, মাতা, কন্যা ও গরিবদিগের জন্য ১০০০০্ দশ দশ হাজার করিয়া ৪০০০০্ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়া অবশিষ্ট তাঁহার পুত্রকে দিয়া গিয়াছেন। ধন্য কৃষ্ণদাস! তোমাকে আগে কেহ চিনিত না, আজ তুমি ছোটলাটের সম্মানিত ও বড়লাটের ডান হাত! তোমার বুদ্ধি ও তোমার পরিশ্রম, তোমার যত্ন ও তোমার চেষ্টা, যেন আমাদের দেশের সব বালকেরা শেখে।

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

পঞ্চম অধ্যায়।

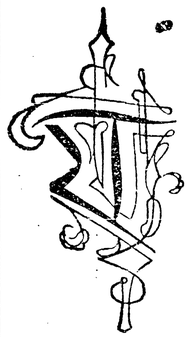

খন ললিত বাবু অজাকে সঙ্গে লইয়া ইন্দুর বাড়ীতে যান, তখন ইন্দু দাদার অপেক্ষায় বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। দাদাকে দেখিয়াই ইন্দু বলিয়া উঠিলেন "দাদা! এই'নাকি সেই ছেলেটী? আহা! একে এমন রোগা দেখাচ্ছে কেন?" অজা সেখানে আসিয়া কিছুক্ষণ পরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ইন্দুরেখা তাহাকে কোলে করিয়া পালঙ্কে লইয়া শোয়াইয়া মায়ের মতন ক'রে সেবা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অজার জ্ঞান হইল। সে চাহিয়া দেখে একটী সুন্দর সাজান ঘরে, সুন্দর পরিষ্কার বিছানায় শুইয়া আছে। এমন সুন্দর স্থান সে তাহার জীবনে কখন দেখে নাই। ফিরিয়া দেখে কাছে একজন (ঠিক যেন মায়ের মত) তার মুখপানে চাহিয়া আছেন; আর তার সমস্ত শরীরে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছেন। এই সব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল "এই বুঝি স্বর্গ"! সে আস্তে আস্তে বলিল "এই কি স্বর্গ?" তাহার কথা শুনিয়া ইন্দুরেখা তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "না বাছা! একি স্বর্গ? এ স্বর্গ নয়।" এই বলিয়া অজাকে এক বাটি গরম দুধ খাইতে দিলেন। তাহাকে দুধ খাইতে দেখিয়া ললিত বাবু বলিলেন "ইন্দু! ওকে একেবারে অনেক খেতে দিওনা। ওর কোন ভাল জিনিষ খাওয়া অভ্যাস নাই, অল্পে অল্পে খেতে দিও।"

ইন্দু। তা দিব। কিন্তু দাদা! এর কাপড় বড় ময়লা, এ কাপড় গুলো ফেলে দিয়ে একে স্নান করিয়ে দেব।

ইন্দুরেখা দেবী কাপড় খুলিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া দিলেন। তার গায়ের একটা ময়লা জামার পকেট হইতে একখানা ছোট খাতা বাহির করিয়া অজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানা কি তোমার খাতা?"

অজা। হ্যাঁ। আসবার সময় ঠাকুর মা আমাকে এখানা দিয়েছেন।

"তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি আসি" এই বলিয়া নীচে গিয়া দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ দাদা! ও ছেলেটীর নাম কি?"

ললিতবাবু। ওর নামটাতো জানিনা। ওকে একটা নূতন নাম দিতে হবে। ওকে সকলে অজা বলে ডাকে, কিন্তু সেটাতো আসল নাম নয়!

ইন্দু। কাজেই একটা নাম দিতে হবে। আর দেখ ওর কাপড় এত ময়লা যে আর এক দণ্ডও বাড়ীতে রাখ্‌তে পারি না। আর ভাল কথা মনে পড়েছে। ওর একটা পিরাণের পকেটে একখানা ছোট খাতা পেয়েছি; তাতে হয়ত ওর নাম লেখা থাক্‌তে পারে।

ললিতবাবু। নিয়ে এস তো দেখি? নামটা হয়তো থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।

এখানে একটা কথা বলা উচিত; ইন্দুরেখার স্বামীর নাম রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনিও সেখানে বসিয়া ছিলেন। ইন্দুরেখা দেবী উপর হইতে খাতা খানি আনিয়া দাদার হাতে দিলেন, ললিত বাবু খাতা খানি খুলিয়া দেখেন, একটীও পাতা নাই। দেখিয়া বলিলেন "এতে কিছু নাই—নামটা তবে পাওয়া গেল না।"

রাজকুমার বাবু। দেখি! দেখি! থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। এই যে! এই যে! দেখি! অ—জি—ৎ—কু—মা—র—তার পর কি লেখা আছে পড়তে পারি না। প্রথম অক্ষরটা 'ব' তার পর কি পড়া যায় না।

ইন্দু। অজিৎকুমার বোধ হয় ওরই নাম। অজিৎ থেকে অজা করে নিয়েছে। তাই হবে।

ললিত বাবু। ও মেয়েমানুষটী বোধ হয় ওর আপনার ঠাকুর মা নয়। আর ওর সঙ্গে কথা কইলেই বোধ হয়, যেন কিছু লুকান কথা আছে। যা হোক ওর উপর চোক্ রাখতে হচ্চে।

কাল ললিত বাবু বাড়ী যাইবেন। ইন্দুরেখা অনেক পীড়াপীড়ি করাতে স্বীকার করিয়াছেন যখনই ছুটী হইবে, তখনই সুরমা দেবীকে সঙ্গে করিয়া আসিবেন। ললিত বাবু যাইবার সময় দেখেন অজা চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। মুখ খানি প্রফুল্ল। হাসিটী মুখে ধরিতেছে না। ইন্দুরেখা দেবী তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেছিলেন, দাদাকে দেখিয়াই উঠিয়া বলিলেন "দাদা! এখনই চল্লে না কি? আবার কবে আস্বে? শীঘ্রই এস। বৌদিদীকে অবিশ্যি অবিশ্যি সঙ্গে করে নিয়ে এস।"

ললিত বাবু। আচ্ছা আর কতবার বল্তে হবে। ঢের হয়েছে। অজা! আমি যাচ্ছি কাকে কি বলতে হবে?

অজা। সকলকে বলবেন আমি এখানে বেস্ ভাল আছি, খুব সুখে আছি। আর মেনাকে বলবেন তাকে আমার বড় দেখ্তে ইচ্ছা করে। সে যেন আমার জন্য না কাঁদে।

ললিত বাবু। এই! আর কিছু নয়? ইন্দু, আমি তবে আসি।

ইন্দুরেখা দেবী দাদার সঙ্গে সঙ্গে নীচে পর্য্যন্ত গেলেন এবং ললিত বাবু চলিয়া গেলে অজার কাছে আসিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনেক দিন ধ'রে অজা রাজকুমার বাবুর বাড়ী আছে। সে রাজকুমার বাবুকে মেশো মহাশয় আর ইন্দুরেখা দেবীকে মাসী মা বলিয়া ডাকে। এখন অজাকে দেখিলে সে ছেলে বলে আর চেনা যায় না। সে এখন মোটা হয়েছে, লম্বা হয়েছে, তার শরীর পরিষ্কার, চুল পরিষ্কার, কাপড় পরিষ্কার। তার পা এখন আর খোঁড়া নয়। যেন সে অজাই নয়। অজার মুখে সর্ব্বদাই হাসি টুকু লাগিয়া আছে। ইন্দুরেখা দেবী তাহাকে পড়ান, সে এখন অনেকটা পড়িয়া ফেলিয়াছে, শীঘ্রই কথামালা ধরিবে। অজা এখন "রাজা" কুকুরের সঙ্গে প্রত্যহ বিকালে বাগানে ছুটাছুটি খেলিয়া বেড়ায়। অজা এখন কত কি কাজ করে। পড়ে, লেখে, বাগানে ফুলগাছ বসায়, গাছে জল দেয়, হাঁসকে খাবার দেয়, আরও কত কি কাজ করে। অজার আজ কাল এক নূতন নাম হয়েছে। মাসী মা সে নামে ডাকলে অজা বড়ই খুসী হয়। সে নামটী অজিৎ। আজ অজা বাগানে ফুলগাছ পুতিয়া গাছে জল দিয়া রাজার সঙ্গে খেলা করিতেছে, এমন সময় মাসীমা বাগানের দিকে আসিতেছিলেন, অজাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "অজিৎ! এক খবর আছে শুনে যদি খুব খুসী হও, তবে আমায় কি দিবে?"

অজিৎ। মাসীমা! আর কি দিব? তোমায় কুড়িটী চুমো দিব। বল না! মাসীমা কি? আমার বড়ই শুন্তে ইচ্ছা করছে।

মাসী মা। কাল দাদা আর বৌদিদী এখানে আস্ছেন। এখনি একখানা চিঠি পেলাম।

অজিৎ। হো! হো! আমি এইবারে ইটের চকের খবর পাব। হো! হো! এইবারে দিদীমার কথা, মেনার কথা শুন্তে পাব।—এই বলিয়া সে মাসীমাকে জড়াইয়া ধরিল। তার পর হাত তালি দিয়া বাগানময় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজার সঙ্গে খেলা দূরে গেল। রাজা বেচারি আর কি করে? অজিৎ নাচিতে নাচিতে যেখানে যায়, সেও তার পিছন পিছন ছুটিয়া গিয়া তার পায় কামড়ায়। অজিতের

নাচ দেখিয়া ইন্দুরেখা দেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "অজিতের আমার নাচ দেখ! এখনও ইটের চকের কথা ভুলিতে পারে নাই। নাচটা একটু থামাও দেখি?"

অজিৎ। মাসীমা! মামাবাবু আমায় দেখলে চিন্তে পারবেন না। আমি এখন দেখ্তে আর এক রকম হয়ে গেছি, না?

মাসীমা। বোধ হয় চিন্তে পারবেন না। তুই একেবারে বদ্লে গেছিস্। তোকে যখন চিন্তে না পেরে জিজ্ঞাসা করবেন 'এ কে ইন্দু?' তখন আমি বলব 'এ সে অজা নয়—তাকে তাড়াইয়া দিয়াছি।' কেমন? না। না। আমি বলব এই আমার লক্ষ্মীছেলে "অজিৎ-ধন"। এই বলিয়া তিনি অজিতের মুখে একটী আদরের চুম্বন দিলেন। যখন ইন্দুরেখা দেবী অজিতের সঙ্গে আদর ক'রে কথা বলিতেন, তখনই তুই বলিয়া কথা কহিতেন। এটাও ওঁর আদরের ডাক। এইরূপে অজিতের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ইন্দুরেখা দেবী চাহিয়া দেখেন সন্ধ্যা হইয়াছে। অল্পে অল্পে অন্ধকার চারিদিক ঢাকিয়া আসিতেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে কাক "কা" "কা" করিয়া উড়িয়া বাসায় যাইতেছে। সন্ধ্যা হইতেছে দেখিয়া তিনি চমকিয়া বলিলেন "ওমা! কথা কহিতে কহিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। চল অজিৎ! বাড়ী ফিরিয়া যাই। এতক্ষণ তোমার মেশো মশাই এসেছেন। না! আসেন নি; এলে খবর পেতাম।" এই বলিয়া দ্রুত পদে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। অজিৎ আগে আগে ছুটিয়া বাড়িতে পৌঁছিল।

"বাবা আমায় রেখে গেছেন!"

সকলেই বোধ হয় জান, যে জাহাজে ঠিক বাড়ীরই মত তলা থাকে। বড় বড় বাড়ীতে যেমন একতলা, দুতলা, তিনতলা থাকে তেমনি জাহাজেও একতলা, দুতলা, তিনতলা প্রভৃতি তলা থাকে। জাহাজে এমনও অনেক যায়গা আছে যেখানে কেহ বড় একটা যাওয়া আসা করে না। একবার একখানি জাহাজের এক কোণে ৮।৯ বৎসরের একটী ছোট ছেলে দুই তিন দিন ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তার কাছে কিছু খাবার ছিল, সে ক্ষুধা পাইলেই তাহা বাহির করিয়া খাইত। দুই তিন দিন তাহাকে কেহই দেখিতে পায় নাই। তার পর চারিদিনের দিন যখন জাহাজ সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন একজন তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাপ্তেনের কাছে গিয়া বলিল "মহাশয়! জাহাজের নীচের তলায় একটী ছেলে কোণে লুকাইয়া বসিয়া আছে, সে আমাদের জাহাজের লোক নয়। দেখিবেন আসুন।" কাপ্তেন এই কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলেন ছেলেটী কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, দেখিয়া তাহাকে বাহির হইয়া আসিতে বলিলেন। তাহাকে দেখিয়া কাপ্তেনের অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল। তিনি রাগে চীৎকার করিয়া বলিলেন "তুই কোথা থেকে এলি? তুই না ব'লে কেন এ জাহাজে চড়্লি? দুষ্ট ছেলে! বল্ কেন তুই এখানে লুকাইয়া রহিয়াছিস্? বল্, শীঘ্র বল্ এখানে কেন?" বালক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "বাবা আমায় রেখে গেছেন।"

কাপ্তেন। কি? মিথ্যা কথা! বাবা তোকে রেখে গেছেন? বল্ কেন এখানে এলি?

বালক। কাপ্তেন! বাবা আমায় রেখে গেছেন।

কাপ্তেন। ফের? ফের? 'বাবা আমায় রেখে গেছে'? এবার ও কথা বলেছিস্ কি মেরেই ফেল্ব।

বালক। না কাপ্তেন! বাবা আমায় রেখে গেছেন।

কাপ্তেন রাগে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। চোক্ কান দিয়া আগুণ বাহির হইতে লাগিল। রাগে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি সজোরে

বালকের ছোট ছোট রোগা দুখানি হাত ধরিয়া অত্যন্ত ঝাঁকড়াইতে লাগিলেন, আর সিংহের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন "ফের ও কথা! আবার মর্‌তে সাধ গিয়েছে? আবার ও কথা বল্‌বি কি মেরেই ফেল্‌ব। বল্‌ হতভাগা, এলি কেন?"

বালক কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিল "আমি আসি নাই, বাবা রেখে গেছেন।"

কাপ্তেন। তবে কি মর্‌বি? মর! নিয়ে এস দড়ী। আজ এর মৃত্যু উপস্থিত। কে বারণ করে?

পার্শ্বের লোকেরা কাপ্তেনের ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল; কেহ তাহাকে ফাঁসিতে ঝুলাইতে অগ্রসর হইল না। কাপ্তেন ফের চীৎকার করিয়া বলিলেন "তবে কেহ দিবে না? আমিই দিব।" এই বলিয়া যাই তাহার দুই হাত ধরিয়া উঁচু করিয়াছেন অমনি ছেলেটী বলিয়া উঠিল "কাপ্তেন! আমাকে মারবেন? আমি সত্যই বলিয়াছি, বাবা আমায় রেখে গেছেন। তা মরিবার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। তবে আমি প্রার্থনা করি?"

কাপ্তেন। কর্‌।

বালক হাত দুখানি জুড়িয়া চক্ষু দুটী বন্ধ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিল "হে ঈশ্বর! আমি যে সত্য বলিতেছি তুমিত তা সব জান। আমি যদি মরি তবুও হে ঈশ্বর! সত্য কথাই বলিব। আমি জানি সত্য বলিলে তুমি ভাল বাস। তবে আমি মরি। তুমিত আমায় ভাল বাস, মরিলে তোমার কাছে যাব, তাহলে আমার কিসের দুঃখ?" প্রার্থনা শুনিয়াই কাপ্তেনের পাষাণ মন গলিয়া গেল। তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। তাঁর কথা যেন কে বন্ধ করে দিল। বালকটী বাঁচিয়া গেল। তবে নাকি মিথ্যা কথা না হইলে চলে না? তবে নাকি ভগবান প্রার্থনা শুনেন না? তবে নাকি ঈশ্বর আমাদের ভাল বাসেন না? তবে নাকি সত্য কথার পুরস্কার নাই? নাই?? কে বলিল নাই? আছে! সত্য কথা বলি ত ভয় নাই! সত্যেরই জয় হয় জানিও। সত্যসত্যই এই ছেলেটীর পিতা তাহাকে এই জাহাজে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। গরিব মানুষ, ছেলেকে খাইতে দিবার ভয়ে তাহাকে জাহাজে রাখিয়া যান; মনে করিয়াছিলেন যে জাহাজ সমুদ্রে বাহির হইয়া পড়িলে আর তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবে না, কাজে কাজেই তাহাকে একটা কাজ দিয়া খাইতে দিবে। কাজেও তাহাই হইল। বালকের মৃত্যু হইল না।

ধাঁধা।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। মাস। ২। নৌকা। ৩। (১) ম। (২) লজ্জা। ৪। দুজনকেই কুমার বলে। ৫। ঘুম। ৬। মাছ-রাঙ্গা।

নূতন।

১। তিনটী অক্ষর মম সুগোল শরীরে—
প্রথম ছড়িলে পরে কেহ না আদরে;
দ্বিতীয় ছাড়িয়ে, দেখ! সকলেই করি—
শেষ ছেড়ে ভেঙ্গে খেয়ে মুখ চুল্‌কে মরি।

২। মস্তকেতে দীপ্তি ছিল, দুষ্টলোকে কেড়ে নিল
তখনই লাগিলাম কাজে;
মধ্যদেশ করি ছেদ পাষণ্ডে করিল ভেদ
চেয়ে দেখ খাদ্য দ্রব্য সাজে।
পদ কাটি খান খান করিল বিঁধিয়া বাণ
বোঝা হয়ে পড়িলাম খসি;
বালক বালিকাগণ, বল, স্থির করি মন,
কে আমি, পরের আজি দাসী?

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পূজার ছুটী উপলক্ষে সখার গ্রাহক এবং গ্রাহিকাগণের মধ্যে অনেকেরই আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এখন যে স্থানে আছেন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাটী বা অন্যত্র যাইবার সম্ভাবনা; এই জন্য আমরা আগামী (অক্টোবার)মাসের সখা উক্ত মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির না করিয়া উক্ত মাসের শেষ সপ্তাহে বাহির করিব।

সখা কার্য্যালয়
২ নং বেনিয়াটোলা লেন
পটলডাঙ্গা, কলিকাতা
} কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২নং বেনিয়াটোলা লেন পটলডাঙ্গা "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

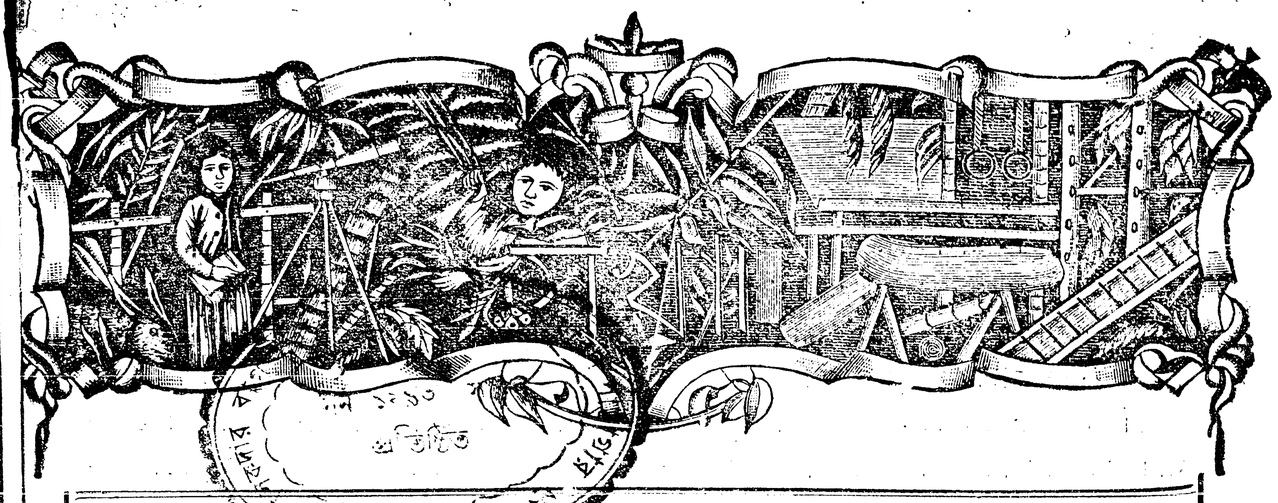

দ্বিতীয় ভাগ। কলিকাতা অক্টোবর। ১০ম সংখ্যা।

খুঁতধরা ছেলে।

বিলাতে চারিটী ভাই একদিন এক যায়গায় বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তাহাদের আলাপের বিষয়, কে কি করিবে। সকলেরই মনে ইচ্ছা, একটা কিছু হওয়া চাই। সকলের 'একটা কিছু' তো আর এক রকম হয় না। তাই চার ভাই চার রকম কথা বলিল।

একজন বলিল—"আমি ইটের কারবার করিব। তাহাতে টাকা হইবে, আর ইট দিয়া আমার একখানা বাড়ী করিব।"

আর একজন বলিল—"দূর হ, তোর নেহাত ছোট নজর। আমি তোর চাইতে বেশী একটা কিছু হ'ব—আমি ইঞ্জিনিয়ার হ'ব। কত লোক আমার কাছে ঘরবাড়ীর নক্‌সা করিয়া নিতে আসিবে; কত লোকের বাড়ী-ঘর বাঁধিয়া দিব। আমি একটা "দশজনের একজন" হইব। বলিস্‌ কি, আমার নামে একটা ষ্ট্রীট যদি না হয়, তখন দেখিস্‌।"

তৃতীয় ভ্রাতা—"বিল্‌ডার, কণ্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার সব বাজে লোক। তোরা হ'বি চিনির বলদ। আমি কি করিব জানিস্‌। আমি অন্যের কাজ নিয়ে ছুটোছুটী করিতে যাইব কেন। সব কাজে আমার নিজের বুদ্ধি খাটিবে। সব নূতন ফ্যাসানে বাড়ী-ঘর করিব। আমার সব এমন হইবে যাহা কেহ কখন দেখে নাই।"

শেষ ব্যক্তি উঠিয়া বলিল "তোরা যাহাই করিস্‌ ভাই, এমন কিছু করিতে পারিবি না যাহার উপর আমার বক্তৃতা না চলিবে। উত্তম হইল; দেখ্‌দেখি। তোরা যাহা করিবি, আমি তাহার দোষ ধরিব। আমার কাজের আর অভাব কি?"

চারি ভা'য়ের পরামর্শ ঠিক হইল। একজন ইটের কাজ করিয়া কিছু টাকা করিল। ইট দিয়া তাহার একটী বাড়ী হইল। তা ছাড়া এক দুঃখিনী বুড়ীকে ঐ ইট দিয়া আর একটী ঘর করিয়া দিল। কণ্ট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি মহাশয়ও কথামত কাজ করিলেন। মিউনিসিপালিটিকে খোঁচাইয়া নিজের নামে একটী ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত কেমন করিয়া করিয়া লইয়াছেন। তিনিও একটা কিছু হইয়াছেন। তৃতীয় বেচারা নূতন ধরণে বাড়ী করিতে গিয়া চাপা পড়িয়া মরিল। খুঁত-ধরা মহাশয়ের তো কথাই নাই। তাহার কাজ ফুরায়ই না। মরিবার সময় পর্য্যন্ত সে সন্তোষ-জনকরূপে, প্রশংসার সহিত কর্ত্তব্য-কাজ করিয়া গেল।

এক দিন স্বর্গের দরজায় দরোয়ান দেবতা বসিয়া রহিয়াছেন। সে প্রকাণ্ড দরজা। বিশ্বকর্ম্মার হাতের তৈরি। বুঝিতেই তো পার; স্বয়ং বিশ্বকরম ঠাকুর যাহা করিয়াছেন সে কেমন সুন্দর। এত সুন্দর যে আর কি বলিব! দরজায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুখানা কাচ লাগান। তাহার ভিতর দিয়া দরোয়ান ঠাকুর কে আসিল দেখিতে পান। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাহা করিতেছিলেন না। অনেক কাল হইল স্বর্গে লোক আসে না; তাই আজ কাল কাজের ব্যস্ততা কিছু কম। দেবতা দরজা খুলিবার হীরার হ্যাণ্ডেলে হাত ঝুলাইয়া সোণার টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছেন। এমন সময় কড়াৎ কড়াৎ করিয়া দরজায় ঘা মারিবার শব্দ হইল। বাহির হইতে একজন লোক বলিতেছেন—

"অনুগ্রহ করুন মহাশয়, আমি ভিতরে আসিতে প্রার্থনা করিতে পারি?—দরজাগুলিতো মন্দ নয়; কিন্তু স্বর্গের দ্বার বন্ধ থাকিবে কেন? দরজাগুলি আরো বড় হওয়া উচিত।"

"তুই কেরে, পৃথিবীর লোক ক্যাচ্ ম্যাচ্ করিয়া কথা কহিতেছিস্?"

"অত মোটা সুরে বলিতেছেন কেন?—আমি স্বর্গে যাইতে চাই।"

"বটে? তুই করিয়াছিস্ কি?"

"আমি খুঁতধরা কাজ করিয়াছি। আমার তিন ভাই যে কাজ করিয়াছে তাহার সমস্ত দোষ আমার নোট বহিতে লিখিয়া আনিয়াছি। যে ইট পোড়াইয়াছিল সে আর দুই মণ কয়লা কম খরচ করিলে সুরকীওয়ালা সহজেই খোওয়া করিতে পারিত। যার নামে ষ্ট্রীট হইয়াছে সে এত রোগা যে অত বড় ষ্ট্রীটে তাহার কিছু দরকার নাই। যে চাপা পড়িয়া মরিয়াছে—"

"আরে থাম্ থাম্; ও সব কি কাজ? তুই নিজের হাতে কি করিয়াছিস্?"

"এই সব নোট লিখিয়াছি।"

"দূর হ ব্যাটা, তুই কি আর কোন কাজই করিস্ নাই? কেবল দোষ ধরা কাজই করিয়াছিস্?"

"আর স্মৃতি পুস্তিকায় তাহা লিখিয়াছি।"

"যা, যা! তোর এখানে আসিবার হুকুম নাই। "আউ পচারিব কাহ্নু, জগনাথঙ্কু———" বলিয়া দরোয়ান দেবতা গান ধরিলেন। আমাদের সমালোচক দেখিলেন যে এত পথ খরচ, রেলভাড়া, গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়াও কোন ফল পাইলেন না। বিরক্ত হইয়া মনে করিলেন যে কাগজে লেখা উচিত 'স্বর্গে ভাল অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত নাই'। গাড়ী পাইতে অনেক দেরী, সুতরাং ইত্যবসরে দরজার দোষগুলি টুকিয়া রাখিতে লাগিলেন। দরজার কথা শেষ হইলে সাহেব দ্বারী ঠাকুরের গানের এক মজার বর্ণনা লিখিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে, যে বুড়ীকে তাঁহার ভাই ঘর করিয়া দিয়াছিল, সে আসিতেছে। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"ও বুড়ী! তুই কেমন করিয়া আসিলি?"

"তাই তো বাপু, আমি তো কিছু জানি না। আমি গরিব দুঃখিনী বুড়ী, এমন তো কিছুই করি নাই যাহাতে এখানে আসিতে পারি।

"তুই কি কোন কাজই করিস্ নাই? আমি তো সমালোচনা করিয়াছি।"

"আমার আর তো কিছুই মনে হয় না। তবে একদিন আমার বাড়ীর কাছে পুকুরে জমা বরফের উপরে পাড়ার সকলে খেলা করিতে গিয়াছিল। যাইবার সময় আমাকে সকলেই দেখিয়া মিষ্টি কথা কহিয়া গেল। আমি ভয়ানক কাতর ছিলাম। কিছুকাল পরে দেখি, আকাশে এক রকম মেঘ দেখা দিয়াছে। ওরূপ মেঘ আমার জন্মে আমি আর একবার দেখিয়াছিলাম। তখন দুই মিনিটের মধ্যে সমুদায় বরফ ফাটিয়া গিয়াছিল। আমার

মনে বড় ভয় হইল। এখনই এতগুলি লোক ডুবিয়া মরিবে ভাবিয়া আমার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি কি করি। রোগে মরি, উঠিবার শক্তি নাই, ডাকিলেও কেউ আমার কথা শুনিবে না। তখন আমি আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে বাহিরে আসিয়া আপনার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলাম। সকল লোক বুড়ী পুড়িয়া মরিল মনে করিয়া দৌড়িয়া আসিল। আমি তার পর কি হইল বিশেষ জানি না। কেবল মাত্র একবার জিজ্ঞাসা করিলাম "কার কিছু হয় নিতো?" একজন লোক বলিল 'না, আমরাও আসিয়াছি আর বরফ ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' তার পর আর কিছু জানিনা। কে যেন আমাকে এখানে আনিয়াছে।"

বুড়ীর কথা শুনিয়া দরোয়ান দেবতা স্বর্গে খবর দিলেন। আর দলে দলে দেবতারা আসিয়া "এসো এসো বুড়ী এসো" বলিয়া আদর করিয়া বুড়ীকে স্বর্গের ভিতর লইয়া চলিলেন। কিন্তু বুড়ী সমালোচকের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল:—"ওর ভাই আমাকে বাড়ী করিয়া দিয়াছিল, আমার থাকিবার যায়গা ছিলনা। ও মুখ কালো করিয়া ফিরিয়া যাইবে, আর আমি কোন্ প্রাণে তোমাদের সঙ্গে স্বর্গে যাইব? আমার মনে বড় লাগে। আমাকে তোমরা স্বর্গে নিও না। এ বেচারা তাহা হইলে বড় কষ্ট পাবে।"

তখন দেবতারা সমালোচককে বলিলেন—"অলস! অপদার্থ! যা! বুড়ীর জন্য তোকে স্বর্গে নিয়া যাওয়া হইল। তুই জীবনটা কেবল সমালোচনা করিয়াই কাটাইলি, ভাল কাজ কিছুই করিলি না। তোর মতন লোক আর এর পূর্ব্বে স্বর্গে যায় নাই।"

দেবতারা তার পর বুড়ীর সঙ্গে সমালোচককেও টানিয়া স্বর্গে নিয়া চলিলেন। সমালোচক হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। একবার মাত্র বলিল। "টানিয়া লওয়া বুঝি তোমাদের অভ্যাস নাই। ভাল করিয়া টানা হইতেছে না। এমনি ক'রে বুঝি টানে?"

ঢেঁকি যেখানেই যাক্, তার ধান ভানা কাজ ঘোচেনা; আমাদের সমালোচক ভায়া স্বর্গে গিয়াও খুঁত ধরিতে ব্যস্ত, আর কিইবা করে, একটা কাজ তো চাই? কতকগুলি ছেলে অছে, তারা কেবলই খুঁত ধরে; **পরের দোষ দেখিয়া তাহার নিন্দা করার চেয়ে নিজের দোষ শোধরাইয়া পরের গুণ দেখা ভাল।**

মার্কিন মহিষ।

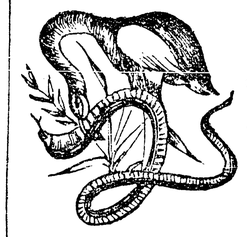

ন্দর বনের বড় বড় জঙ্গলে, যেখানে সাপ বাঘের আড্ডা, যেখানে গাছের ডালে ডালে বুনোপাখীর মজলিশ, যেখানে নদীতে হাঙ্গর, কুমীর হা করিয়া থাকে এবং অনেক সময় ডাঙ্গা পর্য্যন্ত মানুষকে তাড়া করিয়া যায়,—সেইখানে বড় বড় বুনো মহিষের দল আপনার মনে চরিয়া বেড়ায়। দেখিতে কালো ভূতের মত, মস্ত ঢাকের মত মাথার মাঝে দুপাশে দুটো চোখ মিটির মিটির করিতেছে, দেড় হাত দু হাত লম্বা এক একটা শিং;—সেই শিং নাড়িতে নাড়িতে মাঝে মাঝে এক একবার বাছুরের মত শব্দ করিতে করিতে, যমের মত জানোয়ারগুলো যখন গাছপালা ভাঙ্গিয়া, নদী খাল সাতরাইয়া ক্ষেত আবাদ নষ্ট করিয়া চলিতে থাকে, তখন বাঘেরও প্রাণ উড়িয়া যায়, কুমীরেরও মুখ কালো হইয়া যায়,—আর আশে পাশে যে সব মানুষ থাকে, তাদেরতো কথাই নাই! তারা যে কোথায় গিয়া রক্ষা পাইবে তাহা ভাবিয়া পায় না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের

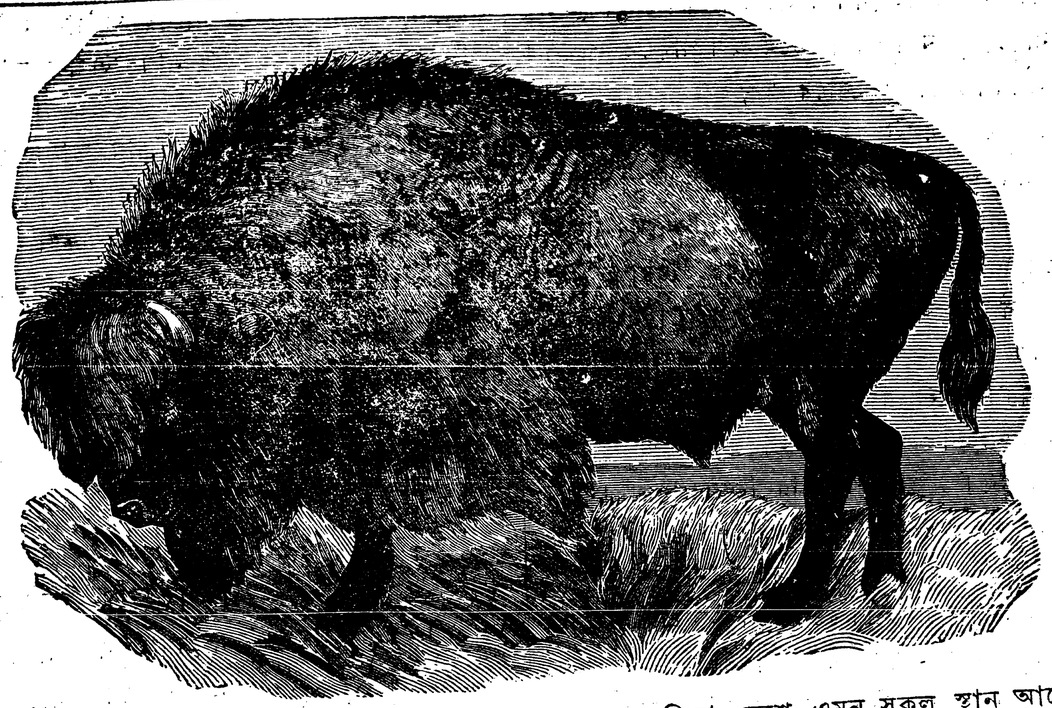

সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে মহিষ যমরাজের বাহন। না হবে কেন! দেবতাটীও যেমন, বাহনটীও তেমনি।

কিন্তু আমাদের দেশের গয়লারা যে মহিষ পোষে, তাহা দেখিয়া বুনো মহিষ যে কি তাহা বোঝা যায় না। আবার আমাদের দেশের বুনো মহিষ দেখিতে যেরূপ ভয়ানক, তাহা দেখিয়াও আমেরিকা বা মার্কিনদেশের মহিষের চেহারা ঠিক করিয়া উঠা যায় না। ইংরাজীতে মার্কিন মহিষকে বাইসন্ বলে। সে বৎসর চিয়ারিণী সাহেবের সার্কস্ বা ঘোড়ার নাচে একটা বাইসন্ আসিয়াছিল। আমরা সেটাকে দুবার দেখিয়াছি। সেটা দেখিতে আমাদের মহিষের মত উচু নয় বটে, কিন্তু গায়ে এত জোর, যে সার্কসের প্রদর্শনী চক্র অর্থাৎ গোলাকার ঘেরা যায়গা হইতে প্রায় ১৫।১৬ জন লোককে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল, কেহই তাহাকে দড়ী ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

আমেরিকা দেশে এমন সকল স্থান আছে যেখানে কেবলই মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে, এবং তাহাতে কেবলই লম্বা লম্বা ঘাস। ঘাস গুলি বুঝি কম লম্বা মনে ভাবিতেছ? বড় সোজা কথা নয়; সে গুলো এত লম্বা যে মানুষ ডুবিয়া যায়, এবং একবার তাহার মধ্যে গিয়া পড়িলে, দিক ঠিক করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসা কষ্ট। এই ঘাসবনে ব্যাঘ্র, গোবাঘা, প্রভৃতি মহাশয়েরা সুখে বাস করিয়া থাকেন। আমাদের মার্কিন মহিষ মহাশয়ও এইখানে থাকিতে ভাল বাসেন। পাহাড়ে বা কোন জঙ্গলে থাকিতেও তাঁহার আপত্তি নাই তবে তিনি কেবল এই চান যে স্থানটী এমন হইবে যেন মানুষগুলো গিয়ে তাঁহাকে বিরক্ত না করে। মানুষগুলো কি তা শোনে না বোঝে!

সেই ঘাসবনে, সেই পাহাড়ময় স্থানে, সেই ভয়ানক জঙ্গলে মানুষ ঘোড়ায় চড়িয়া মহিষ ধরিতে যায়। মহিষ ধরিতে গিয়া মানুষও দু

একবার ধরা পড়েন—কখনও প্রাণ যায়, কখনও হাত পা ভাঙ্গিয়া রক্ষা পান। মহিষ কি সহজে ধরা দেয়! দলে দলে শিকারী ঘোড়ায় চড়িয়া, দড়ী হাতে করিয়া আসিতেছে দেখিলেই মহিষেরা দলশুদ্ধ দৌড়িয়া পলাইতে থাকে, কিন্তু ঘোড়ায় চড়িয়া যাহারা আসিতেছে, তাহাদের সহিত দৌড়িয়া পারিবে কেন? শিকারীরা শীঘ্রই নিকটে আসিয়া পড়ে। তাহাদের হাতে যে দড়ী থাকে, তাহার এক পাশ ঘোড়ার গলায় বা শিকারীর কোমরে বা হাতে বাঁধা আর এক পাশে ফাঁসী করা; শিকারীদের হাতের এমন কৌশল যে সময় বুঝিয়া যাই দড়ীটা ছুঁড়িয়া দেয়, অমনি তাহা মহিষের গলায় বা পায়ে জড়াইয়া ফাঁসী লাগিয়া যায়। এ দিকে দড়ীর আর এক দিক শিকারীর কাছে বা সচরাচর ঘোড়ার গলায় বাঁধা আছে। সেই দড়ী ধরিয়া ঘোড়া মহিষকে টানিয়া লইয়া যায়। মার্কিন মহিষ দেখিতে যত ভয়ানক, তত সাহসী নয়। দলছাড়া হইয়া সহজেই ভয় পেয়ে উঠে, কাজেই শিকারীরা যেমন টানিয়া লইতে থাকে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকে,—তবে দু একটা দু একবার ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া, দু এক ঘা না খাইয়া ও না দিয়া মানুষের বশে আসে না। ফাঁসি দিয়া ধরিবার নিয়ম আজ কাল বড় একটা নাই; এখন অসভ্যের তীর ধনুকে এবং সুসভ্যের গোলা গুলিতে অতি সহজেই মার্কিন মহিষের পশু-জন্ম শেষ হয়। মার্কিন মহিষের হাড়, মাংস, চামড়া প্রভৃতি প্রায় সমস্ত জিনিষই কোন না কোন কাজে লাগে, এই জন্যই মানুষ অত কষ্ট করিয়া মহিষ শিকার করে।

মার্কিন মহিষ পরমেশ্বরের এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি, তিনি যে কত স্থানে কত চমৎকার দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সীমা কি। আমরা যে ছবি দিলাম তাহা দেখিলে ওরূপ জীব যে সত্য সত্যই আছে, তাহা কি সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? কিন্তু পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে সকলই সুন্দর, সকলই চমৎকার। আমরা যতই দেখিতে থাকি, ততই আশ্চর্য্য বোধ হইতে থাকে, আর মনে হয়, এ পৃথিবীতে কত কি আছে, আমরা তাহার কিছুই জানিনা।

মিছা কথা কহিও না।

ধন কখন মিছা কথা কয়না। তাহার অন্য অনেক দোষ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে মিছা কথা কহিতে শুনে নাই। সুতরাং তাহার সমস্ত দোষ থাকিলেও গ্রামের লোক তাহাকে একটু ভাল বাসে। তাহার পিতা দেশে থাকেন না, এজন্য বিনা যত্নে, বিনা চেষ্টায় ছেলেটী দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এবার তাহার বাপ বাড়ী আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া অনেক ভাল ভাল জিনিস কিনিয়া দিলেন, আরও বলিলেন যে সে যাহা চাহিবে তাহাই দিবেন যদি সে মন দিয়া পড়াশুনা করে ও তিনি যাহা বলিবেন তাহা শুনে। সাধন স্বীকার করিল। তিনি নূতন নূতন বেশ রঙ্গীন বৈ কিনিয়া দিলেন ও বাড়ীতে বসিয়া পড়িতে বলিলেন। গ্রামের ৪।৫ জন ভাল ছেলে ভিন্ন আর কাহারও সহিত খেলা করিতে নিষেধ করিলেন। এইরূপে কয়েক দিন কাটিয়া গেল, সাধন মন দিয়া পড়ে, পড়া হইলে ঐ সকল ভাল ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে ও উত্তম উত্তম কাপড় চোপড় পরে, উত্তম উত্তম খাবার খায়। মনে খুব আহ্লাদ। দুষ্ট ছেলেরা তার পিতার ভয়ে আর নিকটেও যায় না।

এক দিন তাহার পিতা কোথা যাইবেন, তাই যাইবার সময়ে বেশ্ করিয়া সাধনকে বলিয়া গেলেন। সমস্ত দিনে যে সকল কার্য্য করিতে

হইবে তাহা দেখাইয়া দিলেন, বিশেষ করিয়া বলিলেন যেন সব কুচরিত্র বালকদের সঙ্গে খেলিতে না যায়। তিনি চলিয়া গেলে ঐ সকল দুষ্ট বালক সুবিধা পাইয়া চারিদিক হইতে উঁকী মারিতে লাগিল, শীশ্ দিতে লাগিল, ও নানা রূপে সাধনকে ডাকিতে লাগিল। সে প্রথম প্রথম শুনিয়াও শুনিল না, পিতার উপদেশ মনে করিয়া সে সকল ছেলেদের দিকে চাহিলও না। অনেক ক্ষণের পর একবার যেই সেদিকে ফিরিয়াছে, অমনি তাহারা সকলে বলিল "একবার নামিয়া আইস, একটা কথা শুনিয়া যাও।" সে যাইতে অস্বীকার করিল, তখন তাহারা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল "কেবল একটী কথা শুনিয়া যাও।" এক শ বার এই কথা বলিতে বলিতে সাধনের মনে হইল, একবার ত যেতে হানি নাই। খেলিতেই নিষেধ, দেখা করিতে ত মানা নাই। এই মনে করিয়া সে বাহিরে আসিল। তখন ঐ সকল বালকেরা মায়া কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "কি ভাই! একেবারে আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে? একটীবারও কি আমাদের দেখা দিতে নাই? এতদিনের ভাব কি একেবারে চিরকালের জন্য গেল? তুমি পড় না, তাতে ত আমরা বারণ করি না, কিন্তু তুমি না হলে আমাদের খেলাই হয় না। আমরা তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" ইত্যাদি কত সব কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বালক সাধন মহা বিপদে পড়িল। তাহার এমন সাহস হইল না যে সে বলে "না ভাই তোমরা মন্দ, তোমাদের সঙ্গে খেলিব না, তোমরা ভাল হও, তার পরে খেলিব।" এ না বলিয়া সে বলিল "বাবা বকেন, তোমাদের সঙ্গে বেড়াইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন।" অমনি তাহারা বলিল "আজি ত আর তিনি বাড়ী নাই, চলনা কেন যাই। আজ আমরা চাটুর্য্যেদের বড় বাগানে চড়াইভাতী করিব, আজ তোমার নিমন্ত্রণ। সেখানে যেতেই হবে।" সাধন চুপ করিয়া রহিল। দুষ্ট বালকেরা সুবিধা বুঝিয়া "হৈ হৈ" শব্দে সকলে চীৎকার করিয়া তাহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া গেল। সে অনেক বলিল "মাকে বলিয়া আসি," কিন্তু তাহার কথা ছেলেদের গোলে ডুবিয়া গেল।

বাগানে আজ মহা ধূম ধাম। ২০।২৫ জন ছেলে মহা আমোদে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিতেছে। এক দিকে জন কতক ছেলে কি বাটিতেছে, কোথাও কজন বেশ্ মনের আনন্দে বসিয়া গল্প করিতেছে, এক কোণে ৪ জন বালক দাঁড়াইয়া কাঠ ভাঙ্গিতেছে, কোথাও বা চাল ডাল সব ধুইতেছে। সব ব্যস্ত, সব আনন্দিত, সব খুসী। এত আমোদের ভিতরে পড়িয়া আর কতক্ষণ সাধন মলিন মুখে থাকিবে? তাহার ভয় ক্রমে দূর হইল; "যা হবার তা হবে এখন, এখন ত আমোদ করা যাক।" সেও তাদের সঙ্গে মিশিয়া খুব মাতিয়া গেল। আর আর ছেলেরা তাকে খুসী করিয়া ভুলাইয়া রাখিবার জন্য আরও বেশী যত্ন করিতে লাগিল। তাহার মনের তখন আর এক ভাব। এতদিন আলাদা থাকিয়া পিতার সৎকথায় যে কিছু উপকার হইয়াছিল, তাহা সব যেন বন্যার জলে ভাসিয়া গেল। তাহার তখন ইচ্ছা হইতে লাগিল যে তাহার বাপ আর বাড়ীতে না আসেন, আর সে মনের আনন্দে সঙ্গীদের সহিত খেলাধূলা করে। উঃ! কুসঙ্গের কি ভয়ানক ক্ষমতা! কুসঙ্গে কি সর্ব্বনাশই হয়! পিতার এত সৎ উপদেশ, এত ভালবাসা, এত যত্ন, এত ভাল ভাল খাবার দেওয়া, সব ভাসিয়া গেল! দুষ্ট বালকদের সঙ্গে পড়িয়া সাধন আবার মজিল।

আমরা ছেলেবেলা একটা গল্প শুনিয়াছিলাম যে একজন ঘেসেড়া ঘাস কাটিতে গিয়া হঠাৎ

একটা কেউটে সাপের ছানার সম্মুখে পড়ে, সাপটী তাহার আঙ্গুলে কামড়ায়। সে অমনি ঝাঁ ক'রে তাহার ঘাস কাটা খুর্পা দিয়া আঙ্গুলটী কাটিয়া ফেলিল, কাজেই বিষ আর না উঠিতে পারায় সে বাঁচিয়া গেল; আঙ্গুলটী বিষে জরিয়া সেখানে পড়িয়া রহিল। কদিন পরে আবার সেখানে আসিয়া দেখিল যে সেই আঙ্গুলটী তথায় রহিয়াছে; নির্ব্বোধ ঘেসেড়া মনে করিল এখন আঙ্গুলটী আবার জোড়া দিলে হয়। এই মনে করিয়া যেমন তাহা সেই কাটা যায়গায় জোড়া দিয়াছে, অমনি সেই বিষ উঠিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। হায়! হায়!! বুদ্ধির দোষে বেচারা মারা গেল, প্রাণটী হারাইল। অবোধ সাধনেরও ঠিক সেই দশা হইল। কুসঙ্গের বিষে তাহার সর্ব্বনাশ হইত, হঠাৎ সে সঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া তাহার বাঁচিবার আশা হইল; অমনি আবার লোভে পড়িয়া যেই সে কুসঙ্গে আসিয়া জুটিল, আর তখনি আবার সেই পুরাণ বিষ তাহার মনে চড়িয়া সর্ব্বনাশ করিল, সে আবার যে সেই হইয়া দাঁড়াইল!!

খুব আমোদে দিন ত কাটিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। সকলে বাড়ী গেল। এইবার সাধনের মহাবিপদ! এতক্ষণের পর তাহার চৈতন্য হইল, এতক্ষণের পর তাহার পিতার স্নেহ মনে পড়িল, যাইবার সময় প্রাতে যে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, তাহার বুক "ধপ্-ধপ্" করিতে লাগিল। মুখ শুকাইয়া গেল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। মনের মধ্যে যে তাহার কি হইতে লাগিল, তাহা তোমরা বুঝিয়া লও। "যদি বাবা বাড়ী আসিয়া থাকেন, আমাকে খুঁজিয়া পান নাই। গিয়া কি বলিব? কি করিব? কি হইবে? হায়! হায়!! কেন গেলাম? কি ছাই আমোদ করিলাম? কেন গেলাম? কি করিলাম?" সে আর বাড়ীর দিকে যাইতে পারে না। পথের ধারে দাঁড়াইয়া কাপড়ের এক কোণ লইয়া দাঁতে চিবাইতেছে আর মাটির দিকে চাহিয়া আছে, চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে।

তাহার ছোট বোন্ বাহিরে আসিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা বাড়ী এসেছেন?" সে বলিল "না"; তখন অনেক ভরসা হইল। চক্ষু মুছিয়া চোরের মতন আস্তে আস্তে পড়িবার ঘরে গিয়া যে কার্য্য দিয়া গিয়াছেন তাহা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে হবে কেন? একদিনের কায কি কখন এক ঘণ্টায় হয়? হইল না।

একটী দুষ্কার্য্য করিলে আরও শত দুষ্কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়। সাধনের তাহাই হইল। একে পড়া হয় নাই, তাহাতে আবার বদ্ ছেলেদের নিকট গিয়াছে, বাবা শুনিলে মহা রাগ করিবেন, হয়ত একেবারে সব কাড়িয়া লইয়া দূর করিয়া দিবেন। ভয়ানক রাগ হইবে। তাহার চেয়ে সাধন একটা সোজা উপায় দেখিল। যা হবার তা ত হইয়াছে। এখন আর কখন এমন করিবে না, কিন্তু আজিকার মত এখন বাঁচে কিরূপে? মিছা কথা। কি? মিছা কথা? যাহা কখন কহে নাই? যে দোষ কখন হয় নাই?—কাজে কাজেই!! সাধনের পাপের চূড়ান্ত হইল! সর্ব্বনাশ পূর্ণ হইল!! পিতা আসিলে সমস্ত মিথ্যা কথা বলিয়া ঢাকিয়া ফেলিল!

কিন্তু বলিবার সময়ে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল বুঝিতেই পারিতেছ? বুকের ভিতরে কে যেন ঢেকী পাড়িতেছিল, মনের মধ্যে যেন একটা নরক ঢাকা রহিল। সেদিন রাত্রে তাহার ঘুম হইল না, চক্ষের জলে বালিশ ভাসিয়া গেল, সমস্ত রাত কাঁদিয়া কাটাইল। আর সাধনের মুখে হাসি নাই, আর তাহার মনে সুখ নাই।

সে ঘটনা প্রায় এক মাস হইয়া গিয়াছে, আজিও সে এক বারও হাসে নাই, শরীর শুকাইয়া মৃত-প্রায় হইয়া গিয়াছে। সকলেই মনে করে, তাহার কি কঠিন রোগ হইয়াছে, সর্ব্বদাই অন্য-মন হইয়া ভাবে। কদিনের মধ্যে কি যেন হইয়া গেল। তাহার পিতা একদিন খুব আদর করিয়া কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন সে এরূপ হইতেছে? অনেক কষ্টে বালক সমস্ত বলিয়া ফেলিল। "হু হু" করিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল, সে একেবারে পিতার পদতলে পড়িল এবং সমস্ত বলিয়া শান্তি চাহিল। পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন। সেই অবধি সাধনের জীবন নূতন হইয়া গেল। এখন সেই বালক একজন মান্য গণ্য দেশের বড়লোক। তাহার চরিত্রের গুণে সে অঞ্চলের অধিকাংশ লোক ধর্ম্মের পথ গ্রহণ করিয়াছে। বালক বালিকাগণ! কি শিখিলে? কখন ভুলিও না।

ঠাকুরদাদার গল্প।

আজ আবার নবীন বাবু সকলকে লইয়া তাঁহার বড় দীঘিতে একখানা ছোট জালিবোটে করিয়া বেড়াইতেছেন; বড় ছেলেরা সব দাঁড় বাহিতেছে, ছোটরা মজা করিয়া বসিয়া আছে, বুড়ো মানুষ হাল ধরিয়া চালাইতেছেন। বোটে বেড়াইতে যাবার নাম শুনিয়া আজ অনেক গুলি ছেলে আসিয়া যুটিয়াছে। ও পাড়ার চারু, চাটুর্য্যেদের যদু ইত্যাদি কত যে আসিয়াছে তার ঠিক নাই, প্রায় দশ পনেরো জন। বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, কেউ গান করিতে পার?" সকলে বলিল চারু পারে। তখন সকলে পরম সুখে মনের আনন্দে সূর্য্য অস্ত যাবার সময় সূর্য্যের রাঙ্গা ছবিখানির দিকে চাহিয়া সেই বিষয়ে চারুর একটী সুন্দর গান শুনিতে শুনিতে দাঁড় বাহিয়া চলিলেন। সে যে কি আনন্দ তা আর বলা যায় না।

বেড়ান হয়ে গেলে গল্প আরম্ভ হবে, সকলে বসিলেন। কিশোরী বলিল "দাদা! সেদিন-কার কথাটা সব বুঝেছি, একটুখানি গোল আছে। ঐ যে বলেছিলে হাল্‌কি আর ভারী বাতাস,—সেখানটা আমি ভাল বুঝি নাই। বাতাস ত সকলের চেয়ে হাল্‌কি, এর আবার হাল্‌কি ভারী কি হবে? বাতাস কি ওজন করা যায়?" সেদিন স্থির হল সেই বিষয়েই বলা হবে। তখন নবীন বাবু বলিলেন, একথা ত এখানে ভাল হবে না, বাড়ী চল, আমার ঘরে যন্ত্র টন্ত্র আছে, তাহাতে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিব। অমনি সকলে হৈ হৈ শব্দে খেলার আমোদে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ীতে নবীন বাবুর (Experiment room) পরীক্ষাগৃহে সকলে প্রবেশ করিয়া একটা গোল টেবিলের চারিদিকে এক একখানা চেয়ারে বসিল। নবীন বাবু বসিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগি-লেন।—"সেদিনই বলিয়াছি যাহার পরমাণু আছে তাহারই ভার আছে। বায়ুর পরমাণু আছে সুতরাং বায়ুরও ভার থাকিবে। এত খুব সোজা কথা, কিন্তু এ কথা সকলে ঠিক বুঝিতে পারে না। তোমরা মন দিয়া শুন, বেশ্ বুঝিতে পারিবে। বাতাস যে ভারী বটে, এ আর কি প্রমাণ দিব; যদি দেখা-ইতে পারি একদিকে বাতাস, আর একদিকে অন্য একটা ভারী জিনিষ—দুই ওজন করিলেসমান হয়, তাহ'লে হয়; কিন্তু তা কেমন কোরে হবে। আচ্ছা, এক কর্ম্ম করা যাক। এই যে বড় বোতলটা, এটার মধ্যে বায়ু আছে ত? এটাকে ওজন করি। (করিলেন)। দেখ ঠিক আধ সের হ'ল। আচ্ছা, এইবার 'বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র' দ্বারা এর ভিতরের বাতাস খানিকটা বাহির করিয়া লই—বলিয়া একটা যন্ত্রের ছেঁদায় বোতলের মুখ দিয়া, একটা হাতল নাড়িতে লাগিলেন। খানিক বাদে বোতলের মুখের কাছে একটা "ষ্টপ্‌কক্" বা স্ক্রু দেওয়া ছিপি আঁটিয়া দিলেন; সেটা আগেও ছিল, কিন্তু খোলা ছিল। তার পর যন্ত্র থেকে খুলিয়া লইয়া আবার ওজন করিলেন।—ঐ যাঃ!! হাল্‌কি হয়ে গেছে। তারপর দাদা বাবু বলিলেন "দেখিলে, বায়ু বাহির করিয়া লইয়াছি, আর হাল্‌কি হয়ে গেল; যদিও খুব কম, তবু হাল্‌কী ত হল বটে? তবেই দেখ, বাতাসের ভার আছে। আবার যদি ঐ "কন্‌ডেন্সার" যন্ত্র (condenser) দিয়া উহার ভিতর খুব বাতাস পুরিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আবার বেশী ভারী হবে। বুঝিলে?" সকলে বলিল "হাঁ একটু একটু"। চারু জিজ্ঞাসা করিল, বায়ুর ভার মাপিবার জন্য না "ব্যারমিটার" নামে কি যন্ত্র আছে? সেইটার বিষয় বুঝাইয়া দিবেন কি?"

নবীন বাবু বলিলেন "আমি আজ সেই কথা বলিব বলিয়াই মনে করিয়াছি। আমি যাহা যাহা বলি, কর দেখি। দুহাত লম্বা একটা কাচের নল লইয়া এস, (চারু আনিল); ঐটা জলে পূর্ণ কর, তারপর উপুড় করিয়া টেবিলের উপর ধর। ঐ! সব জল যে পড়িয়া গেল?" কিশোরী—"তাত যাবেই, জল যে গড়িয়ে পড়িবে। নলটার একটা মুখ যে বন্ধ, আর একটা মুখ যে খোলা, তাই সব জল পড়ে গেল।" নবীন বাবুঃ—"বেশ্, আবার সোজা ক'রে জলে পূর্ণ কর, তারপর এই জলের বাটীতে উপুড় কর, দেখিও মুখটার আঙ্গুল দিয়ে জলের মধ্যে রেখে তারপর ছেড়ে দিও। (কিশোরী তাই করিল) কৈ! এবার ত জল পড়িল না?"—সকলে অবাক্! কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না।

তখন নবীন বাবু আবার ঐ নলটা পারদে পূর্ণ করিতে বলিলেন। (পারা চক্‌চকে, খুব ভারী, পাৎলা এক রকম ধাতু)। তার পর একটা পারদের বাটিতে উপুড় করিয়া ধরিতে বলিয়া, বলিলেন—"দেখিও যেন উপুড় করিবার সময় পড়িয়া না যায়, মুখে আঙ্গুল দিয়া ধর। আর নলটাও খুব ভারী হইয়াছে, জোরে ধরিও। ভাল, দেখ দেখি যেই আঙ্গুলটী টানিয়া লইবা নলের মুখ খুলিয়া দিলে, অমনি হড়াৎ ক'রে খানিকটা পারা বাটীতে পড়িয়া গেল, কিন্তু সবটা না। ঐ দেখ একটু নামিয়াছে, (ছবি দেখ) পারদ কিন্তু এখনও নলের মধ্যে

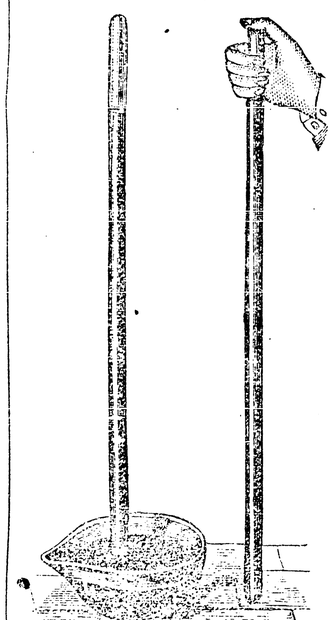

প্রায় ২৯।৩০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া খাড়া আছে। এর কারণ কি জান?" সকলে আরও অ-বাক্! কেহই উত্তর দিতে পারিল না।

তখন একটু হাসিয়া নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন "তোমাদের দোষ নাই, কতকাল কত চেষ্টা করিয়াও বড় বড় পণ্ডিতেরা ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। কেহ বলিতেন 'কোন যায়গা একে-বারে খালি থাকা স্বভাবের বিরুদ্ধ' তাই ঐ জল যে পড়িয়া যাইবে তাহার স্থান কে অধিকার করে? খালি থাকিতেও পারে না, এ জন্যেই জল পড়িতে পারে না, এই রকম কত লোকে কত রকম কথা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কেহই ঠিক কথাটী বলিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৬৪৩

ষোল শ তেতাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে ইটালি দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত 'টরিচেলী' এই মহা গোলমেলে বিষয়টী মীমাংসা করিয়া দেন। তিনি. অমনি একদিক বন্ধ একটী নল পারদে পূর্ণ করিয়া আঙ্গুল দিয়া তাহার খোলা মুখটা চাপিয়া ধরিলেন ও পরে তাহাকে পারদের একটা বাটিতে উলটিয়া ধরিলেন। ধরিবামাত্র খানিকটা বাটিতে পড়িয়া গেল; প্রায় ৩০ ইঞ্চি পারদ উচ্চ হইয়া নলের ভিতর রহিল, আর তাহার উপরটা খালি রহিয়া গেল। (চিত্রের বাম দিকের নল দেখ) তখন তিনি ভাবিলেন এ কি রকম কথা? যদি 'স্থান খালি থাকা স্বভাবের নিয়ম বিরুদ্ধ' হয়, তবে ৩০ ইঞ্চির উপরে কি সে নিয়ম খাটে না? নহিলে উপরে ঐ যে খালি উহা রহিল কেন? এই রূপে চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন তাঁহার আগেকার পণ্ডিতদের কথা নিশ্চয়ই ভুল। এর জন্য কোন কারণ অবশ্য থাকিবে। কি সেই কারণ? তাঁহার মতে স্থির হইল ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল বায়ুর চাপ। পৃথিবীর উপরের বায়ুরাশি ঐ বাটির পারদের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, তাই সেই চাপের জন্যই ঐ নলের ভিতরের পারদ নামিতে পারে নাই। ইহাই ঠিক কথা: তার পরে কত শত উপায়ে 'টরিচেলী' সাহেব এই কথাটী সত্য বলিয়া প্রমান করিয়াছেন।"

"এখন মনে কর, পৃথিবীর উপরে আকাশে আর সমস্ত বায়ু নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিযাছি মোটামুটী প্রায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বায়ু আছে বলা যায়। এই সমস্ত বাতাসটার ভার পৃথিবীর উপর রহিয়াছে। এমন কি পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন ও আমরাও দেখাইতে পারি যে এক ইঞ্চি লম্বা এক ইঞ্চি চওড়া স্থান টুকুর উপর প্রায় ৭½ সাড়ে সাত সের বায়ুর চাপ আছে; (সকলে:—"ও বাবা! তবে আমরা বাঁচি কি ক'রে, চাপে মরে যাই না কেন?") তা হলে হিসাব করে দেখ আমাদের হাতে, পায় গায়ে কত মন ভার চেপে রয়েছে। তবু আমরা টের পাই না। মিছা মিছি এত ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি অথচ টের পাই না, এত বড় মজা। কিন্তু টের যে পাই না তার কারণ আছে, প্রথমতঃ—চিরকাল ধরিয়া এ অভ্যাস, এখানেই জন্ম, এখানেই বৃদ্ধি, এখানেই মৃত্যু, কাজেই সেটা বুঝিতে পারি না; আর দ্বিতীয়তঃ যেমন উপরে ঐ বাতাস, তেমনি নীচেও বাতাস, ভিতরেও বাতাস, চারিদিকে বায়ু থাকাতেই কোন দিক থেকেই চাপ লাগে না। এ সব কথা এর পর আরও ভাল করে বুঝিতে পারিবে। এখন এই টুকু মনে রেখে দাও যে আমাদের মাথার উপর যে বায়ুর রাশি রহিয়াছে তাহার ভার আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়। আমাদিগকে যেমন সহ্য করিতে হইতেছে তেমনি পুকুরের জিনিষকেও সেই রকম ভার বহিতে হয়। আচ্ছা! এখন মনে কর একটা বাটীতে জল রেখে তার উপর ঠিক তার মুখের মতন একখানা ছোট রেকাবীর মাঝখানে একটা ফুটো করে, সেইটা চাপিয়া ধরা যায়,—তাহা হইলে কি হইবে?—(সকলে:—ঐ ফুটো দিয়ে হু হু ক'রে জল উঠিবে) বেশ্ কথা। এইবার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিবে। এখন মনে কর ঐ ফুটোটাতে যদি একটা কাচের নল বসান যায়, আর তার পর ঐ রকম চাপ দেওয়া যায় তা হলে ঐ নলের ভিতর জলটা উঠিবে। কেমন?—ঐ রেকাবীটাকে যত চাপিবে, নলের ভিতরকার জলও তত উঠিবে, আর উহাকে যত আল্‌গা দিবে, জলও তত নামিবে।"

"এখানেও ঠিক সেই রকম হয়। ঐ বাটিতে পাৎলা পারা রহিয়াছে। উহার উপর সেই রেকাবীটার মতন হয়ে উপরের বাতাস চাপা দিতেছে কাজেই পারা আর ত বাটিতে থাকিতে পারিবে না, উপরে উঠিবে। তাই ঐ নলের মধ্যে পারদ

খাড়া থাকে, সমস্ত নামিয়া পড়ে না। একটা নরম কাদাতে কাচ দিয়ে চাপ দিলে ত সমান হয়, উচু নীচু হয় না; কেন?—না সব যায়গায় চাপ পায়। আর যদি সেই কাচের মাঝখানে ফুটো থাকে তবেই না সেখান দিয়ে কাদা বেরোয়? এও ঠিক সেই রকম। পারাটার সব যায়গায় সাড়ে ৭½ সাড়ে সাত সের করিয়া প্রতি "বর্গ ইঞ্চি" স্থানে চাপ হবে, তবে ত সেটা সমান থাকবে? (সকলে হ্যাঁ।) বেশ্, এখন মনে কর একটা নল বায়ু শূন্য করিয়া তাহাতে ডুবাইয়া ধরিলাম। কি হবে? সে নলের মুখটা যেখানে সে যায়গা থেকে নলের মাথা অবধি বাতাস নাই, ফাঁক খালি। কাজেই বাহিরে যে রকম ৭½ সের বাতাসের ভার পাচ্ছে সেখানটায় তা পাচ্ছে না, সুতরাং সেইখান দিয়ে পাৎলা পারা উঠিতে থাকিবে,—যতক্ষণ সেখানেও বায়ুর বদলে পারার ভার ফি বর্গ ইঞ্চিতে ৭½ সের ক'রে হয়ে না দাঁড়ায়। বুঝিলে? (এবিষয়টা বড় কঠিন পাঠকগণ ২।৩ বার পড়িবেন)। এখন আমি যদি খালি বায়ুশূন্য নল না লইয়া, পারদ-পূর্ণ নল উহাতে ডুবাইয়া ধরি, তখন কি হয়? না ঐ পারদের মধ্যে যতটুকুর দরকার ততটুকু থাকিয়া যায়, অর্থাৎ কি বর্গইঞ্চে ৭½ সের যতটুকু পারা সেইটুকু নলের ভিতর উঁচু হইয়া থাকে, বাকীটা বাটীতে পড়িয়া যায়। সকলেই জানে যে প্রায় ৩০ ইঞ্চ লম্বা ও এক বর্গইঞ্চ মুখ এমন একটা নলের মধ্যে যতটা পারা ধরে তাহার ওজন ৭½ সের। কাজেই বুঝিতে পারিতেছ যে কেন ঐ বড় নলটার ৩০ ইঞ্চ বৈ আর সব ফাঁক থাকে।"

অমূল্য:—"আচ্ছা ওখানে কি কিছু নাই?"

নবীন বাবু—"আছে, ওখানে পারদের বাষ্প আছে। সে যা হউক, কাজের কথাটা বুঝেছ ত? না হয় আর একবার ভাল করে বলি, মন দিয়ে শুনে মনে রাখ। ঐ যে ছবি উহার নীচের বাটিটাতে পারদ আছে, আর ঐ নলেও পারদ আছে। বাটির পারদের সকল স্থানেই বায়ুর ভার পাইতেছে, কেবল যেখানে নলটী বসান সেখানে নয়। কিন্তু তেমন সেখানে ঐ ৩০ ইঞ্চি উচ্চ পারদের ভার বায়ুর ভারের কার্য্য করিতেছে। বুঝিলে? এখন বায়ুর ভার যদি অধিক হয় তাহা হইলে ঐ পারদের উচ্চতা বাড়িবে, কেননা বাহিরে জোরে চাপ পাইলে কাজেই নলের ভিতরে পারা উঠিবে। আর বায়ুর ভার কমিয়া গেলে পারাও নামিবে। এই উঠা নামা দ্বারা সুতরাং বেশ্ সুন্দর রূপে বায়ুর ভার মাপা যায়। এই উদ্দেশে ঐ নলের গায় ১,২,৩,.....এমনি সব ইঞ্চির দাগ দেওয়া আছে, প্রত্যেক ইঞ্চির দাগ আবার ১০০ ভাগে বিভক্ত হইয়া তাহাও দাগ দেওয়া আছে। কাজেই, যদি এক ইঞ্চির ১০০ এক শত ভাগের এক ভাগও পারা নামে বা উঠে তাহাও বেশ্ পড়িয়া বুঝা যায় যে বায়ুর ভার কমিল না বাড়িল। এই যন্ত্রের নাম "ব্যারমিটার" বা বায়ুর ভারমান যন্ত্র।"

চারু:—মহাশয়! আমি একটু জিজ্ঞাসা করিব—এই ব্যারমিটারের যখন এরূপ নিয়ম, বায়ুর ভারের জন্যই যদি পারদ উঠে নামে, তাহা হইলে উচ্চ পর্ব্বতে ইহা লইয়া গেলে ত ইহার পারদ নামিয়া যাইবে, কেননা সেখানে এখান অপেক্ষা বায়ুর ভার কম।"

মন্মথ:—"কেন সেখানে কম হবে?"

কিশোরী—"তা হবে না? বা! শুনলে মোটে ৫০ মাইল পথ উচ্চ বায়ু আছে, তাহার মধ্যে থেকে পর্ব্বতের উচ্চতাটা বাদ দাও, তবেই সমস্ত ৭½ সের থেকে এই নীচের বাতাসের ভারটা কমিয়া যাবে কি না।"

মন্মথ:—"হাঁ হাঁ বুঝেছি। ঠিক বটে।"

নবীনবাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "চারু তুমি যা বল্লে তাই ঠিক কথা। যখন বায়ুর ভারই

পারদের দাঁড়াইবার কারণ আর তাহাই যখন কম, তখন পর্ব্বতের উপরে ব্যারমিটারের পারদ নীচু হবে না ত কি? আর যথার্থই পর্ব্বতে না বেলুনে উঠে দেখা হয়েছে যে পারা নামিয়া পড়ে।

এখন বোধ হয় তোমরা সকলেই বেশ্ বুঝিলে যে বায়ুর ভার মাপা যায়, ও যে যন্ত্র দ্বারা মাপা যায় তাহাকে ব্যারমিটার বলে। আর এও বুঝিলে যে কিরূপে উহাদ্বারা এমন চমৎকার কাজ করা হয়।"

নলিন।—"দাদা, তুমি বড় শক্ত শক্ত কথা আজ কা'ল বল, একটু সহজ না হ'লে আমি বুঝিতে পারি না।"

কিশোরী—"বা! তাহলে আমরা কি করি? আমরা যেমন ক্রমে বড় হচ্ছি তেমনি বড় বড় বিষয় শিখিতে ইচ্ছা যায় না?

নবীন বাবু।—"আচ্ছা তুদলেরই মতন করে এবার গল্প ক'রব। আজ রাত্রি হয়েছে। বাড়ী যাও।—

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

সপ্তম অধ্যায়।

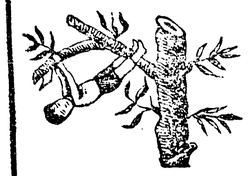

রদিন প্রাতে অজিৎ বাড়ীর সম্মুখের বাগানে 'রাজা'র সঙ্গে খেলা করিতেছিল; খেলাতে এতই মত্ত যে বাড়ীর ভিতরে একখানা গাড়ী গেল, তাহাও দেখিতে পাইল না। বলা বাহুল্য এই গাড়ীতে ললিত বাবু ও সুরমা দেবী আসিয়াছেন। অজিৎকে দেখিয়া সুরমা দেবী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখ, ওকি অজা? আমার বোধ হয় ও ছেলে সে অজা নয়।"

ললিত বাবু।—না। ও কখনই সে ছেলে নয়। তেমন-খোঁড়া রোগা ছেলে দুদিনের মধ্যেই কি অমন মোটা সোটা হৃষ্ট পুষ্ট হতে পারে?

যখন তাঁহারা দুজনে গাড়ীথেকে নামিতেছিলেন, তখন অজিৎ ঘোড়া দুটো দেখিয়া 'মামা বাবু আর মামী মা এসেছেন রে' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ললিত বাবু নামিয়াই ইন্দুরেখার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইন্দু! এ বোধ হয় সে অজা নয়?"

ইন্দু।—হ্যাঁ! অবিশ্যি সেই ছেলে। এমন বদলে গেছে যে দেখলে আর চেনা যায় না।

ললিত বাবু। ওমা! অজাকে দেখলে আর চেনা যায় না। অজা, কেমন আছ?

অজা বলিল 'ভাল আছি।'

ইহার পর ইন্দুরেখা সুরমা দেবীর হাতখানি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌদিদি! কতদিন থাকবে বল।"

সুরমা। দুদিন। তার পর আমি বাপের বাড়ী গিয়া বাকী ছুটিটা কাটাব। তোমার বাড়ীতে বেশী দিন থাকা হল না। এবার এসে অনেক দিন থাকব।

ইন্দু।—তবে যাও। আমি মনে মনে কত আনন্দ ক'রছিলাম। দাদা! তোমাকে আমি বুঝি এই বলেছিলাম। দুদিনের জন্যে না এলেই তো হ'ত।

ললিত বাবু।—লক্ষ্মী দিদিটী! অত রাগ ক'র না। এইবারে এসে অনেক দিন থাকব।

অজা আস্তে আস্তে ললিত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—"মামা বাবু! মেনা কেমন আছে? ইটের চকের আর সকলে কেমন আছে?"

ললিত বাবু।—মেনা এখন খুব সুখেই আছে। তার বাবা এখন মদ টদ খান না। চাকরী করিতেছেন। এখন বিনোদ বাবুরা ইটের চকে নাই। মেনা এখনও আমাদের বাড়ীতে আসে। সে প্রায়ই তোমার কথা

জিজ্ঞাসা করে। ইটের চকের সকলে ভাল আছে। আচ্ছা! আমি এবারে গিয়ে মেনাকে কি বল'ব?

অজিৎ।—ব'লবেন আমি খুব সুখে আছি। আমার কোন কষ্ট নাই, কোন দুঃখ নাই। মাসী মা যেশো মশাই আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি অনেকটা পড়ে ফেলেছি। আমার কোন কষ্টই নাই; কেবল মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়ে দুঃখ হয়। আর তাকে ব'লবেন, যে সে আমায় মনে করে শুনে আমি বড় সুখী হয়েছি। আমি তাকে ভুলি নাই।

অজিতের প্রফুল্লতা দেখিয়া সুরমা দেবী ও ললিত বাবু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। দাদাকে বৌদিদীকে লইয়া ইন্দুরেখা দেবী সমস্ত দিনটা আমোদে কাটাইলেন। সমস্ত দিনটা যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল, ইন্দুরেখা তাহা টেরও পাইলেন না। বিকালে সকলে মিলিয়া আমোদে আহার করিলেন। সেদিন হাসির রোলে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেদিন সকলের মুখেই হাসির রেখা; ইন্দুরেখা দেবীর বিশেষ আহ্লাদ। আহার করিয়া সকলে বাগানে বেড়াইতে গেলেন। ইন্দুরেখা ফুল তুলিয়া বৌদিদীকে সাজাইয়া দিলেন এবং বৌদিদীকে এ গাছ ও গাছ দেখাইতে লাগিলেন। গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে চাঁদ আকাশে ফুটিয়া উঠিল, চারিদিক জ্যোৎস্নাময় হইল। তখন তাঁহারা সকলে ঘাটে আসিয়া বসিলেন। পুষ্করিণীতে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্ নিক্ করিতেছে; গাছ গুলি জোনাকীতে ভরা। সে সময়ের দৃশ্য কি সুন্দর তাহা বলা যায় না। ঘাটে বসিয়া তাঁহারা কত গল্প করিতে লাগিলেন;—গল্পে গল্পে অনেক সময় কাটিয়া গেল। রাজাও এ দলের মধ্যে অবশ্য ছিল।

তার পরদিন ললিত বাবুরা যাইবেন। রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতেই ইন্দুরেখা দেবী আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইন্দুরেখা দেবীর ইচ্ছা যেন সন্ধ্যা না হয়,—সন্ধ্যা হইলেই দাদা বৌদিদী চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সন্ধ্যা ইন্দুরেখা দেবীর কথা শুনিল না, বরং সেদিন সন্ধ্যা শীঘ্র শীঘ্র আসিল। যতই অন্ধকার হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মুখ ভার হইয়া আসিতে লাগিল, মনটা কোন মতেই দাদাকে ছাড়িতে চায় না। মনে বড় সাধ ছিল যে এবার ছুটিটা দাদা বৌদিদীর সঙ্গে সুখে কাটাইবেন, কিন্তু তাহা হইল না। ইচ্ছা না থাকিলেও দাদাকে বৌদিদীকে ছাড়িতে হইল। যাবার সময় ইন্দুরেখার মুখ আরও ভার ভার হইল, চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। ললিত বাবু ইন্দুরেখা দেবীকে বলিলেন—"ইন্দু! তবে আমি আসি। কিছু মনে করিও না। ইচ্ছা ছিল, এখানে সমস্ত ছুটিটা থাকিব, কিন্তু থাকা হ'ল না। এবারে এলে অনেক দিন থাকব।"

ইন্দু।—তা আর থেকেছ। সব বারেইতো থাকবো বলে যাও।

সুরমা।—ইন্দু! তবে যাই। বড় দুঃখিত হয়েছ, না?

ইন্দুরেখা দেবী কিছু বলিলেন না, কেবল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে দাদা বৌদিদীকে নমস্কার করিয়া বিদায় দিলেন, এবং তাহারা চলিয়া গেলে, বিষণ্ণমুখে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ললিত বাবুরা ইটের চকে ফিরিয়া যাবার কিছু দিন পরে একদিন একখানা চিঠি পাইলেন। চিঠিখানা রামদাসের হাতের লেখা। তাহাতে লেখা আছে—"মহাশয়! আপনি পত্রপাঠমাত্র এখানে আসিবেন। অজার ঠাকুরমার অত্যন্ত অসুখ, বাঁচিবার আশা নাই। মরিবার আগে

আপনাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছে। আপনার সঙ্গে বড় দরকার। অনুগ্রহ করিয়া অবশ্য আসিবেন।" পত্র পড়িয়া ললিত বাবু বড় আশ্চর্য্য হইলেন—"আমার সঙ্গে আবার কি দরকার আছে?" অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। গিয়া দেখেন বৃদ্ধা বিছানার সহিত মিশাইয়া শুইয়া আছে। শীর্ণ মূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই ললিত বাবু চমকিয়া উঠিলেন। এমন ভয়ানক মূর্ত্তি তিনি কখনও দেখেন নাই। ধীরে ধীরে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি আমায় ডাকিয়াছেন, কি দরকার আছে বলুন।"

বৃদ্ধা। তোমার সঙ্গে কথা আছে সেই জন্য ডাকিয়াছি, আর কোন দরকার নাই। যদি শোন তবে বলি।

ললিত বাবু। বলুন আমি শুনচি।

বৃদ্ধা। অজা এখন কেমন আছে? বাবা আমি বড় পাপিষ্ঠা—আমার মত হতভাগিনী কে?

ললিত বাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? অজা ভাল আছে। আপনি বেশী কথা কহিবেন না।

বৃদ্ধা। বাবা বলতে আমার বুক কেঁপে যাচ্চে। আমার কথা বন্ধ হয়ে আসছে। আমি বলতে পারছি না। বাবা—তোমায় বলি—আমার পাপের কাহিনী বলি—শোন বাবা শোন। অজা বেঁচে থাক্। অজা—আমার—আ—মা—র না—তি নয়।

ললিত বাবু। সে কি? সে কি? তবে তাকে কেমন করে পেলেন। বেশী কথা কবেন না।

বৃদ্ধা। বাবা এতদিন বলি নাই। আজ আর পারব না। আজ শেষের দিন। কেমন করে পেলাম; তবে বলি শোন। অজার মা একটী ছেলে একটী মেয়ে নিয়ে ৮ বছর আগে একখানা গাড়ী করে একদিন রাত্রে, এ রাস্তা দিয়া যাচ্ছিলেন। আমাকে তাঁর একজন চাকর জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ গো বাছা! এখানে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী আছে? একদিনের জন্য আমাদের স্থান দিতে পারে?" আমি হতভাগিনী বলিলাম "না—এখানে কারো বাড়ীতে জায়গা নাই। এমন করে আবার কে আসে?" আমার কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না গো বাছা! আমার এখানে কেউ নাই। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। এখানে আমার স্বামী জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন; খবর পাইয়া আসিয়াছি। আমার থাকবার জায়গা নাই, সে বাড়ী খুঁজে পাচ্ছিনা। যদি থাকতে দাও তবে আমায় বড় দয়া করা হয়। আমার কাছে টাকা কড়ি আছে; তোমার কিছু ক্ষতি করব না। বড় বিপদে পড়েছি, দয়া করে এক রাত্রের জন্য স্থান দাও।" আমি দেখিলাম ভদ্রঘরের মেয়ে বাস্তবিকই বিপদে পড়িয়াছেন। তাতে আবার টাকা কড়ি আছে শুনিয়া স্থান দিতে সম্মত হ'লাম। তারপর এ পাপিষ্ঠার পাপের কথা বলি শোন। স্ত্রীলোকটীর অত্যন্ত অসুখ হল। এই বিছানায়! হায়রে! সাধ্বী-সতী ৮ বছর আগে এ ছার সংসার ছেড়ে গেছেন। সেই বিছানায় আমি পাপিষ্ঠা আজ পাপের বোঝা মাথায় করে মরিতে বসিয়াছি।

বাবা আমি বড় পাষাণ। আমার প্রাণে দয়া মায়া নাই। আজ আমার সেই দিনকার কথা মনে পড়িতেছে। যখন অসুখে পড়ে তিনি ছেলেটীর মেয়েটীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষের জল মুছিতেন, হায়রে পৃথিবীতে এমন কে আছে, যে সেই মায়ের চোখের দুটী ফোটা জল দেখিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারে। আর আমি—আমি মহা পাতকী সে চোখের জলকে গ্রাহ্য করিতাম না। তাঁর চোখের উপরই আমি

ছেলেটীকে মেয়েটীকে মারতাম, খেতে দিতাম না, যত্ন করিতাম না। তাঁকে ত করিতামই না। শক্তি ছিল না যে একবার এদের কোলে করেন। আমায় কখন কিছু বলেন নাই। কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন। তাঁর চোখ দুটী যেন আমাকে বলিত; "আমার বাছাদের কষ্ট দিও না, এরা আমার মাণিক, আমার সর্ব্বস্বধন!" ছেলেটী মেয়েটী খাট ধরে "মা" "মা" বলিয়া যেমন যেত তিনি জড়াইয়া ধরিয়া চুম খেতেন আর কাঁদিতেন; মেয়েটী বলিত "মা ওঠ! ওঠ! মা তোমার কি হয়েছে, মা বাড়ী যাবে না" তিনি কিছু বলতেন না, কেবল কাঁদিতেন। এ সবে আমার মন গলিত না। আমি কি মানুষ! না মানুষের মন কি এত কঠিন হয়? আমি কখনই মানুষ নই। আমি রাক্ষসী! আমি রাক্ষসী! আমি রাক্ষসী!! বলি শোন—আমার গলা বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এত অসুখ হয়েছিল, একদিন ডাক্তার ডাকি নাই। অসুধ দিই নাই। যত্ন করি নাই। আমি তাঁর মৃত্যুর কারণ। আমার হাতেই তাঁর প্রাণ গিয়াছে। উঃ! উঃ!! কি করেছি! তিনি আমায় বলিতেন "মা! এখানে ডাক্তার নাই?" আমি বলিতাম "ডাক্তার আবার তোমার জন্য ডাকে কে? অমনি সেরে যাবে।" তিনি আর উত্তর করিতেন না। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমিই তাঁকে মারিয়াছি। তাঁর যে কিছু টাকা কড়ি জিনিষ পত্র ছিল তা আমিই লই। অজা তখন ৬।৭ মাসের ছেলে। মেয়েটী প্রায় দুই বৎসরের। ছেলে মেয়ে দুটী দেখতে অতি সুন্দর ছিল। এদের মা দেখতে আরও সুন্দর ছিলেন। সে মুখখানি পানে চাহিলে লোকের প্রাণ ফাটিয়া যাইত। মেয়েটীকে একজন নিলেন। কিন্তু কে জানে আমি ছেলেটীকে কেন দিলাম না। অজার কপালে কিনা এ সব ছিল। আমার মতন রাক্ষসীর ব্যবহার সহ্য করা তার কপালে ছিল। আমি আর বলিতে পারি না। বাবা—বাবা—আমার কি গতি হবে? আমার কি উদ্ধার আছে? বাবা—থাকেত বল? আর সহ্য হয় না। আমি তাকে সারাদিনের মধ্যে জলমত দুধ দুই একবার খাওয়াইয়া দিতাম। খেতে দিলে খেত না। ভাল খাওয়া অভ্যাস ছিল কি না। ওকি খোঁড়া ছিল! ওকি অমন ছিল!! আমি করেছি। এ প্রাণ অমন কাজ করতে কেঁপে যেত না। এ হাত অত্যাচার করতে ভয় পেত না। এ প্রাণ পাষাণে বাঁধা। কোলে বসাইয়া রাখিতাম, কাঁদিলেই অত্যন্ত মারিতাম। মেরে মেরে না খেতে দিয়ে অমন দুর্দ্দশা করেছিলাম। ওগো সতি! তুমি কি তোমার প্রাণের ধনের দুর্দ্দশা দেখিতে? আমায় মাপ কর? করবে নাকি? ভগবান! তোমার একদিনের জন্যও ডাকি নাই, আমার কি গতি করবে না? তুমি না করলে, ভগবান!—আর কোথা যাব। বাবা আর কথা কইতে পারি না। তুমি আমার কাছে ভগবানের নাম কর। আর ওই বই খানা অজার মায়ের। তিনি মরবার আগে বই খানা ওদের দিয়েছেন। তুমি ও খানা আমার অজাকে দিও। তাকে যদি একবার পাই, বুকে করে নিয়ে প্রাণ শীতল করি। তুমি ভগবানের নাম কর; ও নাম শুনতে বড় ইচ্ছা করছে।

ললিত বাবু সব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বই খানা নাড়িয়া দেখেন, তাতে লেখা আছে "প্রাণের অজিৎ, ঊর্ম্মিলাকে মায়ের ভালবাসার উপহার।"—কিরণমালা রায়।

ললিত বাবু তাঁর কাছে ভগবানের নাম করিয়া বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

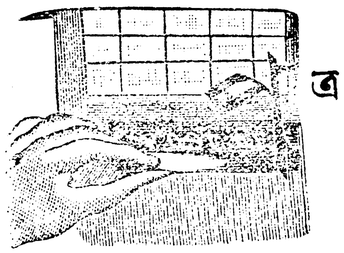

ত্র প্রেরকদের প্রতি।

শ্রীপ্রিয়বন্ধু নিয়োগী।—"সখা" পড়িয়া বালকদের উপকার হইতেছে, ইহ শুনিলে আমরা বড়ই সুখী হই। যাহারা উপকার পান, তাঁহারা যদি সেই কথা বলিয়া এক বয়সী আর দশ জনকে "সখা" পড়াইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আরও সুখী হই। এবৎসর যেমন রচনার পুরস্কার দেওয়া গেল, আগামী বৎসরে ও আমাদের এইরূপ পুরস্কার দিবার ইচ্ছা আছে।

ধাঁধা।

গত বারের প্রশ্নের উত্তর।

১। কচুরি। ২। ভারত।

নূতন।

১। বৈদ্যনাথ বসিয়া আছে, হঠাৎ দেয়াল থেকে একটা কি জন্তু তার মাথায় পড়িল, সে যেই হাত দিয়া ফেলিয়া দিতে গেল অম্নি উহার লেজটা তাহার মাথায় লাগিয়া গেল। বাঃ! বৈদ্যনাথ যে ভট্টাচার্য্য হয়ে গেল! বলত কি করে?

২। যথন আমার পেটের ভিতর থাক যাদুধন
শান্ত ছেলে হয়ে সবে ঘুমাস্ত তথন।
বাইরে এসে মুখটি ঘসে কর মহা রোষ
আপনি জ্বলে সারা হও, আমার কি তা দোষ।

৩। আমাকে যদি কেউ পা দেয় তবে তার যন্ত্রণায় ছুটোছুটি করে প্রাণ যায়, আর যদি না দেয় তবে তথনি শুয়ে পড়ি; বলত আমি কোন্ জন্তু?

৪। ছোট্ট বই বড় নই কে আমি বলত ভাই
থাকি আমি পণ্ডিতের ঘরে।
আঁখিতে নাইক যাহা কোথা নাহি পাবে তাহা
তাই সবে মোর সেবা করে।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে গড়ে দুইখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

২নং বেনিয়াটোলা লেন
পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।
শ্রীঅন্নদাচরণ সেন,
সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২নং বেনিয়াটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

একটী বালকের প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ লাহা কোম্পানীর দোকান সহরের একটী বড় দোকান। দোকানের কর্ত্তা রামকৃষ্ণ বাবু একজন খুব বড়লোক; তাই যথনই তাঁহার দোকানের দরজায় দেখা গেল যে তাঁহার চিঠিপত্র বিলি করিবার জন্য একজন বালকের প্রয়োজন, অমনি দলে দলে গরিবের ছেলেরা চাকরীর জন্য আসিতে লাগিল। যথনই কোন ছেলেকে চাকরী দেওয়া হয়, অমনি বিজ্ঞাপনটা তুলিয়া লওয়া হয়। রাস্তা দিয়া যত লোকজন যাতায়াত করে, তারা মনে করে, বুঝি লাহা কোম্পানীর লোক যুটিয়াছে—ওমা! এক দিন, দেড় দিন, কথনও দুদিন পরে আবার সেই বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে;—

"আমাদের দোকানের চিঠিপত্র বিলি করিবার জন্য একটী বালকের প্রয়োজন, ভিতরে অনুসন্ধান কর।"

লোকে বিজ্ঞাপন দেখিয়া বলাবলি করে "এদের কি রকম লোক চাই? এত দিনেও পাওয়া গেল না? তবে বুঝি একেবারে দেবতার মত লোক চায়—হুঁ—তা আর পেতে হয় না!" এদিকে রামকৃষ্ণ বাবুর মতলব বুঝিয়া উঠা যায়না; কেবল চিঠি বিলি করিতে এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি চাই, যে তাঁর লোক যোঠে না?—তবে বোধ হয় তাঁর আরও কিছু কাজ করাইয়া লইবার ইচ্ছা আছে!

কেদারনাথ ঘোষ নামক একটী বালক লাহা কোম্পানীর এই মতলব সকলের আগে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাকে প্রথম দিন চাকরী দেওয়া হইলে সে চিঠিপত্র বিলি করিতে লাগিল; তাহার পরদিন সকাল বেলা, রামকৃষ্ণ বাবু ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ কেদার! তেতলার সিঁড়ীর নীচে আঁধার কামরাতে একটা খুব লম্বা বাক্স আছে; সেই বাক্সটার মধ্যের জিনিশগুলো গুছিয়ে রাখগেতো।" কেদার মনে মনে চটিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া আঁধার কামরাতে গেল। ঘরটী বাস্তবিক আঁধার নয়, তবে কিছু আলো কম। কেদার গিয়া দেখে প্রকাণ্ড একটা লম্বা বাক্স, প্রায় দশ মণ বোঝা হবে, আর তার মধ্যে ভাঙ্গা প্রেক, মর্চ্চেধরা স্ক্রু, বড় বড় গজাল, এই সব রহিয়াছে। কেদার দুই একবার নাড়িতে চাড়িতে তাহার ভিতর হইতে একটা ইন্দুরের বাচ্ছা বাহির হইয়া পড়িল। "ই—মা গো! আমার কর্ম্ম নয়"—বলিয়াই কেদার তিন লাফে সিঁড়ী পার হইয়া নীচে আফীশ-ঘরে গিয়া বসিয়া শিশ্ দিতে

লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে রামকৃষ্ণ বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিহে! এর মধ্যেই হয়ে গেল।" কেদার বলিল "কিছু কর্‌বার নাই—সব ভাঙ্গা মর্চ্চেধরা জিনিশ! আর ওসব করবার জন্যেতো আমায় রাখা হয়নি।" রামকৃষ্ণ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"ওঃ আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে যা ব'লব তাই ক'রবে। তা যাক্! এই চিঠিগুলো ডাকে দিয়ে এসো।"—কেদার চিঠি লইয়া ডাকে দিতে গেল। যাইতে যাইতে ভাবিল "উচিত কথায় সকলেই জব্দ; বুড়োটাকে দুটো উচিত কথা বলেছি, আর অমনি সোজা; হি! হি! এমন না কর্‌লে কি আর কাজ চলে?" সেই দিন বিকাল বেলা আফীশ বন্ধ করিয়া বাহির হইবার সময় রামকৃষ্ণ বাবু কেদারের মাহিয়ানা বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"কাল থেকে তুমি আর এসোনা।" কেদার অবাক্! কিছু বলিতেও পারিল না, কারণ রামকৃষ্ণ বাবু তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। পর দিন প্রাতে দোকানের দরজায় আবার বিজ্ঞাপন ঝুলিল—"বালকের প্রয়োজন।"

আর একটী বালক আসিল, তাহার নাম দীননাথ দাস। সেও প্রথম দুই দিন বেশ চিঠিপত্র বিলি করিল; তিন দিনের দিন রামকৃষ্ণ বাবু তাহাকে আঁধার ঘরে বাক্স গোছাইতে পাঠাইলেন। বালক খানিকক্ষণ বসিয়া গোটাকতক পরিষ্কার প্রেক, স্ক্রু, প্রভৃতি লইয়া নীচে আসিল এবং রামকৃষ্ণ বাবুকে বলিল—"মহাশয় এই কটা ভাল জিনিশ পাওয়া গেল—আর সব নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলো কি গোছাব?"—রামকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "সেই গুলোইতো গোছাতে বলেছিলাম।" সেই দিন সন্ধ্যা বেলা দীননাথের চাকরী গেল। দীননাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "আমার দোষ কি?" বাবু কিছুই উত্তর করিলেন না। তাইতো! পাঠক পাঠিকা হয়তো মনে করিতেছেন "এ কি রকম মজার লোক রে বাপু!" যাহা হউক, পর দিন প্রাতে রাস্তার লোক দেখিল আবার বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে।

এইবারে আর একটী বালকের কপাল খুলিল, ইহার নাম যদুপতি ভট্টাচার্য্য। যদুপতি আগের দুটী বালককেও চিনিত না এবং আঁধার ঘরের বাক্সের কথাও জানিত না। সে আসিয়া একদিন বেশ কাজ করিল। পরদিন প্রাতে তাহাকে আঁধার ঘরে পাঠান হইল। যদুপতি সেখানে গিয়াই জিনিশগুলি গোছাইতে আরম্ভ করিল। যে জিনিশটা একটু পরিষ্কার করিলেই নূতনের মত হয়, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া এক এক রকম জিনিশ এক সঙ্গে রাখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল, কিন্তু সমস্ত জিনিশ আর পরিষ্কার হয় না, এত কাজ! নীচে থেকে বাবু ডাকিলেন—"যদু! হয়েছে?"—বালক বলিল, "আজ্ঞে, এখনও অনেক বাকী।" বাবু বলিলেন—"আচ্ছা! তবে এখন থাক্; খাওয়া দাওয়া ক'রে এসে আবার কর্‌বে এখন।" যদুপতি তাহাই করিল। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বাবু যদুপতিকে ডাকিতে যাইবেন, এমন সময় বালক নীচে গেল,—তাহার মাথা দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘাম পড়িতেছে। বাবু বলিলেন—"কিহে! হ'ল?" বালক মাথা হেঁট করিয়া উত্তর করিল "আজ্ঞে, যতদূর পারি করেছি! আর বাক্সটার সর্ব্ব নীচে এইটা পেয়েছি, নিন।" রামকৃষ্ণ বাবু দেখিলেন একখান মোহর;—বলিলেন, "জঞ্জালের বাক্সই সোনা রাখবার যায়গা বটে! আচ্ছা, আজ বড় পরিশ্রম হয়েছে, আবার কাল এসো।" বালক চলিয়া গেলে রামকৃষ্ণ বাবু একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া উপরে গেলেন। সে আঁধার ঘরে প্রায় কেহই যায় না—ঘরের মধ্যে মাকড়শার জাল, আরশুলার পাল, আর ইন্দুরের দল। মধ্যের বাক্সে পঁচিশ বছরের জঞ্জাল জমিয়া রহিয়াছে।

রামকৃষ্ণ বাবু গিয়া দেখিলেন, বালক বাক্সের সমস্ত জিনিশ বাহির করিয়া, টিনের পাত দিয়া বাক্সে ঘর করিয়াছে; এবং এক এক ঘরে এক এক রকম জিনিশ রাখিয়া তাহার গায়ে লিখিয়া দিয়াছে—"ভালস্ক্রু," "ছবি রাখবার গজাল," "চাবিকাটি," "ছোট প্রেক—একটু বাঁকা," "চেপ্‌টা লোহা, কি করে জানিনা," "মর্চ্চেধরা স্ক্রু," "বঁটির মত কি যেন," ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ বাবু দেখিয়া আনন্দে হো! হো! করিয়া হাসিলেন এবং মনে মনে বলিলেন—"এই ছেলেই চাই। যে এই সব সামান্য বিষয়েই এতো মনোযোগী, সে তো বড় বিষয়ে আরও মনোযোগী হবেই।"

রামকৃষ্ণ বাবুর দোকানে আর বিজ্ঞাপন ঝুলিল না। যদুপতি ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণ লাহা কোম্পানীর দোকানে চিঠি বিলি করিবার কাজে নিযুক্ত হইল, কিন্তু তাহাকে বেশী দিন এ কাজ করিতে হয় নাই। রামকৃষ্ণ বাবুর মতলব এতদিনে বোঝা গেল; তিনি চিঠি বিলি করিবার জন্য লোক চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চিরকাল তাহাকে দিয়া চিঠি বিলি করাইতে চাহেন নাই। যদুপতি ভট্টাচার্য্য কালে দোকানের একজন প্রধান বাবু হইল, এবং রামকৃষ্ণ বাবু মরিয়া গেলে, দোকানের একজন কর্ত্তা হইয়া মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিল। রামকৃষ্ণ বাবু যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, যদুপতিকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন এবং লোকে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত "এ লোকটা কোথা থেকে এসে আপনার ভালবাসা পেয়ে ব'স্‌লো," তখন তিনি হাসিয়া উত্তর করিতেন—"আঁধার ঘরের জঞ্জালের বাক্স থেকে!"

বাস্তবিকই যে সামান্য কাজে মনোযোগী, তাকে বড় কাজে দিয়া বিশ্বাস করা যায়। আর যে সামান্য কাজ সামান্যভাবে করে, তার কপালে কি আছে, সে কথা যারা ভুগিতেছে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিও।

একটা কিছু।

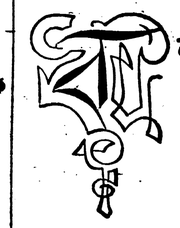

বহুবাজারের চৌরাস্তার ধারে অনেক দিন হইল একদিন একটী বালক দাঁড়াইয়া "চাই দেশলাই, পয়সায় দুটো দেশলাই"—বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। ছেলেটীর মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন সে কাহাকেও ঠকাইতে জানে না। বালকটী প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া দেশলাই বিক্রী করিল এবং কাজ শেষ হইলে আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে বাড়ী চলিল।

কলিকাতার একটা বিশ্রী গলিতে গোষ্ঠবিহারীর বাড়ী। বালক বাড়ী যাইবার সময় পথ হইতে কিছু খাবার কিনিয়া লইল, এবং তাহা খুব সাবধানে কাপড়ে বাঁধিয়া, কত পয়সা লাভ হইয়াছে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিল। কিন্তু এ ভাবনায় ওই দেখ উহার মুখে আহ্লাদের হাসি দেখা যাইতেছে, "এই পয়সা দিয়ে একটা কিছু ক'রব"—বালক মনে মনে ইহাই ভাবিতেছে আর আপনার মনে হাসিয়া খুন হইতেছে।

পচা নর্দ্দমার উপরে কাঠ ফেলা, তাহার উপর দিয়া যাইতে ভয় করে, পাছে টিপ্ করে পড়িয়া যাই, কিন্তু বালক গোষ্ঠ অনায়াসে তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল এবং খানিক চলিয়া একখানি ছোট খোলার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন সে আস্তে আস্তে দরজাটি [illegible] ঘরে ঢুকিয়া গেল এবং দেশ[illegible] আলো জ্বালিল। বালকের [illegible] ঘরের মধ্য হইতে একটী বালিক[illegible] "কে, দাদা এলে? দেখ দা[illegible] সূয্যি একটু দেখেছি, সেই [illegible] না?" বালিকার নাম লক্ষ্মীমণি, [illegible]

দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া তাহার বড় আনন্দ; কিন্তু দাদা বই তারতো আর কেউ নাই, কাহাকে এ সুখের খবর দিবে? তাই দাদা আসিবামাত্র তাঁহাকে খবর দিল। গোষ্ঠ মহা আনন্দিত হইয়া বলিল—"বটে? বটে? এই আর বেশী দিন নয়—আর ৭ দিন দেশলাই বিক্রী কর্‌তে পার্‌লেই আমার সবশুদ্ধ ৪্ টাকা হবে, তা হলেই তোমাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে নতুন চোখ্ বসিয়ে এনে দেব।" এই কথা বলিতে বলিতে বালক ভগিনীর নিকটে ছুটিয়া গেল এবং তাহার মুখে চুমো খাইয়া বলিল, "এসো, খাবে এসো।" অন্ধ বোন, চলিতে পারে না,—গোষ্ঠ লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া তাহাকে একখানা ভাঙ্গা আসনে বসাইল এবং খানিকটা গরম দুধ ও খাবার তাহাকে খাইতে দিল। বালিকা দুধ খাইতে খাইতে বলিল "দাদা! এ যে বেশ মিষ্টি দুধ; তুমিও খাবে?" গোষ্ঠ বলিল "দূর পাগ্লী! পুরুষ ছেলেয় আবার দুধ কি খাবে, পুরুষ ছেলেরা জল খেয়েই বড় হয়।" ইহার পর গোষ্ঠও নিজে কিছু খাইল, পরে দুভাইবোনে পাশাপাশি শুইয়া নিদ্রা গেল।

ইহার পর আর ৭ দিন চলিয়া গেলে আট দিনের দিন প্রাতঃকালে গোষ্ঠবিহারী লক্ষ্মীমণির হাত ধরিয়া সেই পচাগলি হইতে বড় রাস্তায় বাহির হইল। চোখের ডাক্তার ভাল কে? তিনি কোথায় থাকেন? কত টাকা দিতে হয়? এসব খবর বালক আগেই জানিয়া রাখিয়াছিল। আজ বড় রাস্তায় বাহির হইয়াই বালক এক হাতে [illegible] কষ্টের ধন [illegible]রিটী টাকা মুটো করিয়া এবং আর এক হাতে [illegible]নেক ভালবাসার ধন আপনার অন্ধ ভগিনীর হাত ধরিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে গেল।

বড় ডাক্তারের বড় কারখানা; সদর দরজার কাছে একটা ঘরে একখানা দড়ির খাটিয়ায় বসিয়া [illegible] মোটা একটা দর্‌ওয়ান 'কাহেকো [illegible] কি যেন পড়িতেছিল। বালক-বালিকাকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়াই আমাদের দর্‌ওয়ানজী আরও চেঁচাইয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন। গোষ্ঠ একটু নিকটে গিয়া ডাক্তার বাবু আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিল। দ্বারবান বলিল—"কোন হ্যায় রে!" গোষ্ঠ আবার বলিল "ডাক্তার বাবু বাড়ীতে আছেন?" তখন দ্বারবান মহাশয় দাড়ী চুমরাইয়া, চেকুর তুলিয়া, বলিলেন—"তুহার লোকের জন্যে ডাংতার কাঁহা মিলবে রে? টাকা চাই। ভাগ্, ভাগ্।" বেচারা লক্ষ্মীমণি বিপদ বুঝিয়া দাদার হাত শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিল। গোষ্ঠ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিল "ওগো তোমার পায়ে পড়ি; এই দেখ, বেচারী লক্ষ্মী দুটী চোখে দেখ্‌তে পায় না।" লক্ষ্মীর মুখ দেখিয়া দ্বারবানের একটু দয়া হইল, সে তখন বয়ের পাতা মুড়িয়া "রহো, হামি দেখে" বলিয়া ডাক্তার বাবুকে খবর দিতে গেল।

গোষ্ঠ এবং তাহার ভগিনীকে অনেকক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না। খানিকক্ষণ পরেই দ্বারবান আসিয়া তাহাদিগকে একটা ঘরে লইয়া গেল, একটু বসিয়া থাকিতে থাকিতেই ডাক্তার বাবু আসিলেন। বালক ভগিনীর সমস্ত কথা বলিয়া বলিল "বাবু! আপনি একে দুটো নতুন চোখ্ বসিয়ে দিন্।" ডাক্তার বাবু গোষ্ঠের কেউ নাই শুনিয়া এবং কেমন করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং খুব যত্ন করিয়া লক্ষ্মীর চোখ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে তাঁহার মুখে হাসি দেখা গেল—বলিলেন "কোন ভয় নাই! একে সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়া থাকিতে হবে। ব্যারাম কিছু শক্ত নয়, বোধ হয় এক মাসেই ভাল হবে।" গোষ্ঠ বলিল—"আমি সেখানে যেতে পাব?" ডাক্তার বাবু বলিতেছিলেন—"তাও কি হয়?" কিন্তু লক্ষ্মী যে ভাবে ভাইকে ধরিয়াছিল, তাহা দেখিয়া বলিলেন—"দেখ্‌ব, যেতে

পার কিনা।" তখন গোষ্ঠ টাকাগুলি খুলিয়া ডাক্তার বাবুকে দিতে গেল, কিন্তু তিনি নিলেন না, বলিলেন "রেখে দাও; লক্ষ্মীকে ভাল ভাল খাবার, খেলনা, কি আর কিছু কিনে দিও। ভাল ছবিও দিতে পার, কিছুদিন পরে দরকার হবে।"

এক মাস পরে একদিন গোষ্ঠ লক্ষ্মীমণির হাত ধরিয়া ডাক্তারখানা হইতে বাহির হইল। এ লক্ষ্মী যেন সে লক্ষ্মী নয়, চমৎকার চক্ষু ফুটিয়াছে, চারিদিকে বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া, গাছপালা দেখিয়া বালিকা আনন্দে নাচিতে নাচিতে চলিল। বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া বিকাল বেলা আকাশের সুন্দর বর্ণ দেখিয়া বালিকা বলিল—"দাদা! দেখ, দেখ, কি সুন্দর।"—গোষ্ঠ লক্ষ্মীর চক্ষুতে চুমো খাইয়া বলিল—"আমার কাছে সব চাইতে এই চোখ্ দুটীই ভাল।"—বালক সেই যে সে দিন টাকা রোজগার করিয়া 'একটা কিছু' করিবে ভাবিয়াছিল, এতদিনে তাহার সেই 'একটা কিছু' করা হইল,—তাহার ভগিনীর সুন্দর চক্ষু ফুটিল। বাড়ীতে আসিয়া লক্ষ্মীমণি দেখে দাদা তাহার জন্য নানারূপ খেলনা, ভাল ভাল ছবি, কিছু ভাল খাবার এই সব যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। তখন তাহার আহ্লাদ দেখে কে!

কিন্তু একজন ভদ্রলোক এ পচা বাড়ীতে তাহাদিগকে অধিক দিন থাকিতে দিলেন না। ডাক্তার বাবু বালক বালিকাকে নিজের বাড়ীর কাছে আনাইয়া সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর দয়ায় দুই ভাই ভগিনী সৎপথে থাকিয়া মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

[illegible] বাগান বাবুর পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার
সন [illegible] সালে
প্রতিষ্ঠিত
কলিকাতা

হাইকোর্ট।

যাদি যাহারা দোষী তাহারা শাস্তি না পায়, তাহা হইলে দেশে যে কত পাপ বাড়ে, তাহার কি শেষ আছে? যাহাতে বলবান লোক দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে এবং দোষী লোক নির্দ্দোষী লোককে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে বাধা দিতে না পারে, যদি তাহা দেখিবার লোক না থাকিত, তাহা হইলে কি কোন দেশে মানুষ থাকিতে পারিত? এই জন্যই সকল সভ্য দেশে রাজা আছে, কর্ত্তা আছে, আইন আছে, এবং বিচারক বা জজ আছে। তবে এক দেশে এবং আর এক দেশে তফাৎ এই যে, এক দেশে হয়ত রাজা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই আইন হয়, এবং তাহাই সকলকে মানিয়া চলিতে হয়; আর এক দেশে হয়ত দশে মিলিয়া নিজেদের সুবিধার জন্য একটা সভা করিয়া, সেই সভাতে যাহা স্থির করেন তাহাই আইন হয়; আবার কোথাও বা রাজার অধীনে তাঁহার মন্ত্রীরা বা তাঁহার প্রতিনিধিরা রাজার হুকুম লইয়া [illegible] সুবিধা হইবে মনে করিয়া যাহা [illegible] আইন হয়। আইন যেরূপ [illegible] তাহার উদ্দেশ্য সকলের মঙ্গল করা। [illegible] কখনও দেখা যায়, যে একটা আইনে [illegible] না হইয়া অপকার হইতেছে; তখন [illegible] মন্ত্রীরা বা রাজার লোকেরা [illegible] অন্য আইন করেন, কিন্তু যতদিন [illegible] 'চলতি' থাকে, ততদিন সকল[illegible] করিয়া চলিতে হয়, তাহা না [illegible]

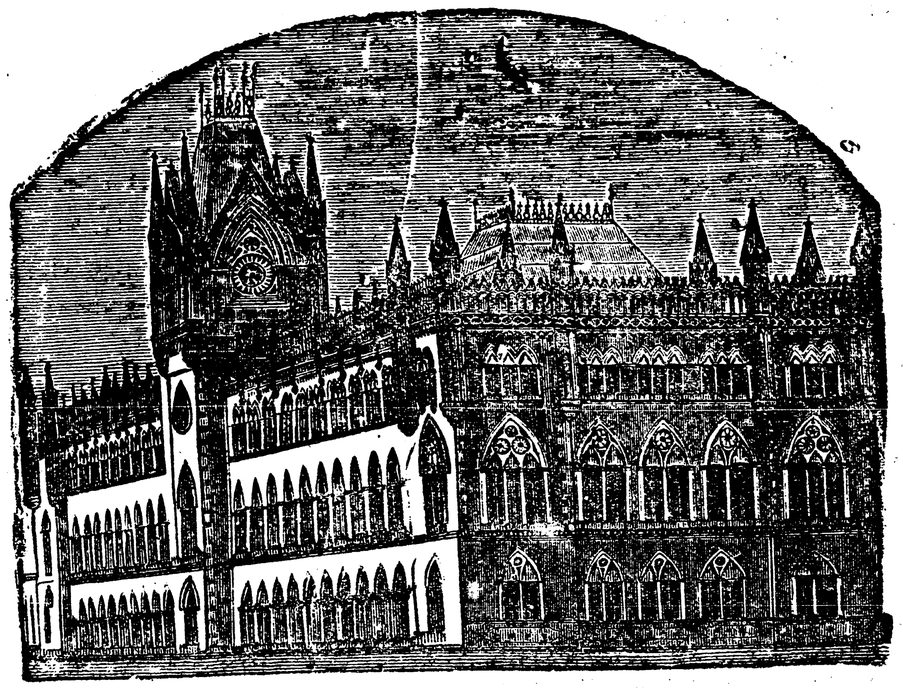

এক সঙ্গে চলিতে পারে ? যে যাহা খুসী করিবে, অথচ সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে, ইহা কখনও হয় না। আইন দুষ্ট লোক, অত্যাচারী লোক প্রভৃতিকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আইন বলিতেছে এই কাজ খারাপ, যে করিবে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে, যাঁহার জিনিশ তাঁহাকেই দিতে হইবে, নির্দ্দোষীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এবং অত্যাচারীকে দমন করিতে হইবে।

কিন্তু শুধু আইন থাকিলে তো হয় না; কে অন্যায় কাজ করিতেছে, কে আইন ভাঙ্গিতেছে, তাহা দেখিবেই বা কে, আর তাহার বিচারই বা কে [illegible] জন্য সকল দেশেই পুলীশ বা শান্তিরক্ষক আছে, মাজিষ্ট্রেট বা শাসনকর্ত্তা আছে, জজ বা বিচারপতি আছে, এবং আদালত [illegible] আছে। তুমি ডাকাতী করিয়াছ বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে, পুলীশ শুনিতে পাইয়াই তোমাকে ধরিল, ধরিয়া তোমার ডাকাতী করার কি কি প্রমাণ আছে, তাহার সহিত তোমাকে মাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাইল। সেখানে মাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া তোমাকে জজের নিকট পাঠাইলেন, এদিকে তুমি বুঝিতেছ তুমি নির্দ্দোষী, কিন্তু জজ ওদিকে ঠিক করিয়া বসিলেন, তুমি ভয়ানক দোষী, কেবল লুঠপাট করিয়াছ, তাহা নহে, অনেক মানুষও মারিয়াছ। জজ বলিলেন "তোমাকে চিরকালের মত দেশ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। সমুদ্রের মধ্যে একটা বুনো দ্বীপে, (আণ্ডামান দ্বীপে) স্ত্রীপুত্র, মা বাপ, ভাই বোন ছাড়িয়া তোমাকে কয়েদী হইয়া থাকিতে হইবে।" তুমি দেখিলে তোমার প্রতি অবিচার হইল, তুমি জজের অপেক্ষা বড় যাঁহাদের আদালত, তাঁহাদের নিকট 'আবার বিচার হউক,' এই প্রার্থনা করিলে। এই সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদালতের নাম **হাইকোর্ট।**

পুনর্ব্বার বিচার করিবার প্রার্থনাকে ইংরাজীতে আপীল (Appeal) বলে। সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সব চেয়ে উচ্চ আদালত হাইকোর্ট। নীচে অন্যান্য আদালতে অবিচার হইয়াছে মনে হইলে লোকে হাইকোর্টে আপীল করে। হাইকোর্টের বিচারপতিরা প্রায়ই বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোক; তাঁহারা সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া মত দেন না। তাঁহাদের বিচারের উপরে আর কাহারও কথা চলে না, তবে ইচ্ছা করিলে বিলাতের প্রিভি কৌন্সিল নামক সভা এবং আমাদের দেশের গবর্ণর জেনেরল অর্থাৎ বড়লাট বাহাদুর হাইকোর্টের বিচারও উল্টাইয়া দিতে পারেন।

আমরা হাইকোর্টের একটা ছবি দিলাম। হাইকোর্ট হইবার পূর্ব্বে মুসলমানী ধরণের দুটী আদালত ছিল,—সেই দুটী মিশিয়াই বর্ত্তমান হাইকোর্ট হইয়াছে।

হাইকোর্টে অনেকদিন হইতে একজন করিয়া বাঙ্গালী জজ আছেন। এই সকল বাঙ্গালী মহাত্মাদিগের মধ্যে মৃত দ্বারকানাথ মিত্র এবং বর্ত্তমান জজ রমেশচন্দ্র মিত্রই বিশেষ বিখ্যাত। দুজনেই সুপণ্ডিত, অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং ঘোর সাহসী। মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথের গল্প শুনিয়াছি যে একবার একটা বিচারে ১২ জন জজ এক সঙ্গে বসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি একলা বাঙ্গালী আর সব সাহেব। মোকদ্দমায় কোন্ পক্ষ দোষী কোন্ পক্ষ নির্দ্দোষী এই কথা লইয়া তাঁহার সহিত এগার জন সাহেব জজের মতের অমিল হয়। দ্বারকানাথ তাহাতে ভয় না পাইয়া এমনি বুদ্ধির সহিত সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন, যে শেষকালে সাহেবেরা তাঁহার মতে মত দিলেন। গল্পটা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না; তবে এটা নিশ্চিত যে তিনি সিংহের ন্যায় সাহসী ছিলেন, কাহারও চোখ রাঙ্গানিতে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না। আর আমাদের বর্ত্তমান জজ মান্যবর রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও খুব সাহসী, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কোন বিষয় লইয়া গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের মত চান; তাহাতে অধিকাংশ সাহেব জজ এক দিকে এবং রমেশ বাবু একলা অন্য দিকে মত দিলেন।

হাইকোর্টের জজ দুই প্রকার; এক যাঁহারা বিলাতে মাজিষ্ট্রেটী (Civil Service) পরীক্ষায় পাশ হইয়া আসিয়া পরে জজ হন; আর বারিষ্টার অর্থাৎ কৌন্সলী বা উকীলদের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া যাঁহাদিগকে জজিয়তি দেওয়া হয়। আমাদের রমেশ বাবু উকীল জজ। মাজিষ্ট্রেটী বা সিবিল জজ এবং বারিষ্টার বা কৌন্সলী জজ বাঙ্গালীদের মধ্যে কেহ নাই। তবে এর পরে কেহ কেহ হইতে পারেন।

সম্প্রতি শুনিতেছি, হাইকোর্টে আরও কয়েক জন নূতন জজ হইবেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বাঙ্গালী থাকিবেন কিনা বলিতে পারি না।

হাইকোর্টের জজ হওয়া খুব গৌরবের কথা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এ গৌরব কি কেবল টাকাতে হয়? কখনই না। দেশের কত হাজার হাজার লোক ন্যায় বিচার পাইবে বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে, নির্দ্দোষীকে মুক্তি দিতে হইবে এবং দোষীকে শাস্তি দিয়া দেশের মধ্য হইতে পাপের কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে হইবে,—আমার দ্বারা এই কার্য্যের সাহায্য হইবে, ইহাতেই আমার জজিয়তির গৌরব, নতুবা আর কিসে?

শেষকালে একটা কথা বলি। আমরা হাইকোর্টের সিংহাসনে জজ হইয়া বসি আর নাই বসি, আমরা সকলেই যে বিচারক এবং সকলেই যে বিচারিত হইতেছি, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে। যেমন আমরা দোষ করিলে বাপ মা শাস্তি দেন বা দাদা বিচার করেন, তেমনি পুঁটী বা ভোঁদা বা কেবলা বা অন্য কোন ছোট ভাই

বোন দোষ করিলে আমরাই বিচার করি। তখন যেন মনে থাকে যে যার যতটুকু দোষ তার তত-টুকু শাস্তি হওয়া উচিত, নির্দ্দোষী যেন শাস্তি না পায় এবং অল্পদোষে যেন বেশী শাস্তি না হয়। মনে রাখিও, একজন বড়লোক বলিয়া গিয়াছেন—

"স্বর্গও যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দাও"

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

নবম অধ্যায়।

বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াই ললিত বাবু রাজকুমার বাবুকে ইটের চকে আসিবার জন্য একখানা পোষ্টকার্ড লিখিলেন। রাজকুমার বাবু পত্র পাইবা মাত্র ইটের চকে রওনা হইলেন, এবং তথায় পৌছিয়া ললিত বাবুর নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক হইলেন। সকল কথা শুনিয়া রাজকুমার বাবুর তাঁহার ছোট বোনের একটী গল্প মনে আসিল। তিনি ললিত বাবুকে বলিতে লাগিলেন—"আজ প্রায় অনেক দিন হইল আমার ছোট বোনের একজন উৎসাহী, সাহসী, ধার্ম্মিক যুবা পুরুষের সহিত বিবাহ হয়। বাবা তার আর আমার বোনের উপর কি কথায় অত্যন্ত রাগিয়া তাঁহাদিগকে সেই দিনই বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আমার ভগ্নী-পতির নাম শ্রীশচন্দ্র রায়। শ্রীশ বাবু সেই দিনই আমার বোনকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন আমার বোনের বয়স ১৭ বৎসর। তাঁদের অল্প দিনই বিয়ে হয়েছিল। বাবাও জীবনে আর নাম করেন নাই—বাবার কি বিষম রাগ ছিল!—আমরাও আর তাঁদের বিশেষ কোন খবর পাই নাই।"

ললিত বাবু। আপনার বোনের নাম কি?

রাজকুমার বাবু। কিরণমালা।

ললিত বাবু। ও! ও! অজার ঠাকুর মা অজাকে যে বইখানা দিয়াছেন সেই বইখানা অজার মা অজাকে আর অজার খোনকে দিয়া গিয়াছেন। অজার মার নামও কিরণমালা রায়। আপনার বোন ত নন?

রাজকুমার বাবু। আচ্ছা বইখানা নিয়ে আসুন ত দেখি, সে খানা দেখলে আমি টের পাব কিরণের বই কিনা?

ললিত বাবু বইখানা আনিয়া রাজকুমার বাবুর হাতে দিলেন। বইখানা দেখিয়াই রাজ-কুমার বাবু বলিয়া উঠিলেন "দেখি! দেখি! এ খানা যে আমার বাবার বই!" বইখানা লইয়া পাতা উল্টাইয়া এক যায়গায় দেখিলেন যে তাঁর বাবার নাম লেখা রয়েছে। নামটী পড়িয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন—"ও! তবে কি সত্য সত্যই অজিৎ আমার ভাগনে! কিরণ! দিদিটী আমার! বাবার জন্য তুমি কি না কষ্ট পেয়েছিলে? ভগ-বান! তোমার যে কি বিচিত্র লীলা! এ মিলনে তোমারই হাত! তুমিই আমাদের মিলাইয়া দিলে!! আজ আমার কি শুভদিন!!" কিছু-ক্ষণ পরে তিনি ললিতবাবুকে বলিলেন "চলুন আমরা সেই বুড়ীর কাছে যাই। আজ যদি আবার ঊর্ম্মিলার কোন খোঁজ পাই। তাকেও খুঁজে বের করতে হবে।"

পরে ললিত বাবু ও রাজকুমার বাবু দুজনে বুড়ীকে দেখিতে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন বাড়ীর দরজা বন্ধ! অনেক ডাকাডাকির পর কে এক জন বলিয়া উঠিল "কে গা! কাকে চাও?"

ললিত বাবু। দরজাটা একবার খুলে দাও ত বাছা?

একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহাকে দেখিয়া ললিত বাবু চিনিতে পারিলেন।

স্ত্রীলোকটী অজার ঠাকুরমার ঘরের পাশে থাকে। ললিত বাবু তাহাকে বলিলেন "হ্যাঁ গা বাছা! অজার ঠাকুরমা আজ কেমন আছেন?"

স্ত্রীলোক।—যদি আপনাদের দেখবার ইচ্ছা ছিল, তাহলে একটু আগে এলে দেখতে পেতেন। এই দু ঘণ্টা হ'ল মরে গেছে। তাকে এখন ঘাটে নিয়ে গেছে।

ললিত বাবু। ওমা, এত শীঘ্র মারা যাবেন; তাত আমি বুঝিতে পারি নাই। আহা! স! বড় মাটি করলাম। রাজকুমার বাবু! কি করা যায় বলুন ত? (তার পর কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন) হ্যাগা বাছা! তুমি কি অনেক দিন হতে এই মেয়ে মানুষটীকে দেখিতেছ?

স্ত্রীলোক। হ্যাঁ! অনেক দিন থেকে দেখছি। আমি এখানে যতদিন এসেছি ততদিনই দেখিতেছি।

ললিত বাবু। তুমি অজার মাকে বোধ হয় দেখিয়াছ?

স্ত্রীলোক। হ্যাঁ! আজ প্রায় দশ বৎসর হইল একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে একটী ছেলে একটী মেয়ে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। এসেই ভয়া-নক রোগে পড়িলেন। কিছু দিন পরে ছেলে মেয়ে দুটীকে ফেলে মরে গেলেন। তার পর অজার ঠাকুর মা মেয়েটীকে নবকুমার বসুর স্ত্রীকে দিল; ছেলেটী তার নিজের কাছেই রহিল। ছেলেটীকে অনেক কষ্ট দিত—খেতে দিত না, মারিত। এত কষ্ট দিত যে দেখলে মানুষ না কেঁদে থাকিতে পারিত না।

ললিত বাবু। আর থাক্, মৃতের নিন্দায় কাজ নাই। তুমি ছেলেটীকে যত্ন করিতে না? আর অজা কি ছেলে বেলা থেকেই খোঁড়া ছিল।

স্ত্রীলোক। না। খোঁড়া ছিল না। দেখতে দিব্বি ছিল। আমি তাকে কি আর যত্ন করব। আমার নিজের কত কাজ ছিল। আমি গরিব মা-নুষ, কত কাজ। যত্ন করবার সময় কোথায় ছিল?

ললিত বাবু। নবকুমার বাবুরা কোথায় থাকেন, বলিতে পার কি?

স্ত্রীলোক। শুনেছিলাম বড় বাজারে থাকেন। ললিত বাবু রাজকুমার বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন "চলুন একবার বড় বাজারে যাই, মেয়েটীকে খুঁজে বের করতে হ'বে।"

তখন ললিত বাবু ও রাজকুমার বাবু বড় বাজারে নবকুমার বাবুদের উদ্দেশে চলিলেন।

সেখানে অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "নবকুমার বসুর বাড়ী কোনটা?" সে লোকটী বলিল "হ্যাঁ! নবকুমার বসু এখানে ছিলেন বটে, কিন্তু এখন আর এখানে নাই। নব-কুমার বসুর মৃত্যু হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী আর একটী মেয়ে কিছুদিন এখানকার একটা বাড়ীতে ছিলেন। তারপর একদিন নবকুমার বাবুর স্ত্রীর ছাত থেকে পড়ে একটা দুর্ঘটনা হওয়াতে, এখানকার হাস-পাতালে তাঁকে লইয়া যায়। তিনি গেলে মেয়েটী কিছুদিন বাড়ীতে একলা ছিল। কিন্তু নবকুমার বাবুর স্ত্রী আর ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁর কি হয়েছে জানিনা। তার পর কিছু দিন পরে বাড়ী-ওয়ালা মেয়েটীকে বাড়ী থেকে তাড়াইয়া দিল। ঘরের জিনিষ পত্র বেচিয়া লইল। তার পর মেয়ে-টীর যে কি দশা হয়েছে তা আমি বলিতে পারি না।"

রাজকুমার বাবু। মহাশয়! মেয়েটীর নাম কি ছিল, বলিতে পারেন?

ভদ্রলোক। ঊর্ম্মিলা না কি ছিল আমার ঠিক মনে নাই।

এই কথা শুনিয়া দুজনেই নিরাশ হইলেন। রাজকুমার বাবু ললিত বাবুকে বলিলেন "সেই হাসপাতালে গিয়া নবকুমার বাবুর স্ত্রীর খোঁজ করিতে হবে। আজ তবে বাড়ী ফিরিয়া যাই।" এই বলিয়া তাঁহারা দুজনে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাজকুমার বাবু সেই দিনই বাড়ী চলিয়া গেলেন।

এব্রাহাম লিঙ্কন্।

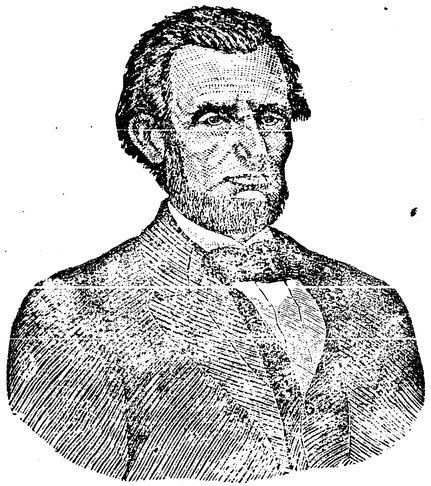

A. Lincoln

আমেরিকা-দেশে এক সময় দাস-প্রথার জ্বালায় কালো মানুষের বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছিল। "দাস-প্রথা" বা দাস-ব্যবসায়টা কি জিনিষ, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ না? আগে তাহার কথা একটু বলি শুন। এই যে ইংরাজদের আজ কাল দেখিতে পাও, ইহাঁরা যে কেবল আজ কালই কালো মানুষের উপর 'জোর জুলুম' আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নহে। অনেক কাল আগে ইহাঁদের মনে মনে একটা স্থির বিশ্বাসই ছিল যে সাদা মানুষের চাকর—গোলাম—হইয়া থাকিবার জন্যই পরমেশ্বর কালো মানুষদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়া, ইহাঁরা আফ্রিকা দেশে গিয়া নানা ছলে, ছলে না পারিলে গায়ের বলে, কালো কাফ্রীদিগকে ধরিয়া আনিতেন, তাহাতে ছোট কচি ছেলে, অথবা অতি অতি বুড়ো, কেহই বাদ যাইত না। দেশে আনিয়া সাদা মহাশয়েরা কালোগুলোকে নিলামে বিক্রী করিতেন। যেমন গরু ছাগল বিক্রী করিতে লইয়া গেলে কিনিবার সময়, যাহারা খরিদ্দার, তাহারা বেশ করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট মোটা সোটা দেখিয়া বাছিয়া লয়, এই হতভাগা কাফ্রীদের বিক্রী করিবার সময় ঠিক সেইরূপ কাণ্ড হইত। কোন স্থানে বুড়ো বাপ তাহার যুবা ছেলেকে সঙ্গে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; খরিদ্দার বুড়োর আশার ধন ছেলে-টীকে কিনিয়া লইয়া গেল, বুড়োর যে কি দশা হইবে, তাহা চাহিয়াও দেখিল না। তোমার মা বুড়ো হইয়াছেন, তাঁহার কাছ থেকে তোমাকে ছিনাইয়া যদি কেহ লইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার এবং তোমার মার কি কষ্ট হয় বল দেখি? তখন কি ইচ্ছা করে না, যে যদি সুবিধা হয় তাহা হইলে সেই পাষণ্ড ডাকাতের মাথাটা কেটে দুখণ্ড করে ফেল? কিন্তু আমেরিকাতে প্রতিদিন নিলাম ঘরে এইরূপ মানুষ বিক্রী হইত, যুবা পুত্রকে বুড়ো বাপের কাছ থেকে, ছোট ছেলেকে প্রিয় মায়ের কোল থেকে, ভগি-নীকে ভাইয়ের পাশ থেকে, প্রতিদিনই নিষ্ঠুর সাদা লোকেরা কাড়িয়া লইয়া যাইত, সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া আপনাদের ক্ষেতে গরু ঘোড়ার মত কাজ করাইয়া লইত, এবং মনের মত কাজ করা না হইলে চাবুক মারিয়া রক্তপাত করিয়া দিত, অথচ কালো লোকদিগের সেই দুঃখের সময়ে তাহাদের হইয়া দুটো কথা বলিবে, এমন একটী লোক সমস্ত আমেরিকা দেশে ছিল না।

কিন্তু পরমেশ্বর চিরকাল কাহারও কষ্ট রাখেন না, কাফ্রীদেরও কষ্ট চিরকাল রহিল না! আজ আমেরিকা দেশে কাফ্রীরা কাহারও অধীন নয়, আজ তাহারা সাদা লোকের মত নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে। কিন্তু কাফ্রীদের এই স্বাধীনতা দুই এক দিনে হয় নাই।

পরমেশ্বরের দয়ায় দুই একজন করিয়া সাদা-

লোক কাফ্রীদের পক্ষ হইতে লাগিল, ক্রমে এই দলের সঙ্গে কাফ্রীদলের শত্রুদের ভয়ানক যুদ্ধ হইল, দুই দিকেই অনেক লোক মারা পড়িল; তখন সকলে পরামর্শ করিয়া কিছু দিন পরে দাসব্যবসায় উঠাইয়া দিলেন, হতভাগ্য কাফ্রীদের হাড়ে বাতাস লাগিল। আজ কাফ্রীরা স্বাধীন, কিন্তু ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও কাফ্রীদের দিকে টানিয়া দুটো কথা বলিলে অনেক শত্রু যুটিত। আজ প্রায় কুড়ি বৎসর হইল কাফ্রীদের স্বপক্ষে কথা বলিতে গিয়া এবং কাফ্রীদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া আমেরিকার একজন সর্ব্ব প্রধান লোকের প্রাণ গিয়াছে:—এই মহাত্মার নাম **এব্রাহাম লিঙ্কন্।**

যাঁহারা প্রথম হইতে 'সখা' পড়িয়া আসিতে-ছেন তাঁহারা জানেন (সখা প্রথম ভাগ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা) মহাত্মা গার্ফীল্ড্ কেমন সামান্য অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টা ও যত্নে আমেরিকার প্রেসি-ডেণ্ট্ অর্থাৎ মহাসভার কর্ত্তা হন। মহাত্মা লিঙ্কন্ গার্ফীল্ডের অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমেরি-কার প্রেসিডেণ্ট হন। কি আশ্চর্য্য! দুজনের জীবন চরিত ঠিক একরূপ। লিঙ্কন্ ও অত্যন্ত গরিবের ছেলে ছিলেন, এবং গার্ফীল্ডের ন্যায় মায়ের গুণে সৎ চরিত্র এবং সু বুদ্ধি, এই দুই গুণ পাইয়াছিলেন। গার্ফীল্ডের ন্যায় লিঙ্কন্ও তেলের অভাবে উনানের আগুনে পড়া করিতেন, এবং শীতের দিনে শুধু পায়ে দুক্রোশ, আড়াই ক্রোশ পথ হাটিয়া স্কুলে পড়িতে যাইতেন। দুয়েরই পড়াতে এমন যত্ন ছিল, যে পড়িতে বসিলে আর জ্ঞান থাকিত না, একেবারে যেন নিজের পড়াতে ডুবিয়া থাকিতেন। একবার লিঙ্কনের বাপ তাঁহাকে কি কাজের জন্য ডাকিতেছিলেন; তখন লিঙ্কন্ একখানা গল্পের বই পড়ায় নিযুক্ত, বাপের কথা শুনিয়াও শুনিতে পাইলেন না; "যাই, বাবা!" বলিয়া আবার পড়িতে বসিলেন। লিঙ্কনের বাপ লেখা পড়া জানিতেন না, পড়ার যে কি সুখ, তাহা তিনি বুঝিবেন কেন? ছেলের আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে খুব তির-স্কার করিলেন।

বই কিনিবার সঙ্গতি নাই, অথচ পড়া চাই; লিঙ্কন্ এক বড় লোকের বাড়ী চাকর হইয়া তাঁহার পুস্তক এবং সংবাদ পত্র পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে সাহিত্য, ইতিহাস, আইন প্রভৃতি যে কত পড়িয়া ফেলিলেন, তাহার সীমা কি? কখন সামান্য চাকরের কাজ করিয়া, কখন ছুতরের কাজ করিয়া, কখন কেরাণীগিরির ন্যায় কাজ করিয়া, কখনও জাহাজের মাঝির কাজ করিয়া, কখনও বা সৈনিকের কাজ করিয়া লিঙ্কনের অনেক দিন কাটিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! কোন কাজেই আপত্তি নাই, কিছুতেই "না" বলা নাই, আর যাহা ধরেন, তাহাই ভালরূপ না করিয়া ছাড়েন না। আবার তাহার সঙ্গে পড়ার কাজ—সে কাজের বিশ্রাম নাই। এই রূপ চেষ্টা ও যত্ন যার, সে যে বড় লোক হবে, তাহাতে আর অবাক্ হইবার বিষয় কি? লিঙ্কন্ প্রথমতঃ তাঁদের দেশের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান এবং তাহার পর সমস্ত আমেরিকার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট হইলেন।

মহাত্মা গার্ফীল্ডের ন্যায় মহাত্মা লিঙ্কন্ও বড়ই দয়ালু ছিলেন। পশু পাখীদের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে, লিঙ্কন্ তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। যদিও বাল্যকালে গরিব ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পেটের দায়ে বুনো পাখী শিকার করিতে হইয়াছে, তথাপি নিষ্ঠুর ছেলেদের মত তিনি কখনই পশুপাখীদের যন্ত্রণা দিয়া মারেন নাই। এই দয়া বড় হইয়া, কেবল পশুপাখী নয়, সমস্ত দুর্ব্বল প্রাণীকেই আশ্রয় দিল। যে দুর্ব্বল, যে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারেনা, যে নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারেনা, আহা!

এমন অসহায় যে তাহাকে দয়া কর, ইহাতেইতো বাহাদুরী; মহাত্মা লিঙ্কন্ এইরূপ মনে ভাবিতেন বলিয়াই তিনি কাফ্রীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সৎকাজ করিতে গিয়া তাঁহার প্রাণ গেল। কাফ্রীদের পক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনেক শত্রু যুটিল এবং এক শত্রুর বন্দুকের গুলিতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সের সময় তাঁহার প্রাণ গেল।

প্রাণ যাক, তাতে দুঃখ কি, কিন্তু একজন সৎলোক এত শীঘ্র চলিয়া গেলেন, ইহাই কষ্টের কারণ। আর যদি মরিতে হয়, তবে এইরূপ সৎকাজ করিতে করিতে মরাইতো ভাল। কত লোক মদ খাইতে খাইতে মরিয়া যায়, কত লোক চুরি করিতে গিয়া মারা পড়ে, কতলোক পরের সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া দাঙ্গা করিয়া মারা যায়, কত লোক টাকা রোজগার ও "যক্ষের ধন" পুঁজি করিতে করিতে অতিরিক্ত পরিশ্রমে মুখে রক্ত উঠিয়া পৃথিবী ছাড়ে—সেইসব মরার অপেক্ষা সৎকাজ করিতে গিয়া প্রাণ দেওয়া কত সুখের, কত সৌভাগ্যের কথা। আজ যদি মৃত্যু আসে, তাহা হইলে সে যেন আসিয়া এই দেখিতে পায় যে মহাত্মা লিঙ্কনের মত আমরা নিজে ভাল হইয়াছি বা নিজেদের উন্নতি করিতেছি এবং আমাদের চেষ্টায় আর দশ জন সুখী হইতেছে এবং ভাল হইতেছে।

বালকের মন।

(ঠাকুরমার মৃত্যু দেখিয়া মাতার প্রতি বালকের উক্তি।)

(প্রাপ্ত।)

১

"কেনমা! ঠাকুমা আজি উঠানে শুইয়া?
কেনবা রেখেছে ওঁরে কাপড়ে ঢাকিয়া?
হাত পা নড়েনা কেন, শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ড যেন,
পড়িয়া আছেন হায়! কেহ নাহি ধরে—
কেন সবে ধরাধরি আনেনাকো ঘরে?

২

"ওকিমা! চোখের পাতা পড়ে না যে আর—
বহেনা নিশ্বাস কেন বল দেখি তাঁর?
যাওনা মা ত্বরা করি, লয়ে এস হাত ধরি
জ্বরে বুঝি অচেতন হয়েছেন হায়—
যাও না মা! যাও যাও! ধরি তব পায়।

৩

"একি মা! কাঁদিছ তুমি কাহার লাগিয়া!—
চোখের জলেতে বুক যেতেছে ভাসিয়া।
লওমা আমারে কোলে, দুঃখ তব যাবে চলে;
ঠাকু'মা উঠিবে নিজে জ্বর গেলে পরে
হবেনা তোমার তাঁকে ধরে নিতে ঘরে।"

৪

চুম্বিলা জননী তায় তুলিয়া আদরে
দুখের মাঝারে সুখ উদিল অন্তরে—
বলিলেন "বাপধন! নন উনি অচেতন;
পরাণ উড়িয়া গেছে, আধার করিয়া
কে আর নাচাবে তোরে আদরে ধরিয়া?"

৫

"কেনমা অমন কথা বলিছ আমারে?
এই যে দাঁড়ায়ে আছি ঠাকুমার ধারে,—
আছে কি প্রাণের পাখা? তাহলে যেত যে দেখা;
ধরিতাম জোরে তারে দুই হাত দিয়া,
দিতাম বক্ষেতে তাঁর আবার ভরিয়া।"
হায়রে! অবোধ শিশু! ঠাকু'মা তোমার—
গেছে চলি; মিছে সাধ। আসিবে না আর।

সম্পাদকের পত্র।

মাদের সখা-সম্পাদক কিছুকালের জন্য বিদেশে গিয়াছেন; তিনি সেখান হইতে তোমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিলাম।

(প্রথম পত্র।)

আমার প্রিয় বালকবালিকাগণ!

আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, এখন যেখানে আছি সেখানে ও তাহার চারিদিকে যত সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখিতে পাইতেছি তাহার কথা তোমাদিগকে বলি। পরমেশ্বর কত কত আশ্চর্য্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা যাহারা দেশ বিদেশে বেড়ায় তাহা যত ভাল বুঝিতে পারে, এমন আর কে পারে? এই জন্য যাঁরা পাহাড় পর্ব্বত, নদী সাগর, সরোবর, হ্রদ, অগ্নির গিরি এবং বরফের গিরি, লবণের খণি এবং কয়লার খণি,প্রভৃতি দেখিয়া বেড়ান, তাহাদিগকে আমার বড়ই 'হিংসা' হয়। অনেক দিন হইতে মনে মনে ইচ্ছা ছিল দেশে দেশে ঘুরিব, কিন্তু এতদিন সে ইচ্ছা কাজে আসে নাই, এখন একটু একটু করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়া এইখানে আসিয়াছি, কিন্তু আর যে বেশী দূর যাইতে পারিব, তাহা বোধ হয় না। ইহাই আমার বড় দুঃখের কারণ। তোমরা বোধ হয় জান যে, যে ব্যক্তি রসগোল্লার স্বাদ একবার পাইয়াছে, সে সর্ব্বদাই তাহা খাইতে চায়, আর জন্মেও ভুলে না; আমারও তাই হইয়াছে। এইখানে আসিয়া চারিদিকের সুন্দর শোভা ও চমৎকার শ্রী দেখিয়া আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি, এখন ক্রমাগত এইরূপ দেশে ছুটিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে কি হয়, কাজে আটকাইতেছে। তাই আমার কষ্ট। তোমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে, সেই সময় তোমার চারিদিকে ভাল ভাল রসগোল্লা সাজাইয়া যদি তোমার হাত পা কেহ বাঁধিয়া রাখে, তাহা হইলে তোমার যেমন কষ্ট, আমারও তাহাই হইয়াছে। আমি চারিদিকের সুন্দর শোভার বাহার বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ ছুটিয়া গিয়া সেই শোভার নিকট বসিতে পারিতেছি না, এই আমার কষ্টের কারণ।

দুর্গাপূজার ছুটির সময় আমি কলিকাতা হইতে বাহির হই। এই আমার প্রথম পশ্চিম-দিকে যাত্রা। তোমাদের মধ্যে যারা পশ্চিমে থাকে, তারা হয়ত মনে মনে হাসিবে, কিন্তু আমি পশ্চিমে বর্দ্ধমানের এদিকে আর আসি নাই, কাজেই যতটুকু আসিয়াছি, তাহাতেই মনে হইতেছে ভয়ানক পশ্চিমে আসিয়া পড়িয়াছি। এই স্থানটীর জলবায়ু খুব ভাল, চারিদিকেই ছোট বড় পাহাড়, দেখিতে বড়ই সুন্দর। আমি যে বাড়ীতে থাকি তাহার বারাণ্ডা এবং উঠান হইতে গাঢ় ঘনমেঘের ন্যায় পরেশ নাথ পাহাড় দেখা যায়। এইখানে আসিয়া প্রথমেই দুটী বিষয় আমার চক্ষে লাগিল; প্রথমতঃ থাকিবার স্থান, দ্বিতীয়তঃ খাদ্য দ্রব্য। এখানে প্রায় সমস্ত বাড়ীতেই খোলার চাল, কোটাবাড়ী পাওয়া শক্ত—এপর্য্যন্ত মোটে তিনটী কোটাবাড়ী দেখিয়াছি,—একটা জমীদারের বাড়ী আর দুটো দোকান। খোলার বাড়ী গুলিতে জানালা প্রায় নাই, প্রথমে মনে হইল বুঝি বড় শীত বলিয়া জানালা রাখেনা,কিন্তু শেষে শুনিলাম,তাহা নহে। "সিন্ধুক্কা মাফিক্ ঘর" অর্থাৎ সিন্দুকের মত চারিদিকে আটা সাটা ঘরই এখানকার লোকের মনের মত। জানালা রাখিতে বলিলে, তাহারা চটিয়া যায়, বলে—"বাতাসই যদি খাবে, তবে মাঠে যাও না কেন?" এইতো ঘরের দশা।

তার পর খাদ্য দ্রব্যের কথা কিছু বলি। এদেশে ভয়ানক কাঁকর। ভাত, ডাল, তরকারি, সমস্ত জিনিষেই কে জানে কেমন করিয়া কাঁকর মিশিয়া থাকে;—কেবল দুধটা খুব ভাল ও খুব শস্তা। তরকারির মধ্যে কেবল ঝিঙ্গে ও লাউ, আর কিছু পাওয়া শক্ত। একটী বন্ধু আমার চাকরকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের এখানে পটল পাওয়া যায় না?" সে উত্তর করিল "পরোল? সেই বেগুনের মত? মিলে"!! বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "চিচিঙ্গে পাওয়া যায়?" চাকর খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল "বাবু! ও আংরেজী বাত হাম নেহি সমঝ্তা হ্যায়" অর্থাৎ ও "ইংরেজী কথা আমি বুঝি না" !!

এখানকার যিনি জমীদার তাঁহাকে টিকাইত বলে। তাঁহার বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। এখানকার কুমারেরা প্রতিমা প্রস্তুত করিতে পারে না, টিকাইতের বাড়ীর দুর্গা প্রতিমা আমাদের ওদিককার একজন কুমার আসিয়া তৈয়ার করিয়া দিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের দেশের প্রতিমায় ও এখানকার প্রতিমায় কোন তফাৎ নাই। তবে পূজার রকমে একটু তফাৎ দেখিলাম। আমাদের যেমন তিন দিন পূজা হয়, এখানে সেরূপ না হইয়া নবমীর দিন পূজা হইল। সেই দিন মস্ত মেলা বসিয়াছিল, এবং দুই তিন দল সাঁওতাল মেয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচিয়াছিল। আমি সাঁওতালদের নাচ দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম সাঁওতাল পুরুষেরা কেহ বাঁশি বাজাইতেছে, কেহ 'মাদোল' নামক মৃদঙ্গের মত একরূপ যন্ত্র বাজাইতেছে, আর দলে দলে মেয়েরা হাত ধরাধরি করিয়া গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতে করিতে মাদোলের তালে তালে নাচিতেছে। আমাদের দেশের কোমোর-দোলান বিশ্রী নাচের চেয়ে সাঁওতালদের নাচ অনেক ভাল। এই সাঁওতালদের সম্বন্ধে আর কিছু কথা বলিবার আছে, তাহা পরে বলিতেছি।

মেলাতে সাঁওতাল নাচ দেখিয়া আমরা কিছু উত্তরে পদ্ম-ঝিল দেখিতে গেলাম। সেই ঝিলটীতে রাশি রাশি পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে। যাইবার সময় পথে এক যায়গায় ভয়ানক ভিড় দেখিয়া সেখানে দাঁড়াইলাম। কিন্তু গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বলিতে কান্না পায়। দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড মাঠের এক পাশে একটা সাদা ছাগল বাঁধা রহিয়াছে, আর এক পাশ হইতে বাবুরা 'বাজি' রাখিয়া বন্দুক চালাইতেছেন, কে ছাগলটাকে গুলি করিয়া মারিতে পারে। শুনিলাম যাহার গুলিতে ছাগল মরিবে, টিকাইত তাহাকে পুরস্কার দিবেন। হায়! হায়! মূর্খদের কি দুর্ব্বুদ্ধি! আর নাইবা হবে কেন! যাদের "দারু" অর্থাৎ মদ না হইলে দিন চলে না, যাহাদিগকে মদ ছাড়িতে বলিলে, উলটে বলিয়া ফেলে "আপ কলম্ ছোড়িয়ে, তব হামলোগ্ দারু ছোড়েঙ্গে" অর্থাৎ "আপনি লেখাপড়া ছাড়ুন, তবে আমরা মদ ছাড়িব," যাহারা জুয়া খেলিয়া সমস্ত টাকাকড়ি নষ্ট করিতে বসিয়াছে তবুও সে পাপখেলা ছাড়িবে না, যাদের স্ত্রীপুরুষের দশহাজারের মধ্যে দশজন ধার্ম্মিক লোক পাওয়া যায় না, তাদের আর কত হবে! যাহাহউক, আমরা আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, পদ্মঝিলের সুন্দর শোভা দেখিয়া এই ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিলাম যে, এখানকার সৃষ্টির মধ্যে সবই সুন্দর, কেবল মানুষই খারাপ।

সাঁওতালদের কথা বলিতেছিলাম, সাঁওতালেরা এর চাইতে অনেক ভাল। তাহারা অসভ্য বটে, বনে জঙ্গলে থাকে বটে, কিন্তু তাহারা কাহাকেও ঠকাইতে জানে না, চুরি বা মিথ্যা কথার কোন ধার ধারে না, এবং অকারণে

কাহাকেও ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করে না। আজ কাল গাঁয়ের কাছে যারা থাকে, তাহারা দেখিয়া দেখিয়া দু পাঁচ জন ঠকামি শিখিয়াছে বটে, কিন্তু যেখানে ইহারা আপন মনে নিজের দলে সভ্য লোকদের সীমার বাহিরে আপনাদের 'মাঝি' অর্থাৎ দলের কর্ত্তার অধীনে বাস করে, সেখানে ইহারা বড়ই ভাল লোক। আমি এক দিন এই স্থানের নিকটে এক যায়গায় পথ চলিতে চলিতে তৃষ্ণা হওয়ায়, কাছে একজন সাঁওতাল ক্ষেত চষিতেছে দেখিয়া তাহার নিকট জল চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সে সাঁওতাল আমাদের লোকের নিকটে থাকিয়া কিছু সভ্য হইয়াছে, কাজেই ক্ষেতের কাজ ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। আমি বলিলাম "বাপু! আমার তৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে, একটু 'পানি' দিতে পার।" সে লোকটা কেউ মেউ করিয়া কি বলিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কেবল গুটী দুই কথা বুঝিলাম—"কুঁইয়া? কুঁইয়া? হুইরে খাব্রিয়া" অর্থাৎ "পাতকুয়া ওই খাব্রা অর্থাৎ খোলার বাড়ীর কাছে আছে"। সভ্য সাঁওতাল জল দিল না, কিন্তু অসভ্য সাঁওতালের কথা বলি শুন। আমি পরেশনাথ পাহাড়ে যাইতেছিলাম, পথে তৃষ্ণা হওয়াতে একটা জঙ্গুলে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকিয়া গেলাম। ছোট রাস্তা, দুপাশে বড় বড় কালকাশুন্দের গাছ। তাহার মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক সাঁওতালকে পাইলাম। সে একটী ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গরু চরাইতে যাইতেছিল। আমি জল চাহিবা মাত্র ছেলেটীকে গরুর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া বড় সাঁওতাল নিজে বাড়ীতে গেল এবং পরিষ্কার মাজা ঘটিতে করিয়া আমাকে অতি সুমিষ্ট ঠাণ্ডা জল আনিয়া দিল।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন পুরুষ মানুষ দেখিলে লজ্জায় কোন্ কোণে পলাইবে, তাহার ঠিক থাকে না, সাঁওতাল মেয়েদের সেরূপ ভাব নহে। তাহারা নিঃসঙ্কোচে রাস্তা দিয়া ছেলেদের মাই খাওয়াইতে খাওয়াইতে চলিয়া যাইতেছে, কাহারও ভয় নাই। খুব গভীর জঙ্গলে যে সব সাঁওতাল থাকে, তাহাদের পুরুষ মেয়ে কেউ কাপড় পরে না, কেবল কোমরে পাতা সেলাই করিয়া জড়ায়। কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত যত সাঁওতাল দেখিয়াছি, তার মধ্যে পুরুষদের কাপড়ের কৌপিন এবং মেয়েদের প্রায় আমাদের মত বড় কাপড় এবং রূপার গয়না, মল, নথ, ইত্যাদি দেখিয়াছি।

আমার একটী বন্ধুর নিকট শুনিলাম অসভ্য সাওতাল যায়গা জমি লইয়া আমাদের মত মোকদ্দমা মাম্লা করেনা, জমীদার বেশী টাকা খাজানা চাহিলে সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যায়, এবং বনের মধ্যে আপনাদের 'মাঝি'র অধীনে অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইয়া বাস করে। সাঁওতাল যে ঠকাইতে জানেনা, ইহা আমার কোন বন্ধু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কোন জিনিসের জন্য আগের দিন পয়সা দিলে, পরের দিন যে সেই দামের জিনিস ঘরে বসিয়া পাইবে, এবিষয়ে তোমরা সভ্য জনকে, চতুর লোককে বিশ্বাস করিতে পার আর নাই পার, অসভ্য সাঁওতালকে বিশ্বাস করিতে পার। সাঁওতাল যে মিথ্যা কথা কহিতে জানে না, তাহার একটা গল্প শুন। একবার এক সাঁওতাল অন্য একজন লোককে মারিয়া ফেলে। ইংরাজের রাজ্যে কি খুন করিয়া বাঁচিবার যো আছে? সাঁওতালকে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইল। একজন মোক্তার (সভ্য লোক কি না!) প্রাণপণে সাঁওতালকে শিখাইলেন, "বলিস আমি খুন করি নাই।" সাঁওতাল বলিল "আচ্ছা।" সকলি ঠিক। মাজিষ্ট্রেট সাঁওতালী ভাষায় জিজ্ঞাসা করাইলেন "তুমি অমুককে মারিয়াছ কেন?" সাঁওতাল বলিল "আমার এই এই ক্ষতি করিয়াছিল, মারিব নাতো কি?"

এবারকার এই পত্র বড় মস্ত হইয়া পড়িয়াছে আজ এইখানেই শেষ করি। আগামীবারে, কয়লার খণি, শ্লেটপাথরের নদী বা জল প্রপাত, এবং পরেশনাথ পাহাড়ের কথা বলিব। দেখিবার বিষয়, জানিবার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু যাহারা এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য দয়ার আশ্চর্য্য কাণ্ড বুঝিতে না পারে তাদের বেড়ানই মিথ্যা, তাদের চোখ কাণ কেবল বোঝার মতন, তাহারা চক্ষু থাকিতেও দেখে না এবং কাণ থাকিতেও শোনে না।

পচম্বা, গিরিধি। } তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সম্পাদক।

গতবারের প্রশ্নের উত্তর।

১।-টিক্‌টিকি (টিক + টিকি)। ২।-বিলাতী দেশালাই। ৩।--বিছা (বিছা + না)। ৪।-অভিধান।

নূতন।

১। রাজার পায়রা আমি অতি সুগঠন
দুই পক্ষে উড়ে ঘূরি ভারত ভুবন।
প্রাণপণে করি সদা পর উপকার
দুঃখ, চিন্তা, ভয় দূর করি সবাকার।
যার কাছে যাই কিন্তু চাকর হইয়া
এক পক্ষ কাটি সেই দেয় তাড়াইয়া।

২। কাপড় দিয়ে ঘর ছায় এমন ধনী কে ?
সে ঘর অঙ্গুলে ঝোলে এমন ঘর সে।

৩। আমি একজন রাজা, কিন্তু আমার একটিও প্রজা নাই। আমার পোষাক সব রাজাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, কিন্তু আমি অর্থহীন। আর দেবতাদের রাজা যা মাথায় পরে, আমার তাই সিংহাসন! বলত আমি কে ?

৪। তিনটী অক্ষরে নাম যথা তথা মোর ধাম
কিন্তু দুই পাশে মোর বাস।
বাটী মোর কাড়ি নিল অমনি খেলিতে গেল
দেখ দেখ তাদের উল্লাস।

৫। যার আছে সে ব্যবহার করে না। কিন্তু যে ব্যবহার করে নিশ্চয় তার নাই। কি ?

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে গড়ে দুইখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

২নং বেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা। } শ্রীঅন্নদাচরণ সেন, সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২ নং বেণিয়াটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

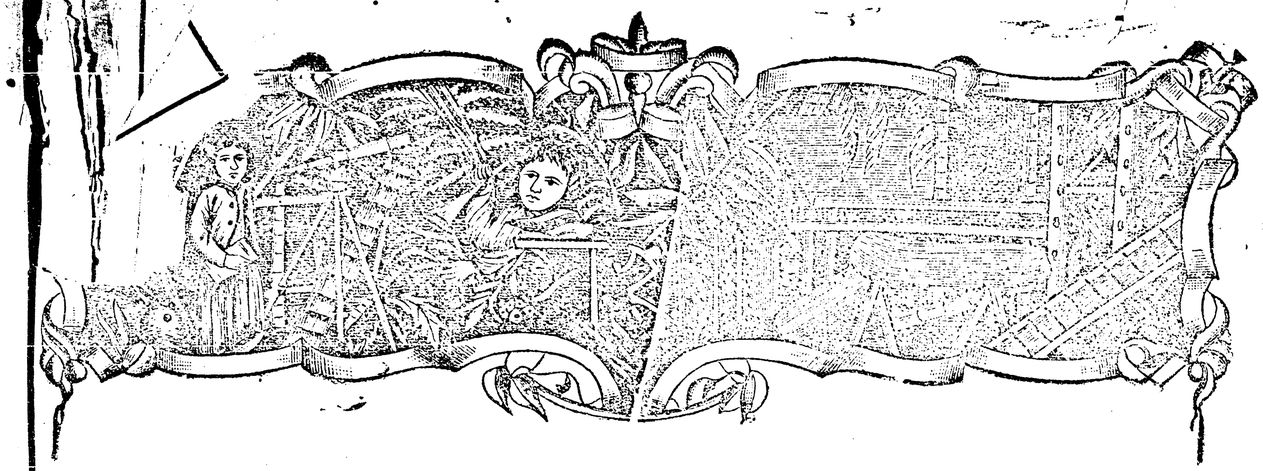

দ্বিতীয় ভাগ। ডিসেম্বার, ১৮৮৪। ১২শ সংখ্যা।

লর্ড রিপন।

এখন যিনি আমাদের গবর্ণর জেনেরেল বা বড় লাট সাহেব তাঁহার নাম লর্ড রিপন এ কথা তোমরা সকলেই জান। কিন্তু পাঁচ সাত দিন পরে তিনি আর আমাদের বড় লাট থাকিবেন না। তাঁহার যত বৎসর কাজ করিবার কথা, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসাতে, তিনি বড় লাটের কর্ম্ম অন্য এক জনকে বুঝাইয়া দিয়া দেশে চলিয়া যাইতেছেন। আমরা এই দুঃখের সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাদিগকে দুই একটী কথা বলিতে চাই।

দুঃখের সময় বলিলাম কেন, তাহার অর্থ আছে। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে যত 'বড় লোক' হয়, সে তত গরিবদের কষ্ট দেয়; অথবা গরিবদের কষ্ট দেখিয়াও সে তত কঠিন হইয়া থাকিতে পারে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, জমীদার প্রজার দুঃখে কষ্ট পায় না, ধনী মহাজন গরিব চাষার বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া আপনার পাওনা টাকা আদায় করিয়া লয়; এবং যাহার ক্ষমতা বেশী সে দুর্ব্বলকে চোখ রাঙ্গাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া কথা কয়। অথচ যদি ঠিক বুঝিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে ব্যক্তি বলবান সে দুর্ব্বলকে সাহায্য করিবে, যাহার ধন আছে সে গরিবকে বিপদে রক্ষা করিবে, এবং যে রাজা সে আপনার প্রজাকে সুখে বাঁচাইয়া রাখিবে,—ইহাই পরমেশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু লোকে এরূপ করে কই ? আমরা কেবলি দেখিতে পাই যে, যে পারিতেছে, যার ক্ষমতা আছে, সেই আপনার আশ্রিত অধীন লোকের উপর উৎপাত করিতেছে।

যেখানে ক্ষমতা, তার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচার। পরের উপকারের জন্য যে ক্ষমতা চালান যাইতে পারে, চারিদিকের ক্ষমতাশালী লোকের 'রকম সকম' দেখিয়া তাহা আর বিশ্বাস করিতে মন উঠে না।

আমাদের বড় লাট বাহাদুরের ভয়ানক ক্ষমতা; তিনি কয়েক বৎসরের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা হইয়া থাকেন, একথা বলিলে কিছু অধিক বলা হয় না। লর্ড রিপনের আগে যিনি বড় লাট ছিলেন, তিনি আমাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে আমরা মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে না পারি, তাহার জন্য আমাদের খবরের কাগজগুলোকে একটা কড়া আইনের দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিয়া চোখে চোখে রাখিতে লাগিলেন; আমাদের বন্দুক, তরবারি, যাহা কিছু অস্ত্র শস্ত্র ছিল সমস্ত কাড়িয়া লইলেন; আরও কত কি কাণ্ড করিলেন, সে সব তোমাদের বলিয়া লাভ নাই। সেই লাট বাহাদুর কেবল মুখেই মিষ্ট কথা বলিতেন, আর কাজের বেলা প্রায়ই ইংরাজদের দিকে টানিয়া কাজ করিতেন। আমরা হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইয়া 'প্রাণ যায়' 'প্রাণ যায়' করিতেছিলাম, এমন সময় লর্ড রিপন আসিলেন। তিনি আসিয়াই এদেশের শ্রী ফিরাইয়া দিলেন। খবরের কাগজ গুলির বাঁধন খুলিয়া দিলেন। ইংরাজেতে আর এদেশীয় লোকে কোন তফাৎ রহিল না। যে গুণী সেই সম্মান পাইবে, মুখ দেখিয়া কাহাকেও চাকরী দেওয়া হইবে না, এ কথা লর্ড রিপন সকলকে বলিলেন এবং কাজেও সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। যে সকল ইংরাজ অত্যাচার করিয়াই দিন কাটায়, লর্ড রিপনের এই সমান সমান ভাবটা তাহাদের চোখে সহিল না; তাহারা তাঁহার ভয়ানক শত্রুতা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই না টলিয়া যাহাতে ইংরাজ এবং দেশীয় লোক সকলেরই উপকার হয়, অথচ ধর্ম্ম এবং ন্যায় বজায় থাকে, সেইরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত সেই ভাবেই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তবে, তিনি চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার মত আর যে কেউ হবে, এ ভরসা আমাদের নাই বলিয়াই এ সময়টা বড় দুঃখের সময় বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি অনেক সৎকাজ করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু সেগুলির এক এক করিয়া নাম না করিয়া, এই বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে, যে তিনি ধর্ম্ম ও ন্যায়ের দ্বারা প্রত্যেক কার্য্যের পরিমাণ করিতেন, অর্থাৎ যে কার্য্য ধর্ম্মের কার্য্য বা যে কার্য্য না করিলে অন্যায় হয়, সে কার্য্য তিনি করিয়া তুলিতেন। যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই লর্ড রিপন থাকিতেন, যেখানে ন্যায় সেইখানেই লর্ড রিপনের কার্য্য দেখা যাইত; তিনি ইংরাজ, বাঙ্গালী বুঝিতেন না, সাদা কালোর ধার ধারিতেন না, কেবল আপনার মনে, যাহা ধর্ম্ম, যাহা ন্যায়, যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিয়া যাইতেন।

আমরা তাঁহার এইরূপ কার্য্যেই সুখী হইতে পারিয়াছি, কারণ আমরা বরাবরই জানি যে আমরাই কষ্ট পাই, আমরাই কালো বলিয়া গুণ থাকিলেও চাকরী পাই না, আমরাই অত্যাচারী ইংরাজদের লাথি ঝাঁটা খাই; কাজেই লর্ড রিপনের যাহা কিছু কার্য্য তাহা আমাদের উপকারের জন্যই হইয়াছে। আজ সেই লর্ড রিপন চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আমাদের মনে মনে কষ্ট হইতেছে, আজ আমরা মনে মনে এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেখানে থাকেন, যেন সেইখানেই সুখে থাকেন এবং গরিব ভারতবাসীদিগকে যেন তাঁহার ধার্ম্মিক মনের একপাশে একটু স্থান দেন।

বড় লোক কিসে হয়?

("সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়?" এই গল্পের শেষ।)

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায় এই নামের প্রস্তাবটী শেষ করিবার সময় আমরা গিরিশের পরে কি হইল তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু গিরিশের জীবনে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল যে আমরা সে সব বলিতেও কষ্ট বোধ করি। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে বেচারা কোন দিনই বড় লোক হইতে পারে নাই। দুঃখ কষ্টের এক শেষ তাহার জীবনে হইয়াছিল। পরিশেষে সে নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করিয়া দিল।

গিরিশের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে মোটামুটি সকল গুলিই সত্য। কথাগুলি যথার্থ বলিয়াই সে গুলি এত গুরুতর। তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, আমরা যদি তাহার মতন কাজ করি, কে জানে, কোন দিন আমাদের সম্বন্ধেও কেহ এইরূপ গল্প সকল বলিয়া লোককে সাবধান করিবে না। পরে কষ্ট পাওয়ার চাইতে আগে সতর্ক হওয়া ভাল।

বড় লোক হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেই কিছু বড় লোক হয় না; তাহা হইলে অত কম লোক বড় লোক হইতে দেখিতাম না। ইচ্ছাতো সকলেরই আছে, তোমার আমার কি নাই? কিন্তু আমি যে আজিও ছোট লোকই রহিয়াছি! শুধু ইচ্ছা থাকিলেই বড় লোক হয় না; ইচ্ছার খুব দরকার, কিন্তু আরো কিছু চাই। গিরিশের ইচ্ছা যথেষ্ট ছিল। তাহার পক্ষে যত টুকু কুলাইয়াছিল সে তো চেষ্টারও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তবুও যে সে বড় লোক হইল না? হইবে কেমন করিয়া? কি রূপে কি করিতে হইবে তাহা যদি না জানিলাম, তবেতো সেই গাধা রামকান্তের মতই রহিলাম। রাম ক্লাশে একদিনও উপরে উঠিতে পারিল না, নীচে নামিবারও জায়গা ছিল না। গুরু মহাশয় তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন "ওরে তোর আর কি কিছু হবে! ভাল ছেলে হ'তে হ'লে তেল পোড়াতে হয়, খাট্‌তে হয়, কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হয়!" রামকান্ত এক দিন বাড়ী আসিয়াই দু সের তেল কিনিয়া আনিল। ঐ তেলে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দিল। তার পর ঘরের চালে দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে প্রাণপণে ঝুলিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে দড়ি ছিঁড়িয়া আগুণের উপর পড়িয়া অর্দ্ধ দগ্ধ, অর্দ্ধ ভগ্ন শরীরে নিষ্কৃতি পাইল। যে দুই সপ্তাহ শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল মাষ্টার মহাশয় ভুল করিয়াছেন। সে সরল লোক, যেদিন স্কুলে গেল সে দিনই মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিল। রামকান্তের যে ভুল গিরিশ বেচারারও সেই ভুল। ভাই, আমরা যে বড় লোক হই না, আমাদেরও অনেকের সেই ভুল। যদি বড় লোক হইতে ইচ্ছা থাকে—'নাই' যদি বল তবে আমি হাসিব—তবে প্রথমে কি কি কাজ করিলে বড় লোক হয়, বেশ করিয়া জান। তারপর নিঃশব্দে শান্তভাবে আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। অনেক কষ্ট পাইতে হইবে; তাহার জন্য যথেষ্ট সহিষ্ণুতা চাই। অনেক সুখ পায়ে ঠেলিতে হইবে; তাহার জন্য সমুচিত ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন। এত করিয়াও কত জন উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে বড় হইতে পারিতেছে না। তুমি ও পারিবে কি না জানি না—আমি ইচ্ছা করিতেছি তোমরা সকলেই পারিবে।—কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে তোমার পক্ষে যতটুকু হওয়া সম্ভব তাহা হইতে গেলেই আমি যাহা যাহা বলিলাম সব কয়টি করিতে হইবে।

বড় লোক, বড় লোক, এতবার বলিলাম। কিন্তু যতজন বড়লোক হইতে চাহিতেছেন সকলেই কি বুঝিতে পারিতেছেন যে বড় লোক হওয়ার অর্থ কি? একটা লোক বলিতেছিল যে আমার ছেলের বিবাহেতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'বল ত দেখি লাক টাকা বলিলে কতগুলি টাকার কথা বলা হয়?' সে বলিল 'কেন, লাক টাকা আর লাক টাকা, দুকুড়ি দশ টাকা।' বড় লোক হওয়া সম্বন্ধে ও অনেকের ঐরূপ মত। অনেকের কেবল নিজের বেলাই ঐ মত। তাহারা বড় ছোট লোক। ভাই, বড় লোক না হও দুঃখ নাই; কিন্তু ছোট লোক হইও না।

কোন ভাল বিষয়ে খুব ভাল হইলে বড় লোক হয়। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় লোক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় লোক, লর্ড রিপন বড় লোক, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বড় লোক, সুরেন্দ্র বাবু বড় লোক ইত্যাদি। ইহাঁদের সকলেই এক বিষয়ের জন্য বড় হন নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখিবে ইহাঁদের যাঁহার মধ্যে যে টুকু ভাল তাহার জন্যই তাঁহাকে বড় লোক বলা হয়। বড় চোরকে ও বড় লোক বলা হয় না, বড় ডাকাতকে ও বড় লোক বলা হয় না।

আর এক কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যার জন্য আমরা তাঁহাকে অত বড় লোক বলি না। মহেন্দ্র বাবু নিজের ঘরে কবাট দিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চা করিলে আমরা তাঁহাকে অত বড় লোক বলিতাম না, অন্ততঃ তাঁহার প্রতি আমাদের অত শ্রদ্ধা হইত না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড রিপন, ইহাঁরা কে কি শাস্ত্র অধিক জানেন, কি কিই বা জানেন না তাহার হিসাব ও হয়তো আমরা কেহ দিতে পারিব না। সুরেন্দ্র বাবুর স্কুল আছে সেখানে তিনি পড়ান এজন্য তাঁহাকে কেহ বড়লোক বলে না। যিনি যে পরিমাণে লোকের উপকার করিতেছেন তিনি সেই পরিমাণে লোকের ভালবাসা পাইতেছেন। বড়লোক এবং ভাল লোক, এ উভয় হইলেই যথার্থ বড়লোক। বড়লোক হওয়া যেরূপই কঠিন হউক না কেন, ভাল লোক চেষ্টা করিলেই হওয়া যায়। এবং তাহাই আগে হওয়া উচিত। কাহারও যদি এক কোটী টাকা থাকে তাঁহাকে শুদ্ধ ঐ টাকা গুলির জন্য বড় লোক বলিব না। তিনি নিজের সদ্গুণের সাহায্যে উহা উপার্জ্জন করিয়া থাকিলে অবশ্য তাঁহাকে বড় লোক বলিব। কিন্তু যখন দেখিব তিনি ঐ টাকা দিয়া দেশের উপকার করিতেছেন, তখনই তাঁহাকে যথার্থ বড় লোক বলিব। কারণ, তখন তিনি বড় লোক এবং ভাল লোক উভয়ই হইয়াছেন। বড় লোক বড়, ভাল লোক ভাল, বড় লোক ভাল হইলে বড় ভাল।

বোকা রামমোহন।

আমরা এক বৎসর পূর্ব্বে (গত বৎসরের ডিসেম্বার মাসের সখায়) হাবা গঙ্গারামের কথা লিখিয়াছি। তখনই বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশে লোকে যারা বোকা তাহাদিগকে 'বোকা রামমোহন' বলিয়া ঠাট্টা করিয়া থাকে। আমরা অনেক কষ্টে এই বোকা রামমোহনের কতকগুলি গল্প জানিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিব।

বোকা রামমোহন বাঁকুড়া জেলার এক ভট্টাচার্য্যের ছেলে। রামমোহনের বড় ভাইয়ের নাম হরিমোহন। তিনি বেশ্ লেখাপড়া জানেন। যেখানে তাঁহাদের বাড়ী সেখান হইতে ১০ ক্রোশ

দূরে এক রাজার বাড়ীতে হরিমোহন সভাপণ্ডিত। তিনি ছমাস নমাসে এক আধ বার বাড়ীতে আসিতেন। ছোট ভাই রামমোহনই বাড়ীর কর্ত্তা। বাড়ীতে একটী বিধবা ভগ্নী আর একটী চাকর। হরিমোহনের স্ত্রী এবং গোপাল নামে একটী ছেলে, তাঁরা কখনও ওখানে কখন হরিমোহনের শ্বশুর বাড়ীতে থাকেন।

একবার গোপালের মামার বাড়ী হইতে খবর আসিল, গোপালের মার বড় ব্যারাম। রামমোহন খবর পাইয়া বলিলেন—"এইখানে আস্তে বলগে যাও।" যে খবর আনিয়াছিল, সে বলিল "বিছানা ছেড়ে চল্তে পারেন না, কেমন ক'রে আস্বেন?" রামমোহন উত্তর করিলেন "তা' বিছানা ছেড়ে আস্তে কে বল্ছে, বিছানা শুদ্ধই আসুন না।"—পাশে বিধবা ভগ্নী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন—"বলিস্ কি, আহাম্মকের মত? আজই খেয়ে দেয়ে দাদার কাছে খবর নিয়ে যা। তিনি যা বলেন, তাই কর্তে হবে।" রামমোহন কিছু থতমত খাইয়া বলিল "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি; কিন্তু তোমাদের, বাপু! যেন কেমন কেমন বুদ্ধি! বিয়ে না, শ্রাদ্ধ না, নেমন্তন্নের বিদায় না, খপ্ করে খবর দিতে গিয়ে হাজির হব, দেখে শুনে দাদা কি বল্বে?" এই বলিয়া রামমোহন যাইবার আয়োজন করিতে পাড়ায় গেলেন।

পাড়ার কেশব ভাণ্ডারী অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছে, এবং অনেক রকম খবর রাখে। আমাদের রামমোহন এই কেশব ভাণ্ডারীর কাছে পরামর্শের জন্য আসিলেন এবং বলিলেন "ভাণ্ডারী দাদা! একবার দাদার কাছে যেতে হবে; কেমন ক'রে, যাওয়া যাবে বলতো।"—ভাণ্ডারী বলিলেন "এই, খাওয়া দাওয়া ক'রে, হেটে গেলে, তুমি যে রকম চল, তাতে রাত দেড় প্রহরের সময় যেতে পার্বে। আর যদি ঘোড়ায় যাও তাহ'লে একপ্রহর বেলা থাক্তে যেতে পার। এখন যেটা তোমার সুবিধা।" রামমোহন বলিলেন—"তবে ঘোড়াতেই যাব।" গাঁয়ের এককোণে ফকীরে হাড়ির বাড়ী; তাহার ভাল একটা ঘোড়া আছে, শুনিয়া রামমোহন তাহার নিকট গেলেন। ফকীর যখন শুনিল, রামমোহন তাহার ঘোড়ার জন্য আসিয়াছেন, তখন সে তাড়াতাড়ি সুন্দর ঘোড়াটী সাজাইয়া রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী পর্য্যন্ত রাখিয়া গেল।

রামমোহনের বিশ্বাস ছিল, সকলেই ঘোড়ায় চড়িতে পারে। রামমোহন মাথায় চাদর বাঁধিয়া, হাতে ছড়ি লইয়া লাফাইয়া ঘোড়ায় উঠিয়া বসিল। ঘোড়াও আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। ফকীরে হাড়ি খানিকদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়া ফিরিয়া আসিল। যতক্ষণ সে সঙ্গে ছিল, ততক্ষণ ঘোড়াটী চলিয়াছিল। কিন্তু আর চলে না। কি রকম লোক পিঠে চাপিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া ঘোড়া পেছনে হাটিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে একটু চলিতে লাগিল। রামমোহন ভাবিলেন "স্রোতের উল্টাদিকে নৌকা পড়িলে, যেমন 'গুণ' টানিয়া নৌকা চালাইতে হয়, ঘোড়ায়ও বুঝি সেই রকম করিতে হয়।" এই ভাবিয়া রামমোহন ঘোড়া হইতে নামিয়া, ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘোড়াটাকে এবং নিজের 'জালা'র মত শরীর, এই দুটোকে চালাইয়া লইয়া চলিলেন। ঘোড়া দেখিল মজা মন্দ নয়; সেও সুবিধা বুঝিয়া, যখনই রামমোহন পিঠে চাপিতে যায়, তখনই দুষ্টামি করিয়া পেছনে হাটিতে থাকে। বেচারা রামমোহন কি করেন, কাজেই 'গুণ টানা'-গোছ করিয়া রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় দাদার বাড়ীতে পৌঁছিলেন। তাহার পরদিন রামমোহন বাড়ী ফিরিলেন; আসিবার সময় ঘোড়াটা বেশ্ চলিয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়া ঘোড়া ফিরাইয়া দিয়াই রাম-

মোহন ভাণ্ডারী দাদার কাছে গেলেন এবং চোখ লাল করিয়া বলিলেন—"তোমাকে বুদ্ধিমান বলে তোমার পরামর্শ নিতে এসেছিলাম; তা বেশ্ পরামর্শই তুমি দিয়েছিলে। ঘোড়ায় গেলে কখনই হেটে যাবার আগে যাওয়া যায় না, আবার মধ্যে থেকে 'গুণ' টেনে প্রাণ যায়।" কেশব ভাণ্ডারী সমস্ত শুনিয়া হাসিয়া বলিল "ঘোড়ার পিঠে মানুষই চড়ে, তাই জান্‌তাম; কিন্তু ঘোড়ার পিঠে গরু চাপিলে ঘোড়া চলিবে কেন?"

গোপালের মার ব্যারাম সারিয়া গেল, কিন্তু তিনি অনেক দিন বাপের বাড়ীতে আছেন, একবার খবর লওয়া প্রয়োজন, এই মনে করিয়া রামমোহনের ভগ্নী একদিন রামমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, অনেক দিন হইল গোপালদের খবর পাই না; তুমি এক কাজ কর, তারা কে কেমন আছে, খবর জেনে এসো। এই দুটী টাকা নেও, পথ থেকে তাদের জন্যে যা'হয় কিছু কিনে নিয়ে যেও।" রামমোহন টাকা দুটী চাদরে বাঁধিয়া ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ীতে চলিলেন। যাবার সময় ভগ্নী বলিয়া দিলেন "দেখ, তুমিতো যে বোকা, ভদ্রলোকদের বাড়ীতে যাচ্ছ, বেশী কথা ব'লে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ ক'রে বকনা; তারা যেটী জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি সেইটীরই উত্তর দিও; অনেক কথা ব'লনা—মাথা হেঁট করে থাকবে; তারা পাঁচটা কথা বলিলে তুমি একটা বলিবে, বুঝিলে?" রামমোহন একে পুরুষ মানুষ, তাতে নিজের খুব বুদ্ধি আছে এই তাঁহার বিশ্বাস,—কাজেই একজন মেয়ে মানুষ মুখ নেড়ে বোকা ব'লে উপদেশ দেয়, ইহা তাঁহার বড়ই কষ্টের কারণ হইল। তিনি ভগিনীর কথায় বলিলেন—"বুঝেছিগো, বুঝেছি। এমনিই বোকা পেয়েছ, সব ঠিক ক'রে আস্‌ব।"

এই বলিয়া রামমোহন বাড়ীর বাহির হইলেন। পথে গিয়া মনে হইল গোপালের জন্য 'যাহয় কিছু' কিনে নিয়ে যেতে দিদি বলিয়া দিয়াছেন। তাই, একটা বাজারের কাছে গিয়া রামমোহন এক দোকানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, তোমাদের এখানে 'যাহয় কিছু' পাওয়া যায়?" দোকানদার একজন নাপিত, ভয়ানক দুষ্ট লোক। সে বলিল, "পাবেন, কিন্তু সে দামী জিনিষ, দোকানে রাখি না, বাড়ীতে আছে। দুটাকা ক'রে সের পড়্‌বে। আপনার কতটুকু চাই।" রামমোহন বলিলেন—"এক সের।" নাপিত বলিল—"আচ্ছা, তবে আপনি এই দোকানে একটু বসুন, আমার বাড়ী কাছে, ওই দেখা যায়; এখনি নিয়ে আস্‌ছি।" এই বলিয়া নাপিত মনে মনে হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে গেল, এবং কতকগুলো চুল এবং নখ একসঙ্গে একটা হাঁড়িতে পূরিয়া তাহার মুখে ভাল ক'রে ন্যাকড়া জড়াইয়া দিল। পরে সেই হাঁড়িটী হাতে করিয়া দোকানে আসিয়া রামমোহনকে দিল। রামমোহন বলিলেন—"ঠিক ওজনে দিয়েছতো?" নাপিত বলিল "ও আর দেখ্‌তে হবে না। বাড়ীতে গিয়ে মেপে নেবেন।" রামমোহন এই কথাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নাপিতকে দুটী টাকা দিয়া চলিতে লাগিলেন।

অবশেষে রামমোহন দাদার শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছিলেন এবং পৌঁছিয়াই হাঁড়িটী বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। গোপালের মা হাঁড়ি খুলিয়াই অবাক্। বুঝিলেন, "ঠাকুরপো তামাসা করিয়াছেন।" কিন্তু এদিকে যে ঠাকুরপোকে নাপিতের পো তামাসা করিয়াছে, তাহাতো আর তিনি জানেন না!! রামমোহন বাহিরে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক ভিতরবাড়ী হইতে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পথে আস্‌তে কোন কষ্ট হয়নি তো? গোপালের বাপ কেমন আছেন?"—রামমোহন ভগিনীর কাছে শুনিয়া আসিয়াছিলেন "পাঁচটা কথা বলিলে তবে একটা কথা বলিতে হয়;" মোটে একটা কথা বলা হইয়াছে, এর মধ্যেই কথা বলিলে এরা বোকা মনে করিবেন, কাজেই রামমোহন চুপ করিয়া মনে মনে, কটা কথা হয়, তাহাই গুণিতে লাগিলেন,—"এই এক।" স্ত্রীলোকটী আবার বলিলেন, "কথা কওনা যে, গোপালের বাপের কোন অসুখ হয়নিতো।" রামমোহন এবারেও চুপ, মনে মনে গুণিলেন "এই দুই।" স্ত্রীলোকটী কিছু ভয় পাইয়া বলিলেন "ওমা! ও কিগো! তবে কি কিছু 'ভালমন্দ' হ'ল নাকি?" রামমোহন মাথা হেঁট করিয়া গুণিলেন "এই তিন;" তখন মেয়েমহলে ভয়ানক কান্নার ধুম পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া পাড়ার অনেক লোক আসিয়া যুঠিল। রামমোহন দেখিলেন পাঁচটার অনেক বেশী কথা চলিতেছে, তখন তিনি মুখ খুলিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এত কান্না কেন?" তিনি বলিলেন "বলেন কি মশাই? গোপালের মা বিধবা হ'ল,—ওর চাইতে কি আর কিছু কষ্ট আছে?" রামমোহন বুঝিলেন গোপালের মার বড় একটা বিপদ ঘটিয়াছে, বড় দুঃখ হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। আসিয়াই দিদিকে দেখিয়া চীৎকারস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে রামমোহন বলিয়া উঠিলেন—"দিদি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ হয়েছে! গোপালের মা বিধবা হয়েছে।" দিদি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "রক্ষা কর! আরে আহম্মক! তাও কি কখনও হয়?" রামমোহন তখন চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—"তোমার বিশ্বাস না হয়, নাই

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"ও অলক্ষুণে কথা আর বলিস্‌নে। দাদা বেঁচে আছেন, গোপালের মা কি করে বিধবা হবে?" রামমোহন কিছু থতমত খাইয়া বলিলেন, "দাদা বেঁচে আছেন, তাতেই কি একজন মেয়ে মানুষ বিধবা হবে না? ভাল দাদাতো বেঁচে আছেন, তাহলে তুমি বিধবা হলে কেন?"—তখন তাহার ভগিনী তাহাকে বিলক্ষণ তাড়া দিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন এবং একখানা পত্র লিখিয়া কেশব ভাণ্ডারীকে দিয়া তখনই গোপালের মামার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

সেই অবধি রামমোহনের নাম 'বোকা রাম মোহন' হইয়া গেল, এবং সেই অবধি লোকে নির্ব্বোধকে গালাগালি দিতে গিয়া 'বোকা রামমোহনের' নাম করিতে লাগিল।

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

দশম অধ্যায়।

রাজকুমার বাবু বাড়ীতে গিয়াই স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিলেন। তিনি ছোট বেলায় অজিতের মার সহিত এক ক্লাশে পড়িয়াছিলেন। ইন্দুরেখা দেবী তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আর বাস্তবিকই—কিরণমালা অত্যন্ত ভাল মেয়ে ছিলেন। এমন প্রফুল্ল, এমন সরল, এমন বুদ্ধিমতী, এমন 'মিশুনে'—তাঁহার এই সব গুণ থাকাতে ক্লাশের সকল মেয়েই তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সেই সমপাঠী—ননদিনীর—পুত্র অজিৎ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। বিবা-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এ সব কাণ্ড তাঁহার নিকট ভেল্কীর মত বোধ হইতে লাগিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তবে কি অজিৎ আমাদের আপনার ধন! চল অজিৎকে বলিগে?" এই বলিয়া—তিনি অজিৎকে ডাকিয়া সব বলিলেন; অজিৎ অবাক্ হইয়া সব শুনিল। অজিৎ এমন অবাক্ তাহার জীবনে কখন হয় নাই। তার কাছে সব ঠিক স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ইন্দুরেখা দেবী তাহাকে কাঁপিতে দেখিয়া কোলে টানিয়া লইয়া আদরে মুখ চুম্বন করিবামাত্র, অজিৎ তাঁহার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল; ইন্দুরেখা দেবীও ধীরে ধীরে আঁচল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "অজিৎ ধন! কেঁদনা। তুমি আমাদের আপনার। এই তোমার আপনার বাড়ী। আমি তোমার মামী মা ঐ তোমার মামা। কাঁদ কেন বাবা। চুপ কর কেঁদ না।" অজিৎ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আজ থেকে তবে তোমায় মামী মা বলিয়া ডাকিব। মামা বাবু! আমার দিদী কি বেঁচে আছে? আমার বোন আছে? আমার সকলেই আছেন! এ সব কি হ'ল? তোমরা যখন আমাকে নিয়ে এসেছিলে তখন কি তোমরা জান্তে যে আমি তোমাদের আপনার ছেলে? আর আমি তখন জানিতাম না যে তোমরা আমার আপনার।"

রাজকুমার বাবু। আশ্চর্য্য মিলন! ইন্দু! এস আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, যে তিনি আমাদের আপনার ধনকে আমাদের হাতে দিলেন!—এই বলিয়া রাজকুমার বাবু ও ইন্দুরেখা দেবী কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করিয়া রহিলেন। অজিৎ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে রাজকুমার বাবু অজিৎকে বলিলেন "অজিৎ! আজ তুমি পূর্ণ নাম পেলে। তোমার নাম 'অজিৎকুমার রায়।' তোমার বাবার নাম শ্রীশচন্দ্র রায়। তোমার মার নাম কিরণমালা রায়। তোমার বাপ মা এখন আর এ জগতে নাই। তাঁরা পরকালে ঈশ্বরের কাছে—সুখে আছেন। তোমার বাবা যখন তোমার মাকে লইয়া চলিয়া যান তখন তোমরা হও নাই। হবার পরও তোমার বাপ মার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই। তোমার বাবাকে আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। দেখিতেও খুব সুন্দর ছিলেন। তোমার মুখ খানিকটা তোমার বাবার মত হয়েছে। তোমার মা এমন ভাল মেয়ে ছিলেন; দেখ্তে বড়ই সুন্দর ছিলেন। তোমার চোখ দুটী তোমার মার মত—আর কিছুই প্রায় হয় নাই। আমি তাকে বড় ভালবাসিতাম। কিরণ আমার চেয়ে পাঁচ বৎসরের ছোট ছিল। কিরণকে শ্রীশ বাবু বাড়ী থেকে নিয়ে গেলে আমি কত কাঁদিয়াছিলাম। কত চিঠি লিখিয়াছিলাম কিন্তু একখানারও উত্তর পাই নাই। বোধ হয় চিঠি পায় নাই; কিরণ আমার নিকট দুই তিন খানা চিঠি লিখিয়াছিল। একখানাতে বাড়ীর জন্য মন কেমন করে বলিয়া লিখিয়াছিল; আর এক খানা ঊর্ম্মিলা হবার পর লিখেছিল, তাতে—তারা অনেক দূর দেশে আছে ভয়ানক কষ্ট হয়, শ্রীশ বাবু চাকরি করেন—তাই লিখিয়াছিল; আর এক খানা তোমার বাবা মারা গেলে। শেষখানা পড়িয়া আমি যে কত কাঁদিয়াছিলাম বলিতে পারি না। আমি তোমাদের আনিবার জন্য বাড়ী গিয়া দেখি, তোমার মা সে বাড়ীতে নাই। তার পর আর কোন খবর পাই নাই। বাবাকেও কিরণ চিঠি লিখিয়াছিল। বাবা তার উত্তর দিয়াছিলেন কি না জানি না। কিন্তু কিরণ বাবার আদুরে মেয়ে ছিল। আমরা কেমন দুই ভাই বোন ছিলাম! আমরা পুরাণ বাড়ী থেকে উঠে আস-

[illegible] পর [illegible] চিঠি পাই নাই। শ্রীশ বাবুকে বাবা ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসিতে [illegible] বড় অভিমান হয়েছিল। যদি [illegible] হয় আবার বাড়ীতে আসিত। সে কত দেশ বেড়াইয়াছে, কত বিপদে পড়িয়াছে তাহা ঠিক নাই। অজিৎ! আয় তোকে বুকে করে নিই, তুই, আমার কিরণের ধন! তুই আমারও প্রাণের ধন! কিরণ! আমার কিরণ! তোমায় ছেলেবেলা কত বকিয়াছি; কত মারিয়াছি। তুমি 'দাদা! দাদা!' করে পাগল হতে, আমার কাছে মার খেয়ে কখন বাবাকে বলে দাও নাই। আমাকে বাবা বক্‌লে তুমি বাবাকে বল্‌তে 'বাবা! তোমার দুটী পায়ে পড়েছি, দাদাকে বকো না, দাদা আর করবে না।' তুমি এমন বোন ছিলে। তোমার সঙ্গে আমার আর এ পৃথিবীতে দেখা হল না। কবে সে দিন হবে, যে দিন তোমার সঙ্গে পরকালে সাক্ষাৎ হবে!"—এই বলিয়া রাজকুমার বাবু অজিৎকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অজিৎ মামা বাবু ও মামী মাকে কাঁদিতে দেখিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল। কি চমৎকার দৃশ্য! কি সুন্দর মিলন!

অজিৎ রাজকুমার বাবুর গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "মামা বাবু! মা কি আমার স্বর্গে আছেন? আমিও কি সেখানে যাব।"

রাজকুমার বাবু। হ্যাঁ। আমরা সকলেই এক দিন সেখানে যাব।

[illegible] বিকালে রাজকুমার বাবু ইন্দুরেখা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখ! বই খানা কি এখনই অজিৎকে দিব।"

ইন্দুরেখা দেবী। হ্যাঁ! দেবে বই কি। এখনই তাকে দেওয়া যাক্!

তাঁহারা অজিৎকে ডাকিয়া বলিলেন "[illegible] নাও। এখানা তোমার দাদা মহাশয়ের বই, তোমার মায়ের বই, [illegible] তোমার মা এখানা তোমাকে আর তোমার দিদীকে দিয়া গিয়াছেন।" অজিৎ [illegible] বই খানা [illegible] চাপিয়া ধরিল। বই খানা খুলিয়া দেখে তাহাতে লেখা রয়েছে "প্রাণের অজিৎ ও ঊর্ম্মিলাকে মায়ের ভালবাসার উপহার। কিরণমালা রায়।" এই লেখাটী পড়িয়া তার মাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইল কিন্তু ইচ্ছা করিলে কি হইবে; মাকে ত আর দেখিবার উপায় নাই।

রাজকুমার বাবু কিছুদিনের মধ্যে ইটের চকে যাইবেন ঠিক করিলেন। অজিৎ তাঁহার যাইবার কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "মেসো মহাশয়! না—না মামা বাবু! আমি যাব। আমি দিদীকে খুঁজিতে যাব।" (অজিৎ প্রায়ই ভুলিয়া মেসো মহাশয় মাসীমা বলিয়া ফেলিত)। অজিতের যাবার নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া, রাজকুমার বাবু তাহাকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তখন অজিতের আহ্লাদ দেখে কে? সে হাতে তালি দিতে দিতে, নাচিতে নাচিতে, বাগানে ছুটিয়া গেল। যাইতে যাইতে দেখে যে বুড়ো চাকর কালাচাঁদ সেই দিকে আস্‌ছে। কালাচাঁদ অজিৎকে নাচিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দাদাবাবু! তোমার আজ এত আহ্লাদ কেন?"

অজিৎ। কালাচাঁদ! আহ্লাদ হবে না? আমি মামা বাবুর সঙ্গে ইটের চকে যাব। তুমি [illegible] দিও। যত্ন করো। আমার গাছ গুলোতে জল [illegible] বুঝেছ?

কালাচাঁদ গাছে জল দিতে স্বীকৃত হইল। তখন অজিৎ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া যাইবার জন্য সব জিনিষ ঠিক করিতে লাগিল। [illegible]

[illegible] ভাই! ইটের চকে যাব। [illegible]। তুমি থাক্‌লে—মামীমা [illegible] র কাছে থেকো। আহা! [illegible] থাকিবেন। আমি, মামা বাবু হুজনেই চলে যাব। কেবল তুমি আর মামীমা থাক্‌বে। তুমি আমার ছোট ভাই। তুই যাহু! তুই সোনা! তুই রাজাধন!” রাজা সব বুঝিল!! আহ্লাদে লেজ নাড়িতে নাড়িতে অজিতের কোলে লাফাইয়া উঠিল।

অজিৎ বুঝিল রাজা সম্মত হইয়াছে। এই প্রকারে অজিৎ রাজার সহিত আলাপ করিতেছে, এমন সময় ইন্দুরেখা দেবী কি কাজে সে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই অজিৎ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া চুম খাইয়া বলিল “মামীমা! আমি ইটের চকে চলে গেলে, তোমায় একলা থাকৃতে হবে না; রাজা তোমার কাছে থাকৃবে। আমি শীঘ্রই মামা বাবুর সঙ্গে ফিরিয়া আসিব। আমি এখন যাবার ঠিক করিতেছি।”

ইন্দুরেখা দেবী অজিৎকে দেখাইবার জন্য মুখ খানি ভার করিয়া বলিলেন, “আর যাও! তুমি আমায় ফেলে চল্লে। আমি কি করে একলা থাকব! অজিতের মায়া দয়া নেই। রাজাকে লইয়া কি করিব? ‘রাজা’ কি আমার অজার মত।”

অজিৎ মামীমার মুখ ভার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। সে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিল “তুমি যদি কাঁদ আর দুঃখ কর, তাহলে আমি আর যাব না, তোমার কাছে থাকব।” এই কথা শুনিয়া ইন্দুরেখা দেবী হাসিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন “না। না। তুমি যেও। ‘রাজা’ আমার কাছে থাক্‌বে। আমি যাই; কাজ ফেলে এসেছি। তুই আপনার কাজ কর। পড়া করে রাখ, দুপুর বেলা পড়া নেব।” এই বলিয়া তিনি আপনার কাজে চলিয়া গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে রাজকুমার বাবু অজিৎকে সঙ্গে করিয়া ইটের চকে গেলেন। ইন্দুরেখা দেবী কিছুদিনের জন্য একলা বাড়ীতে রহিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অজিৎ হাসিতে হাসিতে ললিত বাবুর বাড়ী নামিল। আজ তার আহ্লাদ দেখে কে? “মেনাকে দেখিব” “রা[illegible]সকে দেখিব” “দিদীমাকে দেখিব” এই ভাবিয়াই সে আহ্লাদে আটখানা। অজিৎকে মেনাদের বাড়ী রাখিয়া রাজকুমার বাবু ও ললিত বাবু আবার উর্ম্মিলার সন্ধানে বাহির হইলেন। হাঁসপাতালে গিয়া দেখেন, তাহাদের খাতায় লেখা রহিয়াছে তিনি রোগ-মুক্ত হইয়া চলিয়া গেছেন। কোথায় যে গেলেন তার আর ঠিক নাই। আহা! তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন খোঁজ পাইলেন না। রাজকুমার বাবু ললিত বাবুর উপর ভার দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন ঠিক করিলেন। কিন্তু অজিৎ কোনমতেই যাইতে চাহিল না। সে বলিল “আমি দিদীকে লইয়া একসঙ্গে বাড়ী যাব, মামা বাবু! আমি এখন যাব না।”

সুরমা দেবীও বলিলেন, “থাক্! বিনয়ের (ললিত বাবুর ছেলের) সঙ্গে খেলা করিবে। কিছুদিনের জন্য থাকিতে ইচ্ছা হয়েছে, থাক্।” রাজকুমার বাবু কাজেই অজিৎকে রাখিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। অজিৎ যায় নাই বলিয়া ইন্দুরেখা দেবী কিছু কষ্ট পাইলেন। অজিৎ এখানে প্রত্যহ মেনার কাছে যায়। কত খেলা করে, তার সঙ্গে কত বই পড়ে। রামদাসের কাছে যায়। দিদীমাও ফাঁক যান না। এই কদিন অজিতের খুব আনন্দে কাটিয়া গেল।

[illegible] তাহাকে দেখিয়া [illegible]

[illegible] আমি। এই দোকানে খাবার [illegible] যাচ্ছি।—তাহাকে দেখিয়া অজিৎ বলিয়া [illegible], [illegible] মেয়ে, রামদাস?

[illegible]। আহা! বাবা! ওর কেউ নাই। [illegible] সংসারে কেউ নাই। মেয়েটীর কেউ নাই। মেয়েটা বড় ভাল!

অজিৎ। ও কার কাছে থাকে। এতটুকু মেয়ে একলা থাকে? ওর ভয় করে না?

রামদাস। [illegible] কেইবা ওর কাছে থাক্‌বে? ও চিরকাল কি একলা আছে? এতদিন এর আগে ঐ নবকুমার বাবুর কাছে ছিল। তিনি [illegible] যাবার পর নবকুমার বাবুর স্ত্রী একদিন ছাত থেকে পড়ে যাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, তিনি আর ফিরে আসেন নাই। তারপর বাড়ীওয়ালা বেচারিকে তাড়াইয়া দিল। তারপর [illegible], পথে ঘাটে, এর বাড়ী, তার দোরে, এমনি করে বাছা মানুষ হচ্ছে। তুই বাছা যেমন কষ্ট পেতিস্, উমুও তেমনি [illegible]। ভগবান তোর শুভদিন এনে দিলেন, তোর কপাল ফিরে গেল। এর আর কি তা হবে! এর [illegible] কপাল ফির্‌বে! চিরটাকাল এই দুঃখ কষ্ট ভোগ [illegible]ত করিতে এ প্রাণটা যাবে। আহা! [illegible] প্রাণে কি এতই সয়?

অজিৎ। [illegible] রামদাস? তুমি বল্লে এ কার [illegible]? তার নাম কি? বলনা?

রামদাস। নবকুমার বাবু। তা শোনবার জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

[illegible]

[illegible] আর [illegible]

এই বলিয়া সে প্রাণপণে ছুটিয়া বাড়ী গেল। তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া ললিত বাবু সুরমা দেবী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি অজিৎ, কি হয়েছে? [illegible] কেন?”

অজিৎ। মামাবাবু! [illegible] দিদী [illegible] দিদীকে পেয়েছি। [illegible] তাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া [illegible] সে নিশ্চয় আমার দিদী। তার নাম [illegible]। সে নবকুমার বাবুর কাছে ছিল। সব [illegible] দিয়েছে। মামাবাবুকে টেলিগ্রাম করুন। [illegible] পাওয়া গিয়াছে।

ললিত বাবু। থাম! থাম। [illegible] কেন? ঠাণ্ডা হও, তারপর বলিও। কাকে দিদী করে এলে তার ঠিক নাই।

অজিৎ। কাকেও দিদী [illegible] নাই। দিদীকেই দিদী করিয়াছি। সে আমার দিদী! সে আমার দিদী!

সুরমাদেবী।—আচ্ছা তোমার [illegible] যাচ্ছেন। যাও না গা, ওর [illegible] আহা! বেচারা অত করে ছুটে এসেছে [illegible] বোধ হয় উর্ম্মিলাকে পাওয়া গেল।

ললিতবাবু।—তুমি কি পাগল! আমি কি যাবনা বলেছি; আমি এই [illegible]। চল অজিৎ! যাই। দেখিগে তোমার [illegible]।

অজিৎ ছুটাছুটী রাস্তা দিয়া চলিল। [illegible] তার সঙ্গে চলে সাধ্য কার?

[illegible] বার, বল্‌লেন—“অজিৎ! [illegible] অজিতের কি সে কথা আর [illegible] ললিত বাবুর [illegible]

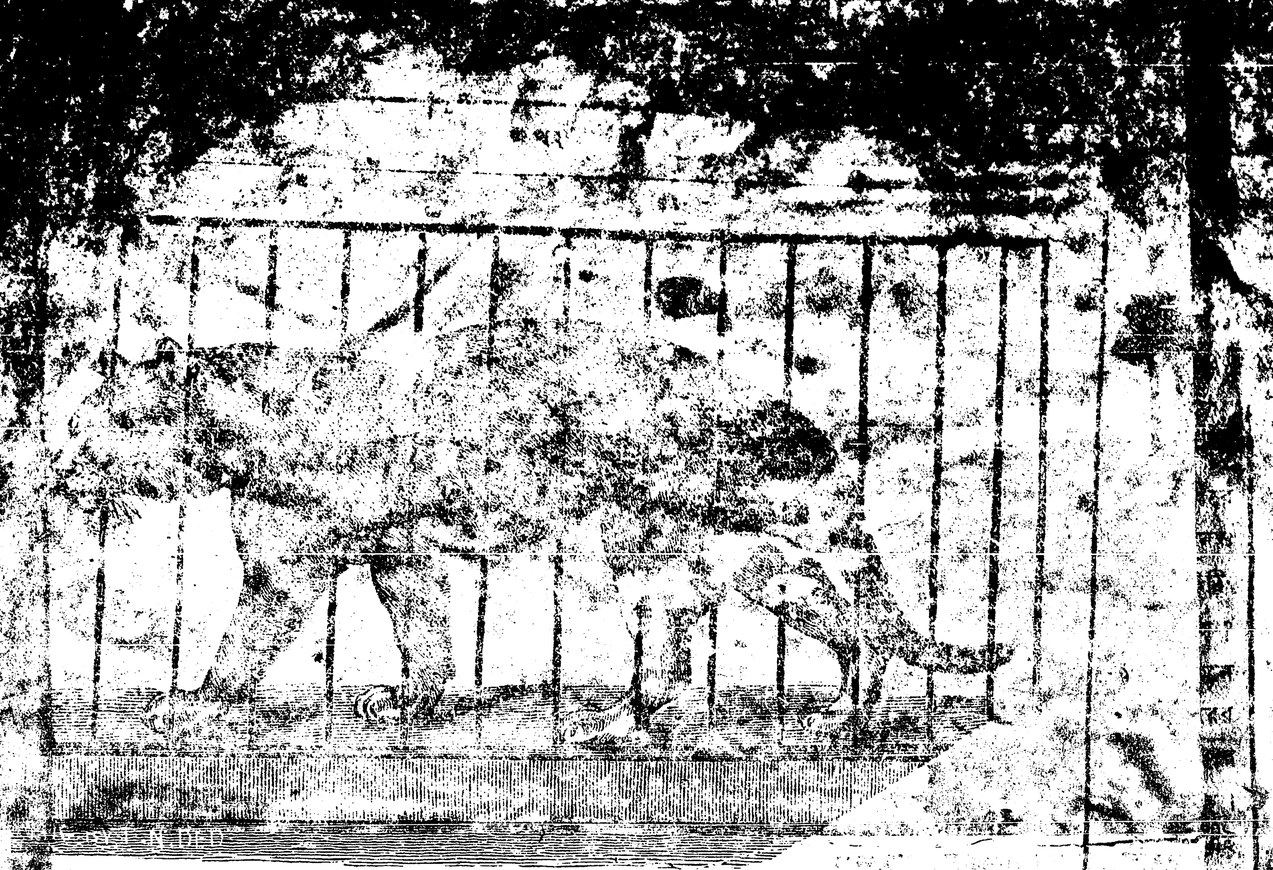

[illegible] মিনিট কতক পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অজিৎ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "[illegible] এই! এই দেখুন! এই দেখুন!"

ললিতবাবু [illegible] ব্যস্ত কেন? দাঁড়াও। [illegible] কি গো বাছা! তোমার নাম কি? [illegible] দিন কোথায় ছিলে? এখন কোথায় [illegible] তো?

[illegible] আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সব কথা বলিল। [illegible] ললিত বাবুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল, তখন অজিৎ আগ্রহের সঙ্গে কাণ পাতিয়া সব কথাগুলি শুনিতেছিল। আর এক এক বার আহ্লাদে অস্থির হইয়া যাইতেছিল। এখন উর্ম্মিলা অজিতের কে পাঠক পাঠিকা তোমরা কি তাহা শুনিতে চাও? তবে শোন। উর্ম্মিলা আর কেহই নয় অজিতের দিদী। অজিৎ এ কথা জানিতে পারিয়া কি করিল, তাহাও বোধ হয় জানিবার জন্য তোমরা উৎসুক হইয়াছ। তোমরা [illegible] দেখি। যাহা সকলেই করে [illegible] অজিৎ তাহাই করিল। অজিৎ ছুটিয়া গিয়া [illegible] জড়াইয়া তাহার মুখে বার বার চুম্বন করিল। উর্ম্মিলা অবাক হইয়া রহিল। আজ আর তার [illegible] হয় না। আজ তার মন [illegible] বিশ্বাস করিতে চায় না, যে তাহার শুভ দিন আসিয়াছে। আজ তার দুটি চোখ দিয়া কে জানে কেন দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। — উঃ দুঃখিনী কি এত সুখ সহ্য করিতে পারে? [illegible] পরিবর্ত্তন। সে এক দৃষ্টে [illegible] চাহিয়া রহিল। [illegible] তার আর কি প্রতিশোধ [illegible]

চারিদিক অন্ধকার দেখিতে [illegible] সামান্য সুখের কথা, যে এমন [illegible] ভাই! আপনার ভাই! — উর্ম্মিলা [illegible] মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। [illegible] ক্ষণের জন্য আর একটীও কথা সরিল না। উর্ম্মিলা কিছু সুস্থির হইলে ভাইকে লইয়া আপন ঘর দেখাইল, কত কত দুঃখের কথা বলিল।

তৎক্ষণাৎ ললিত বাবু গিয়াই রাজকুমার বাবুর কাছে টেলিগ্রাম করিলেন। রাজকুমার বাবু ইন্দুরেখা দেবীকে সঙ্গে করিয়া সেই দিনই ইটের চকে আসিলেন। তাঁরা উর্ম্মিলাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কি[illegible] সেখানে থাকিয়া, উর্ম্মিলাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

কি আশ্চর্য্য মিলন! কি সুন্দর দৃশ্য! — আজ হতে উর্ম্মিলার সুখের দিন আসিল। মামা মামীর আদরে ভাইয়ের স্নেহে অতি সুখে তাহার দিন যাইতে লাগিল। জ্ঞান, ধর্ম্মে, গুণে উর্ম্মিলা শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিল।

অজিতের সুখের দিন পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। উর্ম্মিলারও সুখের দিন আসিল। দয়াময় পরমেশ্বরের রাজ্যে কাহারও চির দিন কি দুঃখে যায়?

দুষ্ট বাঘ।

একটা বাঘ রাজবাড়ীর সিংহ দরজার সম্মুখে একটা খোঁয়াড়ে বন্ধ ছিল। রাজার বাড়ীতে কত লোক যায়, বাঘ সকলকেই হাত যোড় করিয়া বলে [illegible] তোমাকে

[illegible] বড় ভাল বাসি; আমাকে বাহির করিয়া দাও।" কেহই কিন্তু দরজা খুলিয়া দেয় না। অবশেষে এক ফলারে বামণ রাজবাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যাইতেছিল, তাহাকেও ঐ কথাগুলি বলিল। ঠাকুর বলিল "তুমি বাঘের জাত, তোমাকে বিশ্বাস করিতে আছে? আমি দরজাটী খুলিলেই [illegible] আমাকে ফলার করিয়া বসিবে।" [illegible] ভাই, তোমাকে কি ফলার [illegible] তুমি কত ভাল লোক! রাজার [illegible] নিরামিষ খাইয়া খাইয়া আমি বৈষ্ণব হইয়াছি, আমি আর এখন মাংস খাইনা। ঠাকুর মশাই! তোমাকে দশ হাজার [illegible] দরজাটা খুলিয়া দাও।"

[illegible] ঠাকুর একবার বিশ্বাস করিল, [illegible] তার পর দরজা খুলিয়া [illegible] "ঠাকুর তোমাকে [illegible] শেষে ঠাকুর [illegible] দিন

"আচ্ছা ভাই! আমার তিন জন সাক্ষী আছে, তারা যদি বলে, তবে খাইও।" বাঘ স্বীকৃত হইল। দুজনে কতদূর গেলে পর ঠাকুর একটা বট গাছ দেখাইয়া বলিল, "এই আমার একজন সাক্ষী।" এই কথা বলিয়া বট গাছকে জিজ্ঞাসা করিল "ভাইরে, উপকারীর অনিষ্ট কি কেউ করে?" বট গাছ বলিল "করে বই কি? সকলেই করে। এই দেখ আমার ছায়ায় কত পরিশ্রান্ত পথিক লোক বসিয়া ঠাণ্ডা হয়, আবার তাহারাই যাইবার সময় আমার ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়।" বাঘ বলিল "কি ঠাকুর!" ঠাকুর একটু বিপদে পড়িল। আর দু জন সাক্ষীও যদি ঐরূপ বলে তাহা হইলেই তো গোল!

আর কতদূর যাইয়া একটা ক্ষেতের আ'লকে জিজ্ঞাসা করিল "বল দেখি ভাই, উপকারীর অনিষ্ট কে করে?" আ'ল উত্তর করিল "সকলেই করে। [illegible] ক্ষেতের মধ্যে আমি থাকি। [illegible] দিয়া আর

… কাটিয়া নিজের ক্ষেত বাড়াইতে চায়। তুমি … এমন বোকা! কোন দিন কি কাহারও … করিতে ঠক নাই?" বাঘ একটু হাসিয়া … করি "ঠাকুর মশাই, কেমন বুঝ?" … করে; সে চুপ করিয়া থাকিল।

… কতক দূর যাইয়া এক শেয়ালের সঙ্গে … হইল। শেয়াল বাঘের গন্ধ পাইয়া … দৌড়িয়াছে। বামণ অনেক ডাকাতে … একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কাছে আসিয়া কাজ নাই। যাহা বলিতে হয় ঐখান … বল।" ঠাকুর তাহার অবস্থা সমুদায় খুলিয়া বলিল। শেয়াল মনোযোগ দিয়া শুনিয়া একটু মাথা নাড়িয়া বলিল "বড় বোকার কর্ম্ম করিয়াছ ঠাকুর! তোমার মোকদ্দমা ও বড় কঠিন; বোধ হয় মামারই (বাঘ শেয়ালের মামা একথাটা সকলেই জানে) জিৎ হইবে। কিন্তু না দেখিয়া শুনিয়া আমি কোন রকম মতই দিতে পারিব না। এই মোকদ্দমার সুবিচার করিতে হইলে, ইনি কোথায় কিরূপ ভাবে বদ্ধ ছিলেন আর তুমিই বা কিরূপে দরজা খুলিলে, স্বচক্ষে দেখা আবশ্যক। সুতরাং আমার, ঐ স্থানে পুনরায় যাইয়া মামাকে পুনরায় খোঁয়াড়ে যাইতে দেখিয়া সব মীমাংসা করা উচিত।"

এই পরামর্শ স্থির হইলে পর তাহারা তিন জনে সেই খোঁয়াড়ের কাছে আসিল। বাঘ খোঁয়াড়ের ভিতর গেল। শেয়াল স্বহস্তে খিল … দিল। তার পর ঠাকুরকে রাজবাড়ীতে … উপদেশ দিয়া …

… না … আজ বাঘের … একটা … তোমাদিগকে একটু আমোদ দিতে … লাম। সম্পাদক মহাশয় … সময় হইলে ভবিষ্যতে … আর এক দিন … বলিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

সম্পাদকের পত্র।

(দ্বিতীয় পত্র।)

সখা-সম্পাদকের … আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করি… লাম।—আমার প্রিয়বালক বালিকাগণ!

যাহা দেখি সবই যদি শুনিয়া বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আর দুঃখ থাকে না; কিন্তু আমার সে সাধ্য নাই। বড় হইয়া নিজে যদি কখনও দেশে বিদেশে বেড়াইতে পার এবং … চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে পার, তবেই বুঝিতে পারিবে পরমেশ্বরের সৃষ্টি কত সুন্দর, কত … কত চমৎকার।

আমি যেখানে আছি, এখান হইতে … ক্রোশ দূরে কয়লার খনি আছে। খনি কাহাকে বলে জান? এক একটা যায়গায় অনেক … পর্য্যন্ত মাটীর নীচে কয়লা পাওয়া … কয়লাতে সমস্ত বাষ্পীয় যন্ত্র অর্থাৎ কল চলে। লোকে মাটীর নীচে গর্ত্ত করিয়া মাটীর … দিয়াই বরাবর পথ করিয়া কয়লা তুলিয়া … বস্ত করে। ইহারই নাম খনি বা খাদ। মাটীর অনেক নীচে পর্য্যন্ত কয়লা থাকে। … তলা, তিন তলা, চার তলা, এই রকম তলা … কোন কোন খনিতে অনেক তলা আছে, শুনিতে …

… টাতে গিয়াছিলাম … বই নাই।

… খনি দেখিতে গিয়া … রাস্তা ক্রমে ঢালু … সুতরাং বেশ হাটিয়া যাওয়া … দরজাটার একটু আলো আছে … মধ্যে … আলো জ্বালিয়া যাইতে হয়। … কয়লার খনির একজন লোক … যাইতেছিল, সুতরাং আমরা নির্ভয়ে … পাশে কয়লার দেওয়াল, … নীচে কয়লার রাস্তা,— … স্থানে এরূপ পথে সাবধানে … একটা বিপদে পড়ি- … বাতাস যাইবার যো … পার সেখানকার … নিশ্বাসে কত ভারী … কষ্ট হইতে লাগিল, … ইচ্ছা করিলাম না। … লোককে বলিলাম "বাপু! … করিয়া লইয়া চল, আর … বাহির] হইবার রাস্তা … চলিতে চলিতে … বাহির হইবার রাস্তা, … মধ্যে কি কি দেখিলাম … যায়গাতেই সোজা … কোথাও কোথাও … আমরা কখনও কুঁজো … চলিতে চলিতে … বাহির করিতেছে, … আলো এবং হাতে এক … মজুরদের মধ্যে … অনেক বালক দেখি- … নাই, সবই কালো। … কয়লাতে এমনি … কালো হইয়া … তাহাতে কয়লা টানিবার জন্য রেল … হইলে বড় বড় টিনের … গাড়ীতে বসাইয়া দেয়। … ঠেলিয়া দিলেই কয়লার গাড়ী, … উঠিবার রাস্তা, সেই … না লোকেও ঠেলিয়া সে … লইয়া যায়। উঠিবার রাস্তা সিঁড়ির মতন মনে করিতেছ বুঝি? না, না, তাহা নয়। … এখন যেখানে পৌঁছিলাম, সেখানে … দেখিলাম উপরের সূর্য্যের আলো দেখা যাইতেছে। এবং উপর হইতে লম্বা একটা লোহার শিকল … এই শিকলের শেষভাগটায় তিনটা মুখ। এই তিনটা মুখ বাল্‌তির চারিদিকের তিনটা কড়ার সঙ্গে যুড়িয়া দেওয়া হইল। … মাত্র বাল্‌তি কয়লাশুদ্ধ উঠিয়া … গেল। আবার বাল্‌তি ফিরিয়া আসিল। এইবারে আমরা তাহাতে দাঁড়াইয়া … করিয়া শিকল ধরিলাম, পাশের লোকেরা উপর দিকে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"আস্তে …" আর অমনি আমরা আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গেলাম। কোথায় নামিয়া ছি… আসিয়া উঠিলাম; চাহিয়া দেখি একটা বাষ্পীয় যন্ত্র কপিকলে করিয়া আমাদিগকে … য়াছে এবং আমরা যেখান দিয়া নামিয়াছিলাম তাহা হইতে বহুদূরে আসিয়া উঠিয়াছি।

কয়লার খনিতে বিস্তর টাকা লাভ হয়, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের সেদিকে মতি নাই। যত কয়লার খনি, হয় গবর্ণমেণ্টের না হয় রেলওয়ে কোম্পানির না হয় অন্য কোন ইংরেজ কোম্পানির। আমরা যে খনি দেখিতে গিয়া-

[illegible] হইতে লাভ হইবে, কে [illegible]

[illegible] বিনা পরিশ্রমে, বিনা যত্নে, বিনা কষ্টে কি কখনও কোন কাজ হয়? খনি হইতে কয়লা তুলিতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়, কখনও কখনও মজুরদের হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়। অন্ধকারে [illegible] আলোতে কাজ করা, সহজেই বুঝিতে পার, কত বিপদের সম্ভাবনা। আবার [illegible] খণিতে আর একটা মহা বিপদের ভয় আছে। খনির মধ্যে বাতাস ঢুকিতে পারে [illegible] ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। বাতাস ঢুকিতে না পারায় [illegible] হাওয়া খারাপ হইয়া গিয়া লোকের নানারূপ ব্যারাম হইয়া থাকে এবং [illegible] খারাপ হাওয়া কখন কখন প্রদীপের আলোয় লাগিয়া জ্বলিয়া উঠে; তখন মজুরদের প্রাণে বাঁচা শক্ত। যদিও এই শেষের লিখিত বিপদ বারণ করিবার জন্য, আজ কাল "অভয়-প্রদীপ" নামে এক রকম নূতন আলোর সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আমরা এই খণিতে তাহার একটারও বন্দোবস্ত দেখিলাম না।

এখন স্লেট-পাথরের নদীর কথা কিছু বলিব। এই নদী আমার থাকিবার যায়গা হইতে আধ মাইলের অধিক হইবে না, সুতরাং আমি হাটিয়াই গেলাম। নদী বলিলে যদি তোমাদের গঙ্গা বা অন্য কোন নদীর কথা মনে হয়, তাহা হইলে আমি নদী না বলিয়া অন্য কিছু বলি, কেননা আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহার উপর দিয়া পথ গিয়াছে, এবং গরু, মহিষ, গাড়ী, ঘোড়া, তাহার উপর দিয়াই যাইতেছে। [illegible] এক হাত কি দেড় হাত বালি আর তাহার নীচে [illegible] স্লেট-পাথর। আমরা দেখিলাম নদীর [illegible] উপর দিয়া পথ হইয়াছে, সেখানে [illegible] স্থির করিয়া একটু একটু জল আসিতেছে, আরও নীচে আসিয়া তাহার সহিত এইরূপ দশ যায়গা হইতে দশটী ছোট ছোট জলের স্রোত আসিয়া মিশিয়াছে এবং [illegible] হইয়া [illegible] একটু [illegible] পাথর [illegible] জল [illegible] নীচে [illegible] আমরা [illegible]

[illegible] কালো পাথরের উপর দিয়া [illegible] কিরণে চিক্ চিক্ করিতে [illegible] স্লেটপাথরগুলি এমন সুন্দর [illegible] তাহা আর কি বলিব? কোন যায়গা [illegible] কোন যায়গাটা অর্দ্ধচন্দ্রের মত, কোন যায়গা চারিকোণ, এইরূপ নানারূপ সুন্দর [illegible] রহিয়াছে। স্লেট পাথরে সুন্দর লেখা যায়, [illegible] এক খণ্ড পাথর লইয়া [illegible] লিখিলাম "ঈশ্বরের [illegible] দয়া!" [illegible] উপর দিয়া শীতল জল ঝির ঝির করিয়া [illegible] সেই লেখা দেখিতে দেখিতে [illegible] চলিল।

একবার ইচ্ছা হইল, এই সকল জল [illegible] হইতে আসিতেছে, তাহা খুঁজিয়া দেখি। [illegible] ভাবিয়া পাথরের নুড়ি [illegible] যেদিক হইতে জল আসিতেছে, সেই দিকে চলিলাম। অনেকদূর গেলাম, তখনও [illegible] নাই। আরও একটু আগে গেলাম, কিন্তু সে খানে হায়েনার গায়ের [illegible] গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। [illegible] "বোট্কা" গন্ধে ভয় পাইয়া, আর [illegible] করিলাম না। আর একটু গেলেই [illegible] যে সকল কথা লিখিতেছি, তাহা আর [illegible] লোক থাকিত না। আমরা [illegible] তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

আরো অনেক কথা বলিবার [illegible] তোমাদিগকে জানাইব।

পচম্বা, গিরিধি। } তোমাদের [illegible]

ধাঁধা।

[illegible]বারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১।—[illegible] পোষ্টকার্ড। ২।—[illegible] ৩।—প্রজাপতি। ৪।—[illegible] গৌরব (কেন না, যাঁর [illegible] তিনি [illegible] প্রশংসা [illegible] আর যে [illegible] [illegible] করিয়া বেড়ায় [illegible] গৌরব কিছুই নাই।)

[illegible]